সীতানাথ

বা

গৃহস্থ সন্ন্যাসী

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥"

গীতা।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

১৩২৬

মূল্য ১৶০

"If we cannot be happy ourselves, at any rate we can do much to make others so."

"The duty to our Neighbour is part of our duty to God.......The love of God is best shown by the love of man."

Lord Avebury.

সীতানাথ

—:*:—

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

চাঁদপরিবার।

রামকৃষ্ণপুরে, একখানি খোলার বাড়ীর সদর ঘরে, সতরঞ্চ-বিছান তক্তপোষের উপরে, দুপুরবেলা দুইটি বালক পড়িতে বসিয়াছে। একুশ বাইশ বছরের এক যুবা, মেঝের উপরে উবু হইয়া বসিয়া, তানপূরার মত একটা বড় হুঁকায় তামাকু টানিতে টানিতে মধ্যে একবার একটু থামিয়া বলিল—"পড়্‌না রে, মাণিক! অমর পড়্‌ছে—তুই কি কর্‌ছিস্ বল্ দেখি?"

বালকদুইটির মধ্যে যাহার বয়স বছর বার, বর্ণ গৌর, দেহ কৃশ, মুখখানি সুন্দর হইলেও তাহাতে বাল্যের সহর্ষ-স্বচ্ছন্দভাব লক্ষিত হয় না—বরং উদ্বেগ ও ভীতিজড়িত একটা বিমর্ষভাব পরিব্যক্ত, তাহারই নাম অমর। সে গুণ্ গুণ্ করিয়া পড়িতেছিল। আর যেটির বয়স দশের অনধিক, আকৃতি শ্যামবর্ণে সুশ্রীসম্পন্ন না হইলেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ, তাহারই নাম মাণিক। সে বইখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া, পাশে বড় বড় দুইটা ভাঁটা লইয়া টিপ করিতেছিল। যুবার—'পড়্‌না রে'—ইত্যাদি

শুনিয়াই, সে ভাঁটাদুইটা লুকাইতে লুকাইতে বইএর উপরে চাহিয়া বলিল—"রা! পড়্‌ছি না ত কি ক'র্‌ছি?—ফিরে দেখনা!"

যুবা ক্ষণকালের জন্য একবার তাহার কলনাদিনী হুঁকার সহিত মুখের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া, পশ্চাতে চাহিয়া বলিল—"পড়া আবার দেখ্‌ব কি রে, বাঁদর—আমার কাণ নেই? অমরের পড়ার শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি, তোর ত কই পাচ্ছি না?"

মাণিক ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়াই খুব হাঁকিয়া হাঁকিয়া পড়িতে লাগিল, এবং দুই এক পঙ্‌ক্তি মাত্র পড়িয়াই বলিল—"ভাত খেতে যাবে না, মামাবাবু? তোমার ভাত সেই কখন থেকে বাড়া প'ড়ে র'য়েছে!"

ধূমপানের মগ্নতায় আহারের কথা, বোধ হয়, যুবা ভুলিয়াই গিয়াছিল; বিবৃত মুখ দিয়া আকৃষ্ট ধূমরাশি উদ্গিরণ করিয়া বলিল—"হ্যাঁ ত রে"; তাহার পর খুব তাড়াতাড়ি দুই চারিটা শোষ-টান টানিয়া, হুঁকাটি কোণে রাখিয়া, ত্বরিতপদে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। বাড়ীটি তারাচাঁদ বাবুর, বালকদুইটি তাঁহারই পুত্র, আর যুবা তাঁহার গৃহাশ্রিত শ্যালক—শ্রীযুত গোবর্দ্ধন।

রামকৃষ্ণপুরের অনেকেই বলিয়া থাকে—"তারাচাঁদ চাটুজ্যে লক্ষীর বরপুত্র"। বাড়ী, ঘর, আসবাব, পরিচ্ছদাদি দেখিলে কিন্তু তাঁহাকে ধনদেবীর প্রিয়পুত্র বলিয়া মনে হয় না—ত্যাজ্য বা ত্যক্তপুত্র বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। ভিতরে যাহার যাহাই থাক্, বাহিরটা সকলেই একটু ভাল দেখাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ছেঁড়া কাঁথার বিছানাটাও লোকে একখানা শাদা চাদরে ঢাকিয়া রাখে, এবং ভিতর-বাড়ীর চালে খড় না থাকিলেও বৈঠকখানার দেয়ালে দুইখানা অমনি-পাওয়া বিজ্ঞাপনের ছবিও ঝুলাইয়া দেয়। তারাচাঁদের তাহা নাই—তাঁহার সদর মফস্বল সমান। অন্দরে ঝুড়ি ইটে গাঁথা, খোলায় ছাওয়া তিন চারিখানি মাঝারি

ঘর ; সদরেও সেই প্রণালীর আট-পাঁচী—দৈর্ঘ্যে আট ও প্রস্থে পাঁচ হাত —একখানি বৈঠকখানা।

তারাচাঁদের পিতা—স্বর্গীয় কালাচাঁদ, নদীয়া জেলার বাস ত্যাগ করিয়া আসিয়া, কর্ম্মস্থানের সন্নিকটে, রামকৃষ্ণপুরে বাস করিয়াছিলেন। জন্ম-স্থানের সহিত সম্বন্ধটাকে তিনি বার্ষিক যৎসামান্য খাজনার বন্দোবস্ত করিয়াও রাখিয়াছিলেন ; তাঁহার মৃত্যুর পরে তারাচাঁদ সে পিতৃপৈতা-মহিক সম্বন্ধটাকে নগদ টাকা করিয়া লইয়াছেন। কালাচাঁদ হাবড়ার একটা চটের কলে সামান্য কি চাকরি করিতেন ; তাহাতে মাহিনা অল্প হইলেও, "উপরি" বা জানা-চুরি বাবতে বেশ দশটাকা উপার্জ্জন করিতেন। তাহারই প্রমাণস্বরূপ রামকৃষ্ণপুরে, পাঁচ কাঠা জমির উপরে, পুরাতন এই খোলার বাড়ী। তারাচাঁদ উত্তরাধিকারী হইয়া এই পৈতৃক সম্পত্তির ভোগদখল মাত্রই করিয়া আসিতেছেন, তাহার কোনও রূপান্তর সাধন করেন নাই। বৈঠকখানায় আজিও সেই কালাচাঁদা আমলের ছেঁড়া চটের চাঁদোয়া। ঘন ঘন সেলাই-করা মোটা চটের সেই চন্দ্রাতপ-তলে, কলিযুগের ধর্ম্মের ন্যায় পাদৈকমাত্রাবশেষ এক তক্তপোষ। উপরি-উপরি সাজান তিন চারিখানি করিয়া আধ্‌লা ইট আজিও সেই ত্রিপাদ-শূন্য তক্তপোষের পাদপূরণ করিয়া, তাহার অন্তর্ভেদযুক্ত ও শিথিল-বন্ধন তক্তাগুলির ভার বহন করিতেছে। তাহার উপরে চট্টবংশীয় মহাপুরুষ-গণের জন্ম-জরা-মরণের ইতিহাসজড়িত, শিশু কালাচাঁদ অথবা তৎ ...তন পিতার বিদ্যার্থিতার পরিচায়ক মসি-নিষেকচিহ্নে শোভিত, বিবর্ণ, বা... পুরুষের জীর্ণ, স্থানে স্থানে ছিন্ন সেই সতরঞ্চ, দীর্ণবক্ষে অর্দ্ধশতাব্দের ধূ... নিজ লইয়া পড়িয়া আছে। তাহারই এক পাশে, পুরাতন ভৃত্য প্রাচী... করিয়া দাসের নিদ্রাবিবৃত, বিরলদশন আস্যের লালাস্রাবে চিহ্নিত... রাখিয়াছিলেন চিক্কণ, রক্তবর্ণ হইতে কৃষ্ণে পরিণত সেই আবরণশূন্য উ...

গোবৰ্দ্ধন রাধারাণীর কনিষ্ঠ। প্রবেশিকা-পরীক্ষা-সোপানেই কয়েকবার স্খলিতপদ হইয়া, সে বিশ্ববিদ্যালয়লভ্য-উপাধিলাভের আশা ত্যাগ করিয়াছিল; এবং পিতৃমাতৃবিয়োগের পর, সকের যাত্রা ও থিয়েটার প্রভৃতির দলে মিশিয়া, পৈতৃক যে কয়েক কাঠা জায়গা জমি ছিল, তাহাও নষ্ট করিয়াছে। অবশেষে কৰ্ম্ম-কেন্দ্র কলিকাতার উপকণ্ঠে থাকিয়া, যেমন তেমন একটা চাকরি জুটাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে, সহোদরার সুপারিসে চাঁদবংশীয় কুমারদ্বয়ের অবৈতনিক গৃহশিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছে। এক বৎসর হইতে যায়, সে এইপ্রকার—গো-শকট-পরিচালকের মত গান গাহিতে গাহিতে গরু-তাড়ানর ভাবে—তামাকু টানিতে টানিতে ছেলে-তাড়ানর কাজ চালাইয়া আসিতেছে; কৰ্ম্মকাজের এখনও কোন চেষ্টাই করিয়া উঠিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুষ্টের দমন।

গোবৰ্দ্ধন-মাষ্টার বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলে, মাণিক তক্তপোষ হইতে লাফাইয়া পড়িল; এবং বাহিরের দিকটা একবার উঁকি দিয়া দেখিয়াই, হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া ভড় ভড় করিয়া টানিতে লাগিল। অমর অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ মাণিকের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"ও কি রে মাণিক—তামাক টান্‌ছিস্ কি বল্!"

মাণিক সে কথায় কর্ণপাত করিল না—নিজের মনে তামাকু টানিতে লাগিল। গোবৰ্দ্ধন ধোঁয়া থাকিতে হুঁকা রাখিবার লোক নহে। ধোঁয়া বাহির করিতে না পারিয়া মাণিক, হুঁকাটি যে ভাবে ছিল ঠিক সেই ভাবে

রাখিয়া দিয়া অমরের কথার উত্তরে বলিল—"হাঁ টান্‌ছিনু, তা হ'য়েছে কি ? ইচ্ছে হয় তুমিও টাননা !"

অমর। মামাবাবুকে ব'লে দিচ্ছি ; বিশ্বে হচ্ছে—নয় ?

মাণিক অমরের মুখের নিকটে দুই হাতের বুড়া আঙ্গুলদুইটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"কলাটি ক'র্‌বে—মামাবাবু নিজে খায় না ?"

অমর আর কিছু বলিল না—পড়িতে লাগিল। মাণিক তাহার ভাঁটা-দুইটার একটা অমরের নিকটে রাখিয়া—"মামাবাবু ত এখন আধ্‌টি ঘণ্টা ধ'রে খাড়া চিবোবে, দাদা, ততক্ষণ এস"—বলিয়া তাহাকে খেলিতে ডাকিতেছিল ; এমন সময়ে বাহিরে বাঘের গর্জ্জনের মত একটা উদ্‌গারের শব্দ হইল। মাণিক কাঠবিড়ালের মত নিঃশব্দে তুড়ুক্ করিয়া তক্তপোষে উঠিয়াই, খুব হাঁকিয়া হাঁকিয়া পড়িতে সুরু করিয়া দিল।

পরক্ষণেই উদরভূয়িষ্ঠ-কৃষ্ণকায়, চত্বারিংশৎকল্প-বয়স্ক এক পুরুষ, অচিরভুক্তান্নে স্ফীত উদরের ভার বহিয়া আসিয়া, বৈঠকখানার ক্ষুদ্র দ্বার অবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পরিধেয় একখানি জীর্ণ ও মলিন—বোধ হয়, বালকদের পরিত্যক্ত—পাচী ধুতি। সেখানি তাঁহার অলিঞ্জর-গঞ্জিত উদরের পরিধি-বেষ্টনেই নিঃশেষিতপ্রায় হইয়া, আব্রু ও হিন্দুয়ানি এই উভয়ের যুগপৎ রক্ষায় নিজের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিতেছিল। ইনিই অলোক-প্রসিদ্ধ, স্বকথিত 'চাঁদবংশে'র প্রধান পুরুষ—শ্রীমান্ তারাচাঁদ বাবু।

প্রতিবেশীরা যে তারাচাঁদকে 'ধন-কুবের' বলিত, সেটা টাকাকড়ির সম্বন্ধে যাহাই হউক, আকৃতি-বিষয়ে অনেকটা সার্থক হইয়াছিল। ধন-রত্নাদি সম্পদ্ অপরিমেয় থাকিলেও, আকার-সৌন্দর্য্যে নাকি যক্ষেশ্বরের বড়ই দরিদ্রতা ছিল। তারাচাঁদেরও প্রায় সেইরূপ। তাঁহার আকৃতির

অচিন্ত্যাকর্ষকভাবটা শুধু মুখনাসিকাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসৌষ্ঠব জন্য নহে—অঙ্গসংস্থানের অসামঞ্জস্যও তাহার অন্যতম কারণ। চোয়ার-মুণ্ড-বসান একটা কাল জালা, কৃশ বামনের হস্তপদাদি-সংযুক্ত কল্পনা করিলে, যে অবয়বের ছবি মনে উঠিয়া থাকে, তাঁহার চেহারাটা অনেকটা সেই ধরণের।

দ্বারদেশে নীরবে দাঁড়াইয়া, তারাচাঁদ পাণের জাবর কাটিতেছিলেন—অর্থাৎ, একটা কাটি দ্বারা, দন্তাবকাশে লগ্ন চর্ব্বিতাংশের উদ্ধার করিয়া, তাহারই পুনশ্চর্ব্বণ করিতেছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে এক একবার তীব্র ও বক্রদৃষ্টিতে বালকদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার আগমনে মাণিকের স্বর যে পরিমাণে উঠিয়াছিল, অমরের ঠিক সেই পরিমাণে নামিয়া গিয়াছিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া তারাচাঁদ বলিলেন—"কি বিড়্ বিড়্ করিস্ বল্ দেখি! মাণিক কেমন হেঁকে হেঁকে পষ্ট পষ্ট ক'রে প'ড়্ছে, ঐরকম ক'রে প'ড়্তে পারিস্ না—ভাত খাস্ না—না কি?"

অমরের স্বর একটু উঠিল বটে; কিন্তু তখনও মাণিকের অনেক নিয়ে। মাণিকের ভাঁটাটা তখনও অমরের নিকটেই পড়িয়া ছিল। তারাচাঁদ তাহা দেখিতে পাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"প'ড়্তে ব'সেছিস্, তবু সাম্নে একটা ভাঁটা কেন বল্ ত—ভ্যাটা কোথা পেলি?"

অমর নিরুত্তর—নীরব। ছেলেদের শাসনের জন্য তারাচাঁদ বেশ মজবুত রকমের একগাছা ছড়ি কাড়িয়াছিলেন; তাহা পাড়িয়া লইয়া বলিলেন—"শাগ্‌গির বল্ বল্‌ছি, নইলে সেই সে-দিনের মত—মনে আছে ত?" শুধু 'সে-দিনের' কেন—তেমন অনেক দিনের কথাই অমরের মনে জগজগ করিতেছিল। সে বজ্রসদৃশ দুঃসহ সেই যষ্টি-পতনের আশঙ্কায় জড় সড় হইয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—"ভাঁটা আমার নয়, বাবা!" সপাং করিয়া এক ঘা ছড়ি কশাইয়া, তারাচাঁদ মুখভঙ্গী করিয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন,—

"আমার নয় বাবা !—ও-পাড়ার ফোক্‌রে এসে ওর সাম্‌নে ভ্যাঁটা রেখে গেছে !"—বলিয়াই আবার দুই তিন ঘা।

গায়ে পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে, কাঁদিতে কাঁদিতে বেদনাব্যঞ্জক-কাতর-করুণকণ্ঠে অমর বলিল,—"আমার নয়—বাবা! আমার নয়—মাণিক্‌কে জিগেসা করুন—আমার নয়"। তারাচাঁদ ছড়িটা মাণিকের উপরে উঠাইয়া বলিলেন,—"কা'র রে, মাণিক? ঠিক্ বল্‌বি—আমার রাগ জানিস্ ত?"

মাণিক বেশ জানিত, রাধারাণী থাকিতে, তারাচাঁদ ত তারাচাঁদ—তাঁহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ চাঁদেরও এমন সাধ্য নাই যে, তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারেন। সে নির্ভয়ে হাসিতে হাসিতে—"বাঃ কা'র আবার? —আমার ভ্যাঁটা এই ত"—বলিয়া, দ্বিতীয় ভাঁটাটি বাহির করিয়া দেখাইল। আর প্রমাণের প্রয়োজন রহিল না। অমরের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল। তারাচাঁদ যথারীতি যষ্টি-প্রয়োগ সুরু করিয়া দিলেন।

অমরের কান্নার শব্দে গোবর্দ্ধন ছুটিয়া আসিল। রাধারাণীও গজেন্দ্র-গমনে তাহার পশ্চাতে আসিয়া জুটিলেন। মাধাই সেইমাত্র ভাত খাইতে বসিয়াছিল। তাহার খাওয়া হইল না; কিন্তু ভাত ফেলিয়া দিয়া, উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জনাদি করিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হইল। গোবর্দ্ধন বাধা দিতে গিয়া, মুখতাড়া খাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রাধারাণী সহাস্যমুখে দাঁড়াইয়া দুষ্টের দণ্ড দেখিতে লাগিলেন।

রাধারাণীর চেহারাটা ভাল নহে—বলিলেই সম্যক্ বলা হয় না। বর্ণটা তাঁহার মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার গাঢ় অন্ধকারের মত মীশ্ কাল না হইলেও—ফর্‌সা নহে। সেটা অনেকটা কৃষ্ণপক্ষীয় প্রদোষের আলো-আঁধারির মত ধূসর বা পাঁশুটে কাল। গড়ন পিটন নিতান্ত মন্দ নহে—বেশ

গোলগাল, চেহারাও দোহারা বটে ; কিন্তু প্রধানতঃ যাহা লইয়া আকৃতির ভালমন্দের বিচার, সেই মুখখানিই তাঁহার বড় বে-আড়া ধরণের—সৃষ্টি-ছাড়া রকমের কুৎসিত না হইলেও কেমন একতর—গঠনসৌন্দর্য্যশূন্য আর লালিত্যহীন। মেয়েলি ভাবটা তাহাতে আদৌ নাই—অধিকন্তু পরুষ ভাবের উপরে পুরুষের ভাবটা যেন বড়ই সুস্পষ্ট। ভ্রূ, নেত্র, নাসা, ওষ্ঠাধর প্রভৃতিকে তাঁহার মুখের এই শ্রীহীনতা ও পরুষভাবজড়িত পৌরুষেয় ভাবের জন্য পৃথগ্‌ভাবে দোষী করা যায় না বটে, তবে তাহাদের সমবেত চেষ্টার ফলেই যে এই ভাবটা জন্মিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু আকৃতিতে নহে—আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়থাই তিনি স্বামীর উপযুক্ত পত্নী। যথাযোগ্য-যোজনার প্রতি বিধাতার যে একটু চেষ্টা—একটু সরস প্রয়াস আছে, তারাচাঁদের সহিত রাধারাণীর মিলন ঘটাইয়া, তিনি যেন তাহারই পরিচয় দিয়াছেন।

মাধাই আসিয়া দেখিল, অমর মেঝেতে পড়িয়া কাঁদিতেছে, তাহার অঙ্গে কোথাও অঙ্গুলিপরিমিত স্থানও অনাহত দৃষ্ট হয় না—সর্ব্বাঙ্গেই ছড়ির দাগ, পাঁকাল মাছের মত ফুলিয়া ফুলিয়া রক্তমুখী হইয়া উঠিয়াছে ; তারাচাঁদ তাহার উপরেই তাহাকে প্রহার করিতেছেন, আর রাধারাণী বাধা-প্রদানের চেষ্টা না করিয়া উত্তেজনা প্রদান করিতেছেন।

মাধাই বাধা দিতে আসিতেছে দেখিয়া তারাচাঁদের রাগ বাড়িল। তিনি ভ্রূকুটিকুটিল-রক্তনেত্রে চাহিয়া, তাহাকে—"নির্দ্দহন্নিব চক্ষুষা"—বলিলেন—"স'রে যা বল্‌ছি, মেধো! নইলে আজ তোরও পিঠের ছাল চাম্‌ড়া রাখ্‌ব না।"

মাধাই কালাচাঁদের আমলের চাকর। সে আসিয়া তারাচাঁদকে বালক দেখিয়াছে। তাঁহাকে প্রভু বলিয়া মানিতে বাধ্য হইলেও, সে তাঁহার চোখ-রাঙানি দেখিয়া ভয় পায় না। অমরকে আড়াল করিয়া—

শৈল-ব্যবধানের মত উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া, মাধাই বলিল—"থাক্, আর কেন; খুব শাসন হ'য়েছে—ম'রে যাবে যে!"

স্বর সপ্তমে তুলিয়া তারাচাঁদ বলিলেন, "যায় যাবে—তোর কি? তুই স'রে যা! আমি আজ ওকে মেরেই ফেল্‌ব।"

মাধাই একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—"মেরে ফেল্‌তে হয়, ত শেঁকো টেকো একটা কিছু খাইয়ে মেরে ফেলুন! আপদ বালাই ঘুচে যাক্! রোজ রোজ এমন কুকুর-ঠেঙ্গানর মত ক'রে মারেন কেন? আমার কি? কোলেপিঠে ক'রে বড়টি ক'রেছি, তাই প্রাণটা কর্‌কর্ করে। ওর মা থাক্‌লে আজ এমনি ক'রে ঠেঙ্গাতে পার্‌তেন?"—প্রবল একটা কান্নার ঢেউ উঠিয়া মাধাইএর বুকটাকে ফুলাইয়া তুলিতেছিল; সেটাকে চাপিয়া রাখিয়া, রুদ্ধাশ্রুকম্পিত-কণ্ঠে বলিল—"দেখুন দেখি পিঠ্‌টে! এর নাম কি ছেলেশাসন? চোরের সাজার বেহদ্দ ক'রে তুলেছেন যে! অপরাধটা কি বলুন ত?"—তাহার পর রাধারাণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"তোমার কি পাথুরে প্রাণ, মা-ঠাক্‌রুণ! ছেলেটা পায়রার মত লুটুতে নেগেছে, আর তুমি দাঁড়িয়ে তামাসা দেখ্‌ছ?"

রাধারাণী ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন—"তাই ত! ছেলে বদ দুরন্ত—তা'র শাসন ক'র্‌বে না!"

দাসী-চাকর অধিকদিনের হইলে সকল সময়ে প্রভু ভৃত্য-সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া কথা কহিতে পারে না। মাধাই বলিল—"তোমার নাড়ি-ছেঁড়াটি হ'লে কি আর এ কথা ব'ল্‌তে পার্‌তে?"

তপ্ত তৈলে যেন জলের ছিটা পড়িল! রাধারাণী তীব্রস্বরে বলিলেন—"ব'ল্‌তুম্ না ত কি? এমন বে-আদব্ ছেলে আমি পেটে ধরি না যে, রোজ রোজ বদমাইশী ক'র্‌বে! চাকরের কথা শোন না—যেন দেইজী! আ মর্ মর্! নাড়ি-ছেঁড়া নয় ব'লে'কি একচোখোপনাটা করা হচ্ছে

শুনি?—দশেধম্মে দেখ্‌তে পাচ্ছে ত!—তুইই ত আশ্‌কারা দিয়ে ছোঁড়ার পরকাল খাচ্ছিস্‌!”

মাধাই একটু হাসিয়া বলিল—“আমি ওর পরকাল খাচ্ছি, কি তুমি নাই দিয়ে দিয়ে—দোষ ঢেকে ঢেকে নিজেরটির মাথা খাচ্ছ, তা দশদিন পরেই টের পাবে।”

রাধা। মুখ সাম্‌লে কথা ক’ বল্‌ছি! দুপুর নেই—সন্ধ্যে নেই—যা মুখে আসে বল্‌লেই হ’ল অম্‌নি—আ গেল যা!

তারাচাঁদ মাধাইকে কোন কথা বলিতেছেন না—দেখিয়া, রাগে রাধারাণীর গা কষ্‌কষ্‌ করিতেছিল। মৌনভাবে অবস্থিত তারাচাঁদের প্রতি ভ্রূকুটি-কুটিল, তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া রাধারাণী বলিলেন—“এর বেলা কারু মুখে কথাটি নেই—সবাই যেন কাণের মাথা খেয়েছে! চাকর মুখের ওপরে আমাকে কট্‌কট্‌ ক’রে যা নয় তা শুনিয়ে দিচ্ছে, আর উনি হতভম্ব হ’য়ে, মুড়ো ঝ্যাঁটার মত গোঁপের ঝোড়া নিয়ে, ভুঁড়ি চিতিয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন!” তিনি আর সে স্থানে এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইলেন না;—“মুখে আগুন, চোক-খেকো মা বাপ, সতিনের কাঁটা দেখেও তেজ্‌-বোরের হাতে দিয়ে গেছে, জন্মকালটাই জ্ব’লে-পুড়ে ম’র্‌তে হবে”—ইত্যাদি বলিতে বলিতে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তারাচাঁদ নিজ নিরীহ গুম্ফ ও নিরপরাধ উদরের প্রতি প্রণয়িনীর তাদৃশ অধিক্ষেপ ও অবজ্ঞার উক্তিতে যার-পর-নাই ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়া, ছড়িটা তুলিয়া রাখিতে রাখিতে গম্ভীরভাবে বলিলেন—“কথাগুলো একটু স’মঝে ব’লিস্‌ মেধো!”—তৎপরে শ্রীমতীর ক্রোধভঞ্জন করিতে তিনিও অন্তঃপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চোরের শাসন।

বৈশাখ মাস। মধ্যাহ্নে পথের ধূলা ভাজনা-খোলার বালির মত তাতিয়া উঠিয়াছে। গৃহস্থেরা সকাল সকাল স্নান-ভোজন শেষ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। তারাচাঁদের তথাকথিত বৈঠকখানায় গোবর্দ্ধন-মাষ্টার ও মাধাই-দাস, সাম্যবিধায়িনী নিদ্রায় জাতিভেদ ও পদ-বৈষম্য ভুলিয়া, এক বালিশে মাথা রাখিয়া, ঘাম-জলে সতরঞ্চ ভিজাইতেছে। বাড়ীর ভিতরে, তারাচাঁদ ঘরের মেঝেতে পড়িয়া, নাসিকায় গম-পেষণির শব্দ তুলিয়াছেন। পাশের ঘরে, রাধারাণী আঁচল-ঢাকা বালিশের উপরে ভিজা চুল মেলিয়া ঘুমাইতেছেন। আর এক ঘরে ছেলেরা পড়িতে বসিয়াছিল। মাণিক বইগুলিকে ছড়াইয়া রাখিয়া, কোথায় উঠিয়া গিয়াছে। অমর আঁক কষিতে কষিতে গালে হাত দিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছে।

অবস্থাবিশেষে বালকের সুকুমার চিত্তেও, কোরকের গর্ভে কীটের মত, চিন্তা প্রবেশ করিয়া থাকে। সুখের মন্দিরে, সমৃদ্ধ পিতার ও স্নেহময়ী জননীর তত্ত্বাবধানে, যাহারা স্বচ্ছন্দভাবে লালিত হইয়া থাকে, তাহাদেরই চিন্তাশূন্য বাল্যজীবন সর্ব্বদা আনন্দের ইন্দ্রধনু-রাগে রঞ্জিত থাকে। কিন্তু দুরদৃষ্টের বিড়ম্বনায় শৈশবেই মাতৃহীন হইয়া, যাহাদিগকে অকৃপাবতী বিমাতা ও প্রক্ষীণস্নেহ, নির্দ্দয় জনকের কঠোর শাসনে অবস্থান করিতে হয়, তাহাদের বাল্যজীবন আনন্দৈকরসাশ্রিত হয় না। বিষাদের যেন একটা বৃহৎ তমোবৃত্ত অতি শিশুকাল হইতেই অমরের জীবনকে বেষ্টন করিয়াছিল। আশৈশব সেই বিষাদ-পরিবেশের মধ্যে নিয়ত অবস্থান

করায়, বিমর্ষভাবটা তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। আনন্দ বা স্বচ্ছন্দভাবের সঙ্গে তাহার পরিচয় ছিল না—ভয় ও ভাবনাই তাহার নিত্যসঙ্গী। প্রত্যুষ হইতে রাত্রির সার্দ্ধৈকপ্রহর পর্য্যন্ত সে যাহা কিছু করিয়া থাকে—সমস্তই ভয়ে ভয়ে; প্রভাতের প্রথম বিহঙ্গ-নিনাদের সঙ্গে জাগরিত হইয়া, ভয়ে ভয়ে শয্যা ত্যাগ করে, ভয়ে ভয়ে পড়িতে বসে, ভয়ে ভয়ে আহার করে; আর, বোধ হয়, ভয়ে ভয়েই নিদ্রাও যায়। ভয়ের স্বপ্ন অনেক সময়ে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়। তারাচাঁদকে দেখিলেই সে ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়ে। তাঁহার আরক্ত নেত্রের কুটিল দৃষ্টি দেখিলেই তাহার বুকের অর্দ্ধেক রক্ত যেন শুকাইয়া যায়। মনেও তাহার কতকগুলা ভাবনা প্রবেশ করিয়াছিল। রাধারাণী যখন যাহা করিতে বলেন, সে তদ্দণ্ডেই তাহা করিয়া থাকে—কদাচ তাহার অন্যথা করে না; তথাপি সে তাঁহার চক্ষুশূল। কেন? মাণিককে আড়ালে ডাকিয়া, তিনি গেলাস্ গেলাস্ দুধ, বাটী বাটী মোহনভোগ, ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা খাবার খাইতে দেন। অমর একদিনের জন্যও সে সকলের এতটুকু পায় না—চাহেও না; তবু রাধারাণীর সে লুকোচুরি কেন? মাণিক দুরন্তের শিরোমণি; তথাপি তারাচাঁদ তাহাকে কখন কিছু বলেন না। তাহার দিস্তা দিস্তা জামা ও কাপড় বস্তাপচা হইয়া যাইতেছে, জোড়া জোড়া জুতা ছোট হইয়া যাইতেছে; তবু তাহাকেই তিনি নূতন নূতন জামা, কাপড় ও জুতা কিনিয়া দেন। আর অমরের একখানিও ভাল কাপড় নাই, একটি যেমন তেমনও জামা নাই, সেই কবে একটি জোড়া জুতা কিনিয়া দিয়াছিলেন—সেলাই ও তালিতে তাহা ছোট হইয়া গিয়াছে—সে শুধু-গায়ে, খালি-পায়ে, স্কুলে যায়; তবু আর কিনিয়া দিবার নাম করেন না। কেন? রাধারাণী কেন শুধু মাণিককেই ভালবাসেন—তাহাকে দেখিতে পারেন না, সেটা অমর একটু বড় হইয়া বুঝিতে

পারিয়াছিল ; কিন্তু তারাচাঁদ কেন তাহাকে ও মাণিককে সমান স্নেহের চক্ষে দেখেন না, সেটা অদ্যাপি তাহার নিকটে একটা দুরূহ সমস্যা।

তারাচাঁদের অস্নেহব্যবহার, শিশুকাল হইতেই অমরের হৃদয়ে একটা বেদনা জাগাইয়া, তাহার জননীর অভাবটাকে খুবই বড় করিয়া তুলিয়াছিল। অবসরে ও অনবসরে সর্ব্বদাই তাহার মন জননীর জন্য আকুল হইয়া উঠে। প্রথম অরুণোদয়ের ক্ষীণালোকস্পর্শে, প্রকৃতির নৈশ-তমোবগুণ্ঠন-মোচনের ন্যায়, নবোন্মিষিত জ্ঞানের ক্ষীণ প্রভায় শৈশবের অজ্ঞান-তিমির যখন ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে থাকে, কৌতূহলাবিষ্ট শিশু যে বয়সে অপরিচিত সংসারের অজ্ঞাত বিষয়াবলীর সহিত পরিচিত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করে, সেই সময়ে মাতৃস্নেহের কাঙ্গাল এই বালক, মাধাইদাসকে জিজ্ঞাসা করিত—"মাধাই দা'! আমার মা কোথায় ?" মাধাই প্রথম প্রথম, রাণারাণীই তাহার জননী—এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা পাইত। অমরের তাহাতে তৃপ্তি হইত না। সে সন্দিগ্ধচিত্তে বলিত—"এ মা ত মাণিকের মা, মাধাই দা'! আমার নিজের মা ?"—মাতৃহীন বালকের সেই কাতর প্রশ্নে, ব্যথিত চিত্তের অসতর্ক অবস্থায় একদিন মাধাই যাহা বলিয়াছিল, তাহাতেই অমরের ধারণা হইয়াছিল, তাহার জননী স্বর্গে আছেন, এবং সেই স্বর্গের দেশটা আমাদের এই পৃথিবীর উপরিস্থিত শূন্য-দেশে অবস্থিত। সেই ধারণার বশে অমর এখনও অনেক সময়ে আকুলহৃদয়ে, অনিমেষ-উদশ্রুনেত্রে ঊর্দ্ধদেশে চাহিয়া, যেন নীলাম্বরের তিরস্করণী-অন্তরালে প্রচ্ছন্ন স্বর্গের দ্বার অনুসন্ধান করিয়া থাকে! তারাচাঁদের কঠোর তাড়নায় অধীর হইয়া সে সময়ে সময়ে—'মা গো—মা গো'—বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, অশ্রুপরিপ্লুত-আকুলদৃষ্টিতে, বারংবার আকাশের পানে চাহিয়া দেখে। করুণাময়ী কোন মাতৃমূর্ত্তি স্বর্গের দ্বার খুলিয়া, তাঁহার অনাদৃত, প্রহৃত, রোরুদ্যমান

সন্তানের পানে স্নেহপূর্ণ-কাতরনয়নে চাহিয়া আছেন কি না, সে যেন তাহাই দেখিবার চেষ্টা করে।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে, নীরব গৃহের নির্জ্জন কক্ষে, একাকী বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে দুইবিন্দু অশ্রু অমরের নেত্র হইতে পুস্তকের উপরে ঝরিয়া পড়িল। সে কোঁচার কাপড়ে বইএর পাতা মুছিয়া চোখদুইটি মুছিতেছিল, এমন সময়ে মাণিকচাঁদ নিঃশব্দে আসিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রৌদ্রতাপে ও ঘর্ম্ম-জলে তাহার মুখখানা যেন সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে! চুলের ভিতর হইতে কপালের দুই পাশ দিয়া দর দর করিয়া ঘাম গড়াইতেছে! তৎপ্রতি তাহার মনই নাই। সে কোঁচড় হইতে এক একটা করিয়া লিচু বাহির করিতেছে, দুইহাতে ছাড়াইতেছে, আর টপ্ টপ্ করিয়া মুখে ফেলিতেছে।

অমর জিজ্ঞাসা করিল—"এত রোদে কোথা গেছ্‌লি, মাণিক? এত লিচু কে দিলে রে?"

মাণিক হাতের লিচুটা মুখে ফেলিয়া, আর একটা ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিল—"বই নিয়ে ঘরটির ভেতর ব'সে থাক্‌লে কি আর লিচু আসে? এই দেখ!"—বলিয়া সগর্ব্বে সে তাহার সমগ্র লিচুর ভাণ্ডারটা একবার অমরকে দেখাইয়া দিল; তৎপরে—"চ'টো খাবে?"—বলিয়া, ছোট ছোট চারিটি লিচু অমরের নিকটে রাখিয়া দিল।

অমর সে লোভনীয় ফল-চতুষ্টয়ের পানে একবার চাহিল মাত্র—তাহা স্পর্শও করিল না। মাণিক নীরবে বসিয়া একে একে লিচুগুলিকে উদরসাৎ করিতে লাগিল; এবং শেষ লিচুটি ছাড়াইতে ছাড়াইতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"আমার সঙ্গে আস্‌তে পার ত পেট-ভরা লিচু খাওয়াতে পারি। এই চৌধুরীদের বাগানে, দাদা! একটি গাছ একবারে পেকে টুক্ টুক্ ক'র্‌ছে!"

অমর। সে কি রে, মাণিক!—এই এত লিচু তুই চুরি ক'রে পেড়ে এনেছিস্?—না ভাই, আমি খেতে চাই না—এ কটাও তুই খা! আর যাস্‌নি কিন্তু—মালী টের পেলে ভারি হাঙ্গাম করবে।

"কলাটি কর্‌বে—টের পেলে ত? সে শালা কুঁড়েতে প'ড়ে বাবার মত নাক ডাকাচ্ছে"—বলিয়াই মাণিক নিষ্ক্রান্ত হইল, এবং দুই পায়ের দশটি আঙ্গুলে নিঃশব্দে চলিয়া নিমিষের মধ্যেই অদৃশ্য হইল।

মাণিক চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই বাড়ীর বাহিরে একটা উড়িয়া মালীর কচ্‌কচানি নিদ্রিতগণকে জাগাইয়া তুলিল। জাগিল না শুধু অমর; সে একাকী বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে সেইমাত্র ঘুমাইয়াছিল।

তারাচাঁদ অকাল-বোধনে বিরক্ত হইয়া, ব্যাপারটা কি ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন। রাধারাণী উঠিয়া, চুল জড়াইতে জড়াইতে এ-ঘর সে-ঘর করিয়া মাণিক্‌কে খুঁজিতে লাগিলেন; তাহাকে দেখিতে না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার স্নেহের দুলাল কোঁচড়ভরা লিচু লইয়া, নিরুদ্বেগে অন্দরের দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে, রাধারাণী তাহা বুঝিতে পারিলেন; এবং ছুটিয়া গিয়া নিম্নস্বরে—"লুকিয়ে ফ্যাল্ রে হতভাগা ছেলে! শুন্‌তে পাচ্ছিস্ না?"—বলিয়া, তাহাকে ঘরে টানিয়া আনিলেন। মাণিক একটা লিচুতে কামড় দিয়া, খোলা ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিল—"কলাটি ক'র্‌বে; ধ'র্‌তে পেরেছে না কি যে এত ভয়? তখন এক কোঁচড় পেড়ে এনেছিনু—শালা টেরও পায়নি! এবারেও পেত না, মা!—একটা শুক্‌ন ডালে পা দিয়েছিনু—সেইটে মট্ ক'রে ভেঙ্গে যেতেই শালা বেরিয়ে প'ড়েছে!"

"অম্‌রা যায়নি?"—"না; দাদাকে কত ডাক্‌নু—গেল না।"—"আচ্ছা এর পর খাস্ তখন—এখন বেরিয়ে চল্"—বলিয়া রাধারাণী মাণিককে

বাহিরে আনিয়া ঘরে শিকলটি তুলিয়া দিয়াছেন, এমন সময়ে তারাচাঁদ কৃতান্তের সহোদরের ন্যায় পুত্র-শাসন-দণ্ড সেই ছড়ি হাতে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মাণিককে দেখিতে পাইয়া, তারাচাঁদ রোষকষায়িতনেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই চৌধুরীদের বাগানে লিচু চুরি ক'র্‌তে গেছ্‌লি?"

মাণিক যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল—"বা! আমি ত ঘরে ছিনু —মাকে জিগেসা কর দেখি!"

রাধারাণী ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—"তবে আর মজা কি! যে যাই করুক, তাল প'ড়্‌বে এসে মাণিকের ঘাড়ে! 'ও-ঘরটায় গিয়ে একবার দেখে এস দেখি.!"

তারাচাঁদ সেই ঘরে গিয়া দেখিলেন, অমর ঘুমাইতেছে; কিন্তু তাহার পাশেই চারিটা লিচু, আর চারিধারে লিচুর আঁটি ও খোলা ছড়ান! রাধারাণী পশ্চাৎ হইতে বলিলেন—"ছলা ক'রে আবার চোক বুজে কেমন প'ড়ে র'য়েছে দেখনা!—ছেলে যেন ঘুমিয়ে কাদা!"

তারাচাঁদ, নিদ্রিত, নিরপরাধ অমরের অনাবৃত পৃষ্ঠে সপাং সপাং করিয়া ছড়ির দাগ বসাইতে আরম্ভ করিলেন। রাধারাণী তাঁহার সাধু-পুত্রের সহিত দাঁড়াইয়া চোরের শাসন দেখিতে লাগিলেন।

মাধাইকে আসিতে দেখিয়া, তারাচাঁদ আরও জোরে জোরে আঘাত করিতে করিতে হাঁকিয়া বলিলেন—"আজ আর একটি পাও এগোস্‌নি বল্‌ছি, মেধো!—ঐখানে দাঁড়িয়ে চোরের শাস্তি দেখে যা!"

মাধাই, কি ভাবিয়া বলা যায় না, আজ আর বাধা দিতে গেল না; স্বগতভাবে—"হুঁঃ—কাজীর বিচার আর কি—ষাঁড়ে খেলে ধান, আর বাঁধা গেল তাঁতী!"—বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে যথাকালে রাধারাণী একটিবার হাঁকিয়া অমরকে ভাত খাইতে

ডাকিলেন। সে উঠিল না—তাহার উঠিবার শক্তিও ছিল না। আর কেহ তাহাকে ডাকিল না। মাধাইও রাত্রিতে ভাত খাইতে আসিল না, শয়ন পর্য্যন্ত করিল না। সে একস্থানে, একভাবে বসিয়া, বিশ ছিলিম তামাকু পোড়াইয়া ফেলিল। গোবর্দ্ধন, ঘুম ভাঙ্গিলেই শুনিতে পাইতেছিল, মাধাই ভুড়্ ভুড়্ করিয়া তামাকু টানিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে ময়াল সাপের মত এক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অপ্রত্যাশিত।

প্রভাতে গোবর্দ্ধন দেখিল, মাধাই নাই; তামাকু খাইবার জন্য কলিকা খুঁজিয়া দেখিল, মাধাইএর থেলো হুঁকাটিও নাই! পরে দেখিল, ঘরের কোণে, দড়ির আলনায় মাধাইএর ময়লা কাপড় ও তেলচিটা-ধরা গামছাখানিও ঝুলিতেছে না! তাহার মনটা কেমন হইয়া গেল।

মধ্যে মধ্যে মাধাই এমন দুই একদিন থাকে না; পাড়ার লোকের তত্ত্ব-তাবাস লইয়া এখানে ওখানে যায়। কিন্তু সে কোথাও গিয়া দুই তিন দিনের বেশী বিলম্ব করে না। এক দিন, দুই দিন, করিয়া সপ্তাহ চলিয়া গেল, তবুও মাধাই ফিরিয়া আসিল না; তখন সকলেই বুঝিল, সে রাগ করিয়া কোথাও চলিয়া গিয়াছে।

উচিত কথাগুলা যে মুখের উপরে কট্ কট্ করিয়া শুনাইতে পারে, পুরাতন বা গুণের হইলেও সে চাকরকে আর যিনি দেখিতে পারেন—পারুন, রাধারাণী তাহা পারেন না। সুতরাং মাধাইএর চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার বিশেষ আনন্দই হইয়াছিল। তারাচাঁদেরও ইহাতে অল্প আনন্দ

হয় নাই। গোবর্দ্ধন ও মাধাই দুইজন কুপোষ্য-পালনের অপব্যয়ে ইচ্ছা না-থাকিলেও বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তাহা করিতে হইতেছিল। সাপ মারিতে শিবের গায়ে লাঠি পড়ে—গোবর্দ্ধনকে তাড়াইবার কথা বলিলে রাধারাণীর মুখ ভার হয়। আর মাধাইকে তাড়াইতে হইলে তাহার মাহিনার বাকী বকেয়া বেবাক চুকাইয়া দিতে হয়। বাকীও অনেক দিনের পড়িয়াছে—হিসাব করিলে নিতান্ত অল্প টাকা হইবে না। টাকা না দিয়া হাঁকাইয়া দিলে যদি কেবল ধর্ম্মের নিকটে অপরাধী হওয়া হইত, তাহাতে তারাচাঁদের ভয় ছিল না। ধর্ম্ম যে অতি নিরীহ দেবতা—কালী, শীতলা প্রভৃতির মত উগ্র দেবতা নহেন, তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া যে খুবই সহজ, তারাচাঁদ তাহা বেশ জানেন। শুধু তাঁহার কেন, অনেকেরই, বোধ হয়, এইরূপ বিশ্বাস। তবে আমলটা ত আর ধর্ম্মের নহে; আর আদালতের পথও সেকালের যোগ-মার্গের মত শুধু ব্রাহ্মণের জন্যই উন্মুক্ত নহে। এ পথ, ছোট বড়, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, হিন্দু মুসলমান, প্রভু ভৃত্য, সকলের পক্ষেই তুল্য অবারিত। সুতরাং পাওনা টাকা না-দিয়া মাধাইকে তাড়াইয়া দেওয়াটা তিনি নিরাপদ মনে করিতেন না। এখন সে যদি স্বেচ্ছায় তাহার দাবী দাওয়া ছাড়িয়া দিয়া, চলিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

মাধাইএর চলিয়া যাওয়ায় আনন্দ হয় নাই শুধু অমরের আর গোবর্দ্ধনের। মাধাই শুধু গোবর্দ্ধনের তামাকুর বা রাত্রিবাসের সঙ্গী নহে—তাহার ভগিনী-গৃহ-বাসের সহস্র দুঃখের ভাগী। একত্র থাকিয়া এক রকমের দুঃখ যাহার সঙ্গে এক দিনও ভোগ করা যায়, তাহার সঙ্গে যে একটা সৌহৃদ্য সংস্থাপিত হয়, বহুদিন কাহারও সহিত একত্র আনন্দ-সুখ-সম্ভোগে, বোধ হয়, তাহা হয় না। গোবর্দ্ধনের মনে আদৌ সুখ ছিল না। মনটা তাহার যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা—সর্ব্বদাই সে যেন ভারি

অন্যমনস্ক। আধঘণ্টা ধরিয়া ভাঙ্গা পাখার বাতাস দিয়া, কতদিন সে কলিকায় ভিজা টিকার আগুন জগকাইয়াছে; কিন্তু হাজার টানেও ধোঁয়া বাহির করিতে পারে নাই ; শেষে চালিয়া দেখিয়াছে, তামাকু সাজিতেই তাহার ভুল হইয়াছে। রাত্রে বা দিনে চোখ বুজিলেই গোবর্দ্ধন স্বপ্ন দেখে, মাধাই, গামছা-জড়ান কাপড়ের পুটলী এবং থেলো হুঁকা হাতে করিয়া আসিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিতেছে—"ভাল আছ ত, মামা-ঠাকুর ?" অধিক দিন গোবর্দ্ধনকে মাধাইএর দুর্ব্বিষহ বিরহ-যাতনা ভোগ করিতে হইল না ; পনের কুড়ি দিন পরেই একদিন তাহার স্বপ্ন সত্য হইয়া গেল।

মাধাই ফিরিয়া আসিবার পাঁচ সাত দিন পরে, একদিন বেলা দশটার সময়ে ঘরে বসিয়া তারাচাঁদ, কত দরের কত ভরি সোণার কি গহনা বাধা রাখিয়া, কাহাকে কত সুদে কত টাকা কর্জ্জ দিয়াছেন, তাহারই হিসাবটা দেখিতেছিলেন ; এমন সময়ে গোবর্দ্ধন আসিয়া বলিল যে, বাহিরে জনৈক প্রাচীন ভদ্রলোক তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

তারাচাঁদ খাতার উপরে চাহিয়াই অন্যমনে বলিলেন—"কে আবার ! —বলে কি ?"

"বোধ হয়, আপনার জানা শুনা কেউ হবেন ; আপনার নাম ক'রে বল্লেন—বাড়ীতে থাকে ত তা'কে একবার ডেকে দাও, আর হাঁড়িতে দু'টি বেশী ক'রে চাল নিতেও ব'লে দিও !"—তারাচাঁদ ভাবিতে-ছিলেন, কেহ গিনি সোণার গহনা বাঁধা রাখিয়া চোটা সুদে মোটা টাকা ধার করিতে আসিয়াছে। হাঁড়িতে চাল লইবার কথায় চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—"হ্যাঃ ! চাল অম্‌নি আসে আর কি ! বাড়ীতে নেই ব'লে ভাগিয়ে দিতে পার্‌লি না ? আছি—ব'লেছিস্ না কি ?"—"তা ব'লেছি

বৈ-কি”—“কোথাকার কে—না জেনে শুনে, আগে ব’ল্‌তে গেলি কেন ? ব’ল্‌গে যা—আমি বাড়ীতে নেই—আর বাকী সবার নেমন্তন্ন হ’য়েছে—উনন্ জ’ল্‌বে না।”

এদিকে গোবর্দ্ধনের বিলম্বে, তারাচাঁদ বাড়ীতে নাই—বুঝিয়া, কাহারও অভ্যর্থনার প্রতীক্ষা না করিয়াই আগন্তুক ধীরে ধীরে—“তোমরা কে কোথা গো—তারাচাঁদ বাড়ীতে নেই বুঝি ?”—বলিতে বলিতে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলেন। তারাচাঁদ, রাগে কথাগুলি বেশ একটু হাঁকিয়াই বলিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত কথা আগন্তুকের কর্ণগোচর না হইলেও শেষের কথাগুলি তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন ; তাহাতেই হাসিতে হাসিতে একবারে তারাচাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—“আমার জন্যে যা হয় কিছু ভাতে দিয়েও দু’টি ভাত হবে এখন, তারাচাঁদ !—আমি আজ তোমার অতিথি।”

তারাচাঁদ অপ্রতিভ হইয়া, শশব্যস্তে বাহিরে উঠিয়া আসিলেন ; এবং প্রণামান্তে আগন্তুকের পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন—“এতকাল পরে যে আজ আপনার তারাচাঁদকে মনে প’ড়েছে, তা কি ক’রে জান্‌ব বলুন ?—আমি ভেবেছিনু—আর কেউ।”

আগন্তুক। তা হ’ক—তোমরা সব ভাল আছ ত ?—তোমার ছেলেরা কোথা—দেখ্‌ছি না যে ?

তারাচাঁদ আগন্তুককে আসন প্রদান করিয়া, বৃষভবিনিন্দিতকণ্ঠে অমর ও মাণিককে হাঁকিয়া বলিলেন—“ওরে তোরা সব কোথা গেলি—কি ক’রে বেড়াচ্ছিস্ ? হেথা আয়—প্রণাম কর্—পায়ের ধূলো নে !”

রাধারাণী আধঘোমটা টানিয়া আসিয়া, আগন্তুককে প্রণাম করিয়া গেলেন। মাধাই কোথায় ছিল—ছুটিয়া আসিল ; এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, কোঁচার খুঁটে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া জিহ্বাগ্রে ও মস্তকে স্পর্শ

করিল। মাণিক দূর হইতেই দাঁড়া-প্রণাম করিয়া, আড়চোখে চাহিতে চাহিতে সরিয়া পড়িল। অমর নিকটে আসিয়া, যথারীতি প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। আগন্তুক তাহার পানে সস্নেহদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"বুড়োটাকে চিন্‌তে পার হে ভাই ?"

অমর বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া, সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া নতমস্তকে নীরবে অবস্থান করিল।

তারাচাঁদ বলিলেন—"তা কি ক'রে পার্‌বে বলুন ? মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া থাক্‌লে পার্‌ত—আট দশ বছর ত এদিকে আসাই নেই।"

গোবর্দ্ধন একটু দূরে উদাসীনবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রণামের ঘটা দেখিতেছিল ; আর মধ্যে মধ্যে আগন্তুকের স্কন্ধবিলম্বিত, শ্বেতকৃষ্ণ-মিশ্রিত, কুঞ্চিতাগ্র কেশকলাপ, প্রচুর ভ্রূযুগ, মস্তকার্দ্ধের সহিত মিলিত, বিশাল ও উন্নত, নিটোল ললাট, কৃষ্ণতার দীর্ঘনেত্রের উজ্জ্বল ও মধুরে মিশ্রিত, তীক্ষ্ণ ও স্নিগ্ধ দৃষ্টি, শ্যেনচঞ্চু-বিড়ম্বিত, ঈষদ্‌বঙ্কিমসূক্ষ্মাগ্র নাসা, শ্মশ্রুবিবর্জ্জিত, প্রশান্ত-সুন্দর মুখমণ্ডল, এবং গৌরকান্তিবিশিষ্ট, নাতিস্থূল, উন্নত ও জ্যোতিঃপুঞ্জ কলেবরের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল,—অতিথি ব'লে এলেন ইনি কে—এঁদের গুরুঠাকুর কি ? পরিচ্ছদাদি ও কথা-বার্ত্তায় কিন্তু আগন্তুককে পেশাদার গুরু বলিয়াও তাহার প্রত্যয় হইতেছিল না। তাঁহার মুখের ভাবে এমন একটা কমনীয়তা, এবং কণ্ঠস্বরে এমন একটা পূর্ণতা, গাম্ভীর্য্য ও মিষ্টতা আছে যে, একবারমাত্র তাঁহাকে দেখিলে বা তাঁহার কথা শুনিলেই মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। গোবর্দ্ধনের মনে হইতেছিল, অন্যান্য সকলের মত সেও এই সৌম্যদর্শন অতিথির চরণ-প্রান্তে মস্তক লুটাইয়া প্রণাম করে। কিন্তু প্রণাম করিলেই তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন। সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতের নিকটে তারাচাঁদের গৃহাশ্রিত-শ্যালকরূপে পরিচিত হওয়াটা তাহার বড়ই

লজ্জাজনক বোধ হইল। সে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িতেছিল; একটু দূরে আসিয়া শুনিতে পাইল, আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"ওটি কে—তারাচাঁদ?"—"ওটি ছেলেদের মামা—তা'দের মাষ্টারও বটে।"—"বেশ বেশ, তোমার এখানে থেকে পড়াশুনা করে বোধ হয়?"—"না, লেখা-পড়া অনেক দিন ভাতেপোড়া হয়ে গেছে; খায়দায় থাকে, আর তাস খেলে তামাক খেয়ে হো হো ক'রে বেড়ায় আর কি।"—"কাজ কর্ম্ম নেই, ছেলে মানুষ একটু খেলা টেলা করবে না?—তুমি ওকে একটা কাজ জুটিয়ে দাওনি কেন?"—"দিলেই কি করতে পারবে, মশায়! কিছু নয় কিছু নয়—বুদ্ধিশুদ্ধি আদৌ নেই।"—"কেন পারবে না? খুব পারবে—তুমি জুটিয়ে দিয়ে দেখ দেখি! কাজ প্রথমে পাওয়াটাই কঠিন—পেলেই বুদ্ধি জোগায়। কাজ ত আর গ'ড়ে নেওয়া যায় না; কিন্তু কাজ মানুষকে গ'ড়ে পিটে ঠিক্ ক'রে নেয়।"

শুধু আকৃতিমাত্র দেখিয়াই আগন্তুকের প্রতি গোবর্দ্ধনের যে শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মিয়াছিল, তাঁহার কথা শুনিয়া তাহা শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। সে মাধাইকে একান্তে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দেব্‌তার মত এই অতিথ্‌ কে বল দেখি, মাধাই?"

মাধাই গম্ভীরভাবে একটু হাসিয়া বলিল—"ইনিই অমরের দাদামশায়—সীতেনাথ চৌধুরী।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শাপে বর।

সীতানাথের আগমনে তারাচাঁদের গৃহে যেন একটা নূতন বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। সে হাওয়ার গুণে সবই বিপরীত ভাব ধারণ করিল। বায়কুণ্ঠ তারাচাঁদ অমিতব্যয়ী হইয়া উঠিলেন। কটুভাষিণী,

মুখরা রাধারাণী আজ মধুরস্মিতভাষিণী। চিরবিমর্ষ অমর যেন একটু সহর্ষ। মাণিকের চাঞ্চল্যেও যেন একটা থম্‌থমে ভাব লক্ষিত হইতেছিল। আহারাদির ব্যবস্থাতেও প্রাত্যহিক্ তালিকার বিপর্য্যয় ঘটিল।

তারাচাঁদের গৃহে নিত্যভোজনের ব্যবস্থাটা বলিবার মত। দোকানের যত পোকাধরা, মোটা, আকাঁড়া, ঝাড়াপড়া, পাঁচমিশালি, সস্তার চাল—পয়সা দিয়া যাহা কেহ লইতে চাহে না, তাহাই তারাচাঁদ বাড়ীর খরচের জন্য পাঠাইয়া দেন। দোকান বাজারও তিনি স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া করিয়া দেন, মাধাই বহিয়া আনে মাত্র। সুতরাং তোবড়া বেগুণ, শুকান থাড়া, পাকা ঝিঙ্গে, হাজান পটল, রাঙ্গা উচ্ছে, পচা বাদ দিয়া চেরা কুমড়ার ফালি, এবং সদ্যঃপ্রসূত সফরীশিশু ও বালচন্দ্রিকাদি যত ক্ষুদ্র মৎস্য বা মৎস্যাণু তাহাই বাড়ীতে আইসে। তবে রাধারাণীর অম্লের পীড়াটা কিছু প্রবল ছিল—শাকপাতাড় যা তা তাঁহার হজম হয় না বলিয়া, আর মাণিকটি তাঁহার গর্ভজাত অতএব তাহারও এই রোগটা এখন চাপা থাকিলেও পরে ফুটিতে পারে এই আশঙ্কাতেই বোধ হয়—তাহাদের দুইজনের জন্য কিছু কিছু মিহি চাল, টাট্‌কা আনাজ ও ভাল মাছ কিনিয়া দিতে হয়। সে সকল আর কেহ দেখিতে পায় না—তারাচাঁদ তাহা কিনিবার সময় দেখিতে পান মাত্র। বাকী সকলের জন্য সেই আমড়াআঁঠি-ধানের বুক্‌ড়িচালের ভাত, গৃহস্থের হিতসাধক মাস-কলায়ের ডাল—তাহাতে কলায়ের একটা কণা বা খোসাও কখন কাহারও হাতে ঠেকে না, হলুদজলে ধোয়া থাড়া-চড়চড়ি, আর দর্‌কচা-পড়া বেগুণের সঙ্গে অতিবিরল দুই একটা চুনোপুঁটী ও চাঁদকুড়া মাছের অম্বল—তাহার দশ ক্রোশ দূর দিয়াও কখন গুড়ের গাড়ী চলে না, সুতরাং জিহ্বাগ্রদ্বারা স্পর্শ করিলেই সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা বৈদ্যুতিক কম্প উপস্থিত হয়। গোবর্দ্ধন বলিয়া থাকে—"হর্‌তকী চিবিয়ে খেতে না বস্‌লে দিদির রান্না

মুখে করা যায় না।" মাধাইও বলে—"খাওয়া দাওয়া যা হচ্ছে মামা-ঠাকুর, কখন যদি গারদে গিয়ে দশ দিন থাকৃতে হয়, ত তা'তে বড় কষ্ট হবে না—সে খাওয়া শ্বশুরবাড়ীর খাওয়া ব'লে মনে হবে"। আজি-কার ব্যবস্থা সেরূপ হইল না।

মাধাই ও গোবর্দ্ধন, দোকান ও বাজার লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। তারাচাঁদ আহারাদির বন্দোবস্ত লইয়াই বিব্রত। রাধারাণীকে কুটনা বাটনা সমস্তই করিয়া লইয়া রাঁধিতে হইতেছে; কাজেই তাঁহার হাঁপ ছাড়িবার অবসর নাই। সকলকেই বেশ একটু ব্যস্ত দেখিয়া, মাণিক ভাঁটা ট্যাকে করিয়া বাহির হইয়াছে। সীতানাথ স্নান, আহ্নিক ও জলযোগ সারিয়া, বাড়ীর সম্মুখের খোলা জমিতে একটু পদচারণ করিতে-ছিলেন। অমর তাঁহার হাত ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছিল। প্রথম পরিচয় হইতেই সে ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল।

ঊষারাণী মুক্তার মত দাঁতগুলি বাহির করিয়া, হাসিতে হাসিতে ক্রোড়স্থ শিশুকে সম্মুখে ধরিয়া যে দিন সীতানাথকে বলিয়াছিল—"দেখ দেখি, বাবা—তোমার চাকর হবার মতটি নয়?"—সে আজ অনেক দিনের—প্রায় দশ এগার বছরের কথা। সেই শিশু আজ এত বড়টি হইয়াছে; কিন্তু সে ঊষা আজ কোথায়—কতদূরে—বিশ্বের কোন্ প্রান্তে, কি ভাবে রহিয়াছে—এ পৃথিবীর কোনও দেশে নবজীবনের প্রভাত আরম্ভ করিয়াছে কি না—তাহা কেহ বলিতে পারে? দূর অতীতের আরও অনেক কথা মনে জাগিয়া, সীতানাথের কথা কহিবার প্রবৃত্তিকে যেন সুপ্তিমগ্ন করিয়া দিয়াছিল। তিনি নীরবে, ধরানিবদ্ধদৃষ্টিতে ধীরে ধীরে বিচরণ করিতেছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে এক একবার অমরের মুখপানে স্নেহস্তিমিতনেত্রে চাহিয়া, নিঃশব্দে এক একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন।

অমর ধীরে ধীরে অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"দাদামশায় !"

সীতানাথ উত্থিত চরণের গতি রোধ করিয়া একটু ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে উত্তর করিলেন—"কেন—দাদা ?"

অমর নতমুখ—নীরব ; যাহা বলিবে মনে করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারিল না। তাহার চোখদুটি ছল্ ছল্ করিতেছে দেখিয়া সীতানাথ তাহাকে টানিয়া লইয়া আবার পূর্ব্বের মত বেড়াইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে অমর আবার সেইভাবে ডাকিল—"দাদামশায় !"

সীতানাথও আবার ঠিক পূর্ব্বেরই মত ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিলেন—"কেন, দাদামণি ?"

অমর কথা কহিল না—মুখ নত করিয়া রহিল। সীতানাথ বলিলেন, "কি বল্‌বে বল না, দাদা !—লজ্জা কিসের ?"

অমর। এতদিন আসেননি কেন ?

সীতা। কাজের গতিকে অনেক দূরে গিয়ে প'ড়েছিলেম, ভাই,—তাই আস্‌তে পারিনি, দাদা আমার !

অমর বাষ্পাবেগকম্পিতকণ্ঠে—"আমি আপনার সঙ্গে যাব"—বলিয়াই মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল।

সীতানাথ নিজের কোঁচার কাপড়ে অমরের অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে অতিমাত্র স্নেহস্বরে তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—"তা যাবে—তা'র জন্যে আর কান্না কিসের, ভাই ? কাঁদ্‌তে নেই, ছি—চুপ কর !"

বলিতে বলিতেই সীতানাথের উজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টিও যেন সহসা কুহেলিকাচ্ছন্ন তারকার দীপ্তির ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া অমরের অশ্রু মুছাইতে লাগিলেন। তারাচাঁদের নিষ্ঠুর তাড়নায় আকুলহৃদয়ে ভূমিতে লুটিয়া,অমর কতদিন কত অশ্রু ঢালিয়াছে, কোনও দিন ত কেহ এমন করিয়া তাহার অশ্রু মুছাইতে যত্ন করে নাই !

গভীর স্নেহের এ মধুর আস্বাদ তাহার জীবনে এই নূতন—আর কখনও সে ইহা উপভোগ করে নাই।

সীতানাথের কোঁচার কাপড় অনেকটা ভিজিয়া উঠিল, তথাপি তিনি অমরের অশ্রুসিক্ত গণ্ডস্থল পরিশুষ্ক করিতে পারিলেন না। অমর নিজেই নিজের কোঁচার কাপড়ে মুছিয়া মুছিয়া, চোখের জল শুখাইয়া ফেলিয়া বলিল—"আমি আর এখানে থাক্‌ব না, দাদামশায়! এখানে"—এইপর্য্যন্ত বলিয়াই সে থামিয়া চকিতনেত্রে চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। তাহার কথা আর কেহ শুনিতে পাইল কি না, তাহাই দেখিয়া লইল কি? সীতানাথ মৃদু হাসিয়া ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"কিছু বল্‌তে হবে না, ভাই! আমি জানি—সব শুনেছি। মাধাই খুঁজে খুঁজে আমার কাছে গিয়েছিল। তোমাকে নিয়ে যাব—মনে ক'রেই, আমি এসেছি; কিন্তু তুমি মনে ঠিক ক'রে রাখ যে, এবার আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া হবেই না।"

অমরের অচিরশুষ্ক গণ্ড তখনই আবার অশ্রুধারায় প্লাবিত হইল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"কেন হবে না? আমি যাব—আমাকে ফেলে যেতে পাবেন না!"

সীতানাথ একটু হাসিয়া, অমরকে লইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন; এবং বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন—"তোমার্ বাপের কাছে থেকে এত বড়টি হ'য়েছ,—তাঁ'র মত না ক'রে কি আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি? আমি অনেকদিনের পর আজ এই প্রথম এসেছি; তোমার বাপ কি তোমাকে আজই আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন?—আরও দু'একবার আসা-যাওয়া করি। তুমি যদি মনে ক'রে রাখ—আজই আমার সঙ্গে যেতে পার্‌বে, আর যাওয়া না ঘটে, তা হ'লে তোমার এখানে থাক্‌তে যে আরও বেশী কষ্ট হবে, ভাই!"

গোবৰ্দ্ধন সেই সময়ে আসিয়া জানাইল, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে। সীতানাথ অমরকে লইয়া বাড়ীর ভিতরে আসিয়া দেখিলেন, তারাচাঁদ আসনে বসিয়া গিয়াছেন। বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। জলযোগও তেমন ভারি-ভুরি কিছু হয় নাই। তারাচাঁদের জঠরানল যেন খাণ্ডব-দহনের ক্ষুধায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি ডালভাতের তাগাড় মাখিয়া রাখিয়া, অধীর-ভাবে সীতানাথের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; অনুমতি পাইয়াই একটা আঙ্গুল একবার গেলাসের জলে একটু ঠেকাইয়া, সপাসপ্ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কে বা করে পঞ্চগ্রাসের মুদ্রা—আর কেই বা বলে তাহার মন্ত্র!

সীতানাথ আহারে বসিয়া, কথায় কথায়, অমরকে কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবার প্রসঙ্গ করিলেন। গোবৰ্দ্ধন অনুকূল যুক্তি-বাক্যে তাহাতে যথাসাধ্য সহায়তাও করিল। কিন্তু তারাচাঁদ ভাতভরামুখে একটা গম্ভীর "ওঁ—হো" করিয়া প্রস্তাবনাতেই সে প্রস্তাবের উপসংহার করিয়া দিলেন। পরে মুখের ভাতগুলি উদরসাৎ করিয়া তিনি বলিলেন—"সে কি কাজের কথা, মশয়! আপনি নিরীহ লোক—এ সব দুর্দ্দান্ত বদমাইশ ছেলে শাসনে রাখা কি আপনার কাজ? মোটা মোটা কত ছড়ি পিঠে ভেঙ্গে ফেলেছি, তা'তেও ঠিক কর্‌তে পারিনি। তা নয়; তবে বড়সড় হ'ক—ইস্কুলের ছুটিছাটাতে গিয়ে বরং দশ দিন বেড়িয়ে আস্‌বে তখন।" তাঁহার অভিপ্রায় শুনিয়া, অমরের হাতের গ্রাস আর মুখে উঠিল না—হাতেই রহিয়া গেল।

আহারান্তে গোবৰ্দ্ধন পাণ লইতে আসিলে, রাধারাণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"একটি ছেলে এখানে, একটি সেখানে থাক্‌বার কি কথা হচ্ছিল রে, গোবর?"

গোবৰ্দ্ধনের আন্তরিক ইচ্ছা, অমর অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও তারাচাঁদের কঠোর শাসন-গণ্ডির বাহিরে কোথাও গিয়া নিঃশ্বাস

ফেলিয়া বাঁচে। সে বলিল—"কথা হচ্ছিল কি জান, দিদি! এই অমরের দাদামশায়ের ইচ্ছেটা, তা'কে নিয়ে যান, কাছে রেখে লেখা পড়া শেখান; তা চাটুজ্যে মশায়ের তা'তে মত নেই! এদিকে খরচপত্রের টানাটানি করেন, দেখ্‌তে ত পাই—তোমার কাছে ব'লেই বল্‌ছি, তা যে দিকে সুবিধে সে দিক্ দিয়ে যাবেন না।"

রাধারাণী শিরা বাদ দিয়া, পাণ গুলিকে জোড়া জোড়া করিয়া ফেলিয়া, তাহাতে চূণ মাথাইতে মাথাইতে ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"কেন—তাঁ'র অমতটা কি জন্যে?"

গোবর্দ্ধন। এই ত কে বলে! এই যে এত খরচপত্র ক'রে আমাকে রাখা—সহরে একটা মানুষ পোষার খরচ ত বড় কম নয়—তা সে কেবল মাণিকের জন্যেই ত? দু'টি ছেলে এক সঙ্গে পড়্‌তে বস্‌লে কি আর তা হয়? অমর না থাক্‌লে, মাণিকের পড়া কত এগিয়ে যায়—বল দেখি!

সেই সময়ে বাহিরে তারাচাঁদের সাড়া শুনা গেল। রাধারাণী তাড়াতাড়ি একটা পাণ মুড়িয়া গোবর্দ্ধনকে দিয়া বলিলেন—"তুই যা!—পাণ সাজান হ'লে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

গোবর্দ্ধন নিপুণ সূত্রধারের ন্যায় কথার অবতারণা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে, তারাচাঁদ কাণায় কাণায় বোঝাই-করা ভড়ের মত মন্থরগতিতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"এখনো হয়নি—সবে এই চূণকাম হচ্ছে?—তবেই হয়েছে!"

রাধারাণী কোন উত্তর করিলেন না—গম্ভীরভাবে বসিয়া, জাঁতী দ্বারা পাণের উপরে একটু একটু করিয়া খয়ের কাটিয়া ফেলিতে লাগিলেন। তারাচাঁদের আহারটা কিছু গুরুতরই হইয়াছিল। পেটের ভার লইয়া তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না—বসিয়া পড়িয়া হাঁস ফাঁস

করিতে করিতে বলিলেন—"দাওনা সুপুরীর কুঁচোগুলো এই দিকে এগিয়ে, দু'টি দু'টি ক'রে দিয়ে দি !"

রাধারাণী কথা কহিলেন না দেখিয়া, সুপারীর পাত্রটা সরাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে তারাচাঁদ হাত বাড়াইতেছিলেন ; রাধারাণী তাঁহার হাতটাকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—"যাও ! যাও ! আর আমার কাজের সুসার করতে হবে না !—সব পারলুম আর সুপুরী ক'খানা দিয়ে খিলি-কাটা মুড়ে দিতে পারব না ? গাণ্ডে পিণ্ডে খেয়ে, ভুঁড়ি উঁচু ক'রে এসে, 'এখনো হয়নি'—বলতে নজ্জা করে না ? একলা জল তোলা, চাল ধোয়া, কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, রান্না, সাঁতগুষ্টির পরিবেশন, তা'র মধ্যে আবার পাণ সাজান হয় কখন ?"

তারাচাঁদ কিছু অপ্রতিভ হইয়া হাতটি গুটাইয়া লইলেন এবং কোপবতী প্রিয়ার ভ্রূকুটিকুটিল মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া, ভয়ে ভয়ে বলিলেন—"তা বলনি কেন ? জলটা আস্টা না হয় তুলেই দিতুম ! হাঁড়িতে ভাত আছে ত—না আবার চাপাতে হ'ল ?"

রাধারাণী হাসি চাপিয়া, মুখখানিকে যথাসাধ্য গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "হাঁড়িতে ভাত কেন থাকবে না—তুমি আর দু'টি খাবে ? দেখ না—কথা শুনলে গা জ্ব'লে যায় !—যেমন ভুঁড়িটি, বুদ্ধিটিও ঠিক্ তেমনি !"

তারা। যত দোষ আমার এই ভুঁড়ির, আপরাধ কি না—ভাত দু'টি বেশী ধরে ; তাও চোক দিরে দিয়ে শুকিয়ে এনেছ, আর তেমন খেতেও পারি না ! বুদ্ধির দোষটা হ'ল কিসে—শুনি ?

রাধা। নয় ত কি ? ওর দাদা ওকে নিয়ে গিয়ে কাছে রাখতে চাইছে—তুমি অমত কর্‌ছ কেন বল দেখি ? ভাল খাবে, ভাল পরবে, মন্দটা কি ? সত্যি কিছু আমাদের এত পয়সা নেই যে, দু'টি ছেলেকেই সমান আদরযত্ন করতে পারি। দশটা বুড়ো পোষা যায়, ত একটা ছেলে

পালা যায় না। আর বল্‌তে নেই, দিন দিন এখন ওর পেট বাড়্‌তেই চল্‌ল ; শুধু কি পেট—ইস্কুলের মাইনে, বই, জুতো, জামা, কাপড়, সবই। যা দু'পয়সা ক'রেছ, তা যদি সবই এই রকম খেয়ে প'রে, আর ভূত-যগ্‌গি ক'রে খরচই ক'রে ফেল্‌বে, ত দশ দিন বিছানায় প'ড়ে থাক্‌লে কি ক'রে চ'ল্‌বে বল দেখি? জমীদারী নয় যে, কিস্তি কিস্তি ট্যাকা আস্‌ছে! একটা দোকান—দশ মন বেচ্‌লে, ত দু'টো ট্যাকা পেলে ; এইত? বুড়োর অনেক ট্যাকা আছে—শুনেছি ;—যাক্ না নিয়ে, একটা ছেলে মানুষ করা অমনি মুখের কথা বটে? একটা জ্বর জ্বালা হ'লে দশটা ট্যাকা কমেন দিয়ে গ'লে যায়—দেখুক না মজা!

তারা। হ্যাঁঃ—তুমিও যেমন! আজ নিয়ে যাবেন, আর দশ দিন পরেই পেটজোড়া পিলে ক'রে এনে বসিয়ে দিয়ে যাবেন! ওঁদের বর্দ্ধমান অঞ্চলে যে ম্যালেরিয়া!

রাধা। তা কেন? সে কথা তুমি বল্‌বে যে, নিয়ে যেতে হয়, ত একেবারে কাটান ছেঁড়ান ক'রে নিয়ে যান— ওর দায় দফা, মরণ বাঁচন, আজ থেকে সব তাঁ'র, আমাদের সঙ্গে আর কোন লেপ্‌চ থাক্‌বে না।

তারাচাঁদ সহধর্ম্মিণীর এবম্প্রকার মনোহর অথচ হিতকর ও যুক্তিপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। বিধাতার ইচ্ছায় কখন অমৃতও বিষ হইয়া থাকে, আবার কখন বা বিষও অমৃত হয়। রাধারাণীর সপত্নীপুত্রবিদ্বেষ এ ক্ষেত্রে অমরের কল্যাণ বিধান করিল। সে সানন্দে সকলের নিকট বিদায় লইয়া মাতামহাশ্রমে যাত্রা করিল।

অমর চলিয়া যাইবার পরে তারাচাঁদের পিতৃত্বের সমস্তটুকুই মাণিক একাকী অধিকার করিল। অমর বলিয়া যে তাঁহার কোনও পুত্র ছিল, অচিরকালের মধ্যেই তারাচাঁদ সে কথা ভুলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রবাসের পরিজন।

কলিকাতার বউবাজার-অঞ্চলে, ভদ্র গৃহস্থ-পল্লীর মধ্যে, দোতলা একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়া, সীতানাথ বাস করিতেছিলেন। বাড়ীখানি খুব বড় না হইলেও, তাহার ঘরগুলি বেশ বড় বড়; সবগুলিতেই বেশ আলো আসে ও বাতাস খেলে। উপরের দুইটি ঘরের একটিতে ছোট একখানি পালঙ্কে 'নেট্'এর মশারি-ঘেরা একটি পরিষ্কার বিছানা, ছোট একখানি টেবিল, দুইখানি কেদারা, একখানি আরাম-কেদারা, বইভরা দুইটি আলমারী, টেবিলের নিকটে ছোট একটি কাষ্ঠাধারে স্তরে স্তরে সাজান কতকগুলি বই ও বাঁধান খাতা। এইটি অমরের শয়ন ও অধ্যয়ন-কক্ষ। আর একটিতে সীতানাথ থাকেন। নীচের পাঁচটি ঘরের মধ্যে বড়টি বৈঠকখানা। একটিতে পাচক ও পরিচারকের দুইটি স্বতন্ত্র শয্যা, দুই তিনটি হুঁকা ও তামাকুর সরঞ্জাম। একটিতে রান্না হয়। একটিতে পরিচারিকা থাকে। আর একটি ভাণ্ডার। শেষোক্ত ঘরের একধারে তক্তপোষ পাতিয়া গৌরী নাম্নী এক প্রাচীনা ব্রাহ্মণ-কন্যা অবস্থান করেন। পাচক, পরিচারক, পরিচারিকা ও গৌরীঠাকুরাণী ইহারা সকলেই পূর্ব্বে সীতানাথের পল্লী-গৃহে ছিল। অমরের অধ্যয়ন উপলক্ষে তিনি তাহাদিগকে কলিকাতার বাসাবাড়ীতে আনিয়াছেন। তাঁহার প্রবাসের এই পরিজনবর্গের মধ্যে অমর

ব্যতীত আর সকলেই পাঠকের অপরিচিত। অতএব প্রস্তাবিত বিষয়ের আখ্যানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহাদের পরিচয় সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা অপ্রধান হইলেও বলিয়া রাখায় বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না।

পাচক-প্রসবিনী জেলায় জন্ম হইলেও রন্ধনকার্য্যে রামকুমার চক্রবর্ত্তীর তাদৃশ দক্ষতা ছিল না। কার্য্যে পটুতা না থাকিলেও, কথায় রামকুমার-ঠাকুর আধঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া দিতে পারে, এবং হাতেহেতেরে ডালভাত যথারীতি পাক করিতে না পারিলেও মুখে মুখে কালিয়া, পোলাও, কোর্ম্মা, কোপ্তা, কাবাব, কাটলেট প্রভৃতি খুব ভাল প্রস্তুত করিতে পারে। গৌরী-ঠাকুরাণীর গঞ্জনার জ্বালায়, গরিব 'গেঁটের কড়ি' ভাঙ্গিয়া পাক-প্রণালী সম্বন্ধে আধুনিক দুই তিনখানা বই কিনিয়াছিল এবং— "অপক্কে লবণং দদ্যাৎ"—ইত্যাদি কতিপয় বচনও, ইহার উহার-তাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল ; কিন্তু প্রয়োগটা বিধিমত করিয়া উঠিতে না পারায়, ব্যঞ্জনাদি কাহারও মুখরোচক হয় না। তবে তাহার রান্নার একটা প্রধান গুণ এই যে, তরকারীগুলি কেহ খাইতে না পারিলেও তাহা নষ্ট হইবার মত হয় না। ঝোল, সুক্তা প্রভৃতির আনাজগুলি তাহার হাতের গুণে এক প্রকার অজহদ্বর্ণ হইয়া উঠে। সে সকল, নিজ নিজ মৌলিক বর্ণ কদাচ পরিত্যাগ করে না ; সুতরাং অনুচ্ছিষ্ট থাকিলে পরদিন আবার পাক করাও চলিতে পারে। আর রন্ধনের ঘৃত, তৈল প্রভৃতির ত কথাই নাই, সে সকল কোনও দিনই বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় না—সব এক একটা গুপ্তপাত্রে সঞ্চিত থাকে ; পাঁচ দিনের জমা হইলেই রামকুমার একদিন তত্তাবৎকে বৎকিঞ্চিৎ তাম্রকূটমূল্য করিয়া লয়।

ভৃত্য ভজহরি জাতিতে নাপিত। "নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ"—এই প্রবাদ-বচনের সার্থকতা কিন্তু তাহাতে সম্যক্ লক্ষিত হয় না। জাতীয়

বৃত্তির উপরে তাহার দারুণ বিদ্বেষ। শুধু কামিজ-আঁটা, মধর বাবুদের নরম গালে জল-মাখান চড় বুলাইয়া পয়সা পাইবার মত হইলে, তাহাতে তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু ব্যবসায় করিতে হইলে সব সময়ে তাহা চলে না; অনেক সময়ে অনেক ভদ্রেতর জাতীয়ের ফাটা পাও ধরিতে হয় এবং আরও অনেক সভ্যতা-বিগর্হিত, আপত্তিজনক কার্য্যও করিতে হয়। তাহাতেই সে চাকরি স্বীকার করিয়াছিল।

পাকা গোঁফ যে মুখের শ্রীবৃদ্ধি করে না, বরং তাহার শোভা হরণ করিয়াই থাকে, কিছুদিন জাতীয় বৃত্তিতে থাকিয়া ভজহরি বোধ হয় এই অভিজ্ঞতাটা লাভ করিয়াছিল। ফলতঃ তাহার মুখখানি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মত কামান। আর বয়োধর্ম্মেই বোধ হয় তাহার অন্তরে একটু ধর্ম্মভাবেরও উদ্রেক হইয়া থাকিবে; কারণ, ইদানীং সে মাথায় একটি সভাধরণের টিকি এবং গলায় একছড়া তুলসীর কণ্ঠী ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্মের গতি যেমন সূক্ষ্ম ও স্থিতি যেমন "সদসৎ-সংশয়গোচর", ভজ'র শিরস্থিতা এই ধর্ম্মধ্বজাও সেইরূপ—আছে কি না, তাহা সব সময়ে বুঝিয়া উঠা যায় না। ধর্ম্মার্জ্জনের পথটাও নিয়তই বিঘ্নসঙ্কুল। ভজ'র ধর্ম্মার্জ্জনী শিখা ও বিষ্ণুভক্তি-বিজ্ঞাপনী কণ্ঠী পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্তা। আকারে বৈষ্ণব প্রতীত হইলেও আচারে সে কিছু শাক্তভাবাপন্ন। মৎস্য বা মাংস না হইলে ভোজনে ভজহরির তৃপ্তি হয় না। সীতানাথের বাড়ীতে বৃথামাংসের প্রবেশ ত একেবারেই নিষিদ্ধ—মাছও সবদিন আসে না। তিনি স্বয়ং নিরামিষভোজী, আর তাঁহার দৃষ্টান্তেই বোধ হয় অমরেরও সামিষ ভোজনে রুচি ছিল না। পরিচারিকা শূদ্রা হইলেও গৌরীঠাকুরাণীরই মত বৈধব্যের কঠোর নিয়মপালনের পক্ষপাতিনী। অগত্যা ভজহরিকে চাটের দোকান হইতে নিজের পয়সায় রান্না মাছ বা মাংস কিনিয়া আনিতে হয়। এ কার্য্যটা সে

খুব সাবধানেই করিয়া থাকে ; কিন্তু মানুষ কতদিন সাবধান হইয়া চলিতে পারে ? মাঝে মাঝে ভজহরির লুকোচুরি প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রকাশ হইলেই বিপদ। প্রথম যেদিন তাহার এই কার্য্য প্রকাশ পায়, সেদিন বুঝি আবার সে সুবিধামত মাছমাংস কিছু না পাইয়া, ঝাল-কাঁকড়া আর হাঁসের ডিম ও পিয়াঁজের বড়া কিনিয়া আনিয়াছিল। রামকুমার ঠাকুর তাহা প্রথমে জানিতে পারে এবং জানিতে পারিয়াই—"তুই যদি এই সবই খাবি, তবে তোর এসব ভণ্ডামি কেন ?"—বলিয়া ভজ'র কণ্ঠী ছিঁড়িতে উদ্যত হয়। 'ষণ্ডা রাঁধুনী-বামুন'এর নিকটে যুক্তির কথা বৃথা বুঝিয়া, সুবুদ্ধি ভজহরি অমরের নিকটে উপস্থিত হইল। সে ভাবিয়াছিল, অমর ইংরাজী পড়িতেছে—তাহার এ সকল কুসংস্কার দূর হইয়াছে ; না হইলেও বুঝাইয়া বলিলে সে অবশ্যই বুঝিবে যে, কাঁকড়া সাধারণ জলজন্তু নহে—সাক্ষাৎ বিষ্ণু রামচন্দ্রের জনক, পরম ধার্ম্মিক রাজা দশরথেরই মূর্ত্যান্তর ; পিয়াঁজ নির্দ্দোষ তৃণমূলমাত্র, আর হাঁসও স্বয়ং ব্রহ্মার বাহন—পরম পবিত্র জীব, তাহার ফলবৎ বিশুদ্ধ ডিম্ব কখন অভক্ষ্য হইতে পারে না। কিন্তু—"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার"—ভজ'র শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তিপূর্ণ বিচারের কথা অমরের নিকটে বৃথা হইল। "ব্রহ্মার বাহন ব'লে হাঁস বা তার ডিম যদি পবিত্র হয়, তবে শিবের বাহনেই বা দোষটা কিসের ? তোর যা ইচ্ছে তাই খা গে' যা, কিন্তু মাথায় টিকি রেখে হিঁদু ব'লে পরিচয় দিতে পাবি না"—বলিয়া সেও কাঁচি বাহির করিতে উদ্যত হইল। বেচারা ভজ দেখিল, সে ভর্জ্জন কটাহ হইতে পরিত্রাণের আশায় জ্বলন্ত বহ্নিমধ্যে ঝাঁপ দিয়াছে ! মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও সে মনে মনে বুঝিল, ব্রাহ্মণের এই কুলাঙ্গার কুমার নিশ্চয়ই কালী সিংহের অবতার ; বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারত প্রচার করার পুণ্যে ব্রাহ্মণকুলে আসিয়া জন্মিয়াছে, কিন্তু টিকি কাটার ঝোঁকটা আজিও ভুলিতে পারে নাই। অনন্যগতি হইয়া তখন

সে সীতানাথের শরণ লইল এবং রামকুমার ও অমর উভয়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠী ও শিখাচ্ছেদোদ্যমের অভিযোগ উপস্থাপিত করিল। তিনি যদিও সে যাত্রা বাঁচাইয়া দিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার ঐ সকল অভক্ষ্য ভোজন করিলেই তদুভয়ের ছেদন-ব্যবস্থাই বাহাল রাখিলেন। তদবধি ভজ'র শিখা আর বাড়িতে পায় না, এবং প্রায়ই তাহাকে নূতন কণ্ঠী ধারণ করিতে হয়। রামকুমার বলিয়া থাকে—"ভজা কাজে কুঁড়ে, ভোজনে ডেড়ে, বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে।" একথা সত্য হইলেও বাজারের পয়সা চুরি করার লোভটা ভজহরির বড় বেশী ছিল না। টিকা-তামাকুর খরচের মত যা হয় দুই চারিটা পয়সা মাত্র—দশ টাকার বাজারেও তাহার অধিক নহে। সীতানাথ তাহা জানেন। এই দৈনিক পাওনাটা মাসে যত হয় হিসাব করিয়া, তাহার মাহিনার সঙ্গে যোগ করিয়া দিতেও তিনি প্রস্তুত; কিন্তু উপরি পাওনা কিছু না থাকিলে চাকরি ভাল লাগে না বলিয়া সে ইহাতে সম্মত হয় নাই।

স্ত্রীলোকের পরিচয়ে রূপের কথা প্রধান হইলেও প্রাচীনা পরিচারিকার পরিচয়েও তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। থাকিলেও, মঙ্গলার চেহারা সম্বন্ধে বলিবার মত বিশেষ কিছুই নাই—সেটা অমনি এক-রকম পাঁচপাঁচী ধরণের। যাহা থাকিলে ঝি-চাকরের কদর হয়, মঙ্গলার তাহাই ছিল না—তাহার গতর নাই; কাজকর্ম্ম সে বেশী কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। বয়স যে তাহার খুব বেশী হইয়াছিল এমন নহে। তেমন বয়সে অনেকের বেশ শক্তিসামর্থ্য থাকে। তাহার সে সব মোটেই ছিল না। রোগ ও শোক তাহাকে বয়সের অধিক বুড়া করিয়া তুলিয়াছিল। আর গেটে বাত তাহার হাঁটু ও কোমরে জাঁকিয়া বসিয়া, ঐ দুইটা সন্ধিস্থলকে জখম করিয়া, তাহাকে একবারে জকসকে ও কাজের বাহির করিয়া দিয়াছে। বিশেষ দরকারেও সে কখন তাড়াতাড়ি চলিতে পারে না, এবং সোজা হইয়া

শুইতে, বসিতে বা দাঁড়াইতেও পারে না। পলিতকুন্তলা এই বৃদ্ধাকে ছোট একগাছি লাঠির উপরে ঝুঁকিয়া, ধীরে ধীরে পথে চলিতে দেখিলে মনে হয়, সে—"অন্বেষয়তি সযত্নং যৌবনরত্নং মহার্ঘমিব"—জীবনের মধ্যাহ্নে, চিন্তাশূন্য চিত্তের উদ্দাম অনবহিত অবস্থায়, অতীতের পথে যে দুর্ল্লভ যৌবনরত্ন হারাইয়া আসিয়াছে, এখন জীবনের এই অপরাহ্নশেষে, আসন্ন শর্ব্বরীর অসিতছায়ামিশ্রিত প্রদোষে, বিবিধ আবর্জ্জনা ও ধূলিপূর্ণ সংসার-পথে সে যেন তাহাই খুঁজিতে খুঁজিতে চলিয়া থাকে।

বাতের অসহনীয় যাতনা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের আশায় মঙ্গলা পাঁচজনের পরামর্শে একটু একটু আফিম ধরিয়াছিল। আফিমের মৌতাতকে অনেকে রঙ্গ করিয়া 'কালাচাঁদের প্রেম' বলিয়া থাকে। মঙ্গলার ধ্রুব-বিশ্বাস, আফিম সত্য সত্যই সেই ব্রজের কালাচাঁদ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। বাতের প্রকোপ বাড়িলেই সে আফিমের নিত্য-সেবনীয় মাত্রা একটু চড়াইয়া দেয়, এবং রাত্রিকালে নিজের নির্জ্জনকক্ষে পড়িয়া এই কাল' দেবতার বিস্তর স্তবস্তুতি করিয়া থাকে। সে দেবতাজ্ঞানে এই জড়বস্তুবিশেষের স্তব করে বলিয়া, রাম কুমার ও ভজহরি তাহাকে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। মঙ্গলা বিদুষী নহে। সে প্রণয়-পত্র লিখিতে বা নভেল পড়িতে জানে না; কিন্তু তাই বলিয়া গণ্ডমূর্খও নহে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কথাগুলি তাহার কণ্ঠস্থ। সে যে সকল যুক্তিপূর্ণ বাক্যে, মূর্খ রামকুমার ও ভজহরিকে পরাস্ত ও নিরস্ত করিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, চেতন নহে বলিয়া কোন বস্তুর দেবত্বে সংশয় করা শুধু নাস্তিকতা নহে—ঘোর মূর্খতা। আস্তিক হিন্দুর মধ্যে এমন কে আছে, যে, জড় বা চেতনের ব্যবহার বর্জ্জিত বলিয়া শালগ্রাম-শিলার দেবত্বে সন্দেহ করে? কাল-ধর্ম্মে শুধু যে মানুষের দেহায়তন একুশ হাত হইতে সাড়েতিন হাতে দাঁড়াইয়াছে,

পক্ষীন্দ্র গরুড়, হাড়গিলা বা ঈগল পাখীতে, আর পারিজাত, তেপালিতায় পরিণত হইয়াছে, তাহা নহে—দেবতাদেরও অনেক দুর্গতি ঘটিয়াছে; জড়-পরিণতিটা তাহার প্রধান। ইহার উদাহরণ স্বরূপ মঙ্গলা বলিত —জহ্নু মুনির কন্যা যে মোহিনীমূর্ত্তিতে শান্তনুকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, ভীষ্ম-জননীর সে মূর্ত্তি এখন আর আছে কি? সেই গঙ্গা এখন শুধু ঘোলা জলের একটা প্রবাহ মাত্র—তাহার উপরে যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে। আস্তীক মুনির মাতা, কশ্যপের কন্যা, ও জরৎ-কারু মুনির পত্নী মনসা দেবীও এখন কণ্টকাকীর্ণ ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বিশেষে পরিণতা! গৌরী-গুরু হিমবানের দুর্গতিও প্রত্যক্ষ—মেনকাপতি এখন তুষারাবৃত শৈল মাত্র! অতএব দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণও যদি এই লৌহযুগের আধি-ব্যাধি-প্রপীড়িত মনুষ্যগণের দুঃখে দ্রবীভূত হইয়া আফি-মের রূপে বিরাজ করেন, তাহাই বা বিচিত্র কিসে?

ভজহরি বা রামকুমার যাহাই বলুক, মঙ্গলা তাহার বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিতে রাজী নহে। সে এই কাল' দেবতার সেবায় যে আনন্দ ও শান্তি লাভ করে—তাঁহার স্তব করিয়া যে তৃপ্তি অনুভব করে, ধরাধিপত্যের সঙ্গেও তাহা বিনিময় করিতে প্রস্তুত নহে। নেশায় বুঁদ বা ভক্তিতে বিভোর হইয়া, সে আফিমের যেরূপ স্তব করিয়া থাকে, নমুনাস্বরূপ তাহার কিয়দংশ যথাসাধ্য কেতাবী ভাষায়—মধ্যে মধ্যে মঙ্গলার ভাষাও কিছু কিছু বজায় রাখিয়া—প্রদত্ত হইল :—

"হে সর্ব্বব্যাধিসূদন! তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া, জগতের অহিত-কারী ও মানবের চিরশত্রু মধু-মুর-নরকাদি কত অসুরের এবং অম্ল, উদরাময়, মেহ ও প্রমেহাদি কত শত রোগের নিপাত সাধন করিয়াছ ও করিতেছ; আর আমার কোমরের এই তুচ্ছ বাতরোগটাকে বিনাশ করিতে পারিতেছ না? দেব! তুমি কুব্জার তেমন কঠিন কুঁজ-বাঁক

ভাঙ্গিয়া, তাহাকে সোজা ও সুন্দরী করিয়া দিতে পারিয়াছিলে, আর আমার কোমরের এই সহজ বাঁকটুকু ভাঙ্গিয়া দিতে পার না ? কুব্জা তোমাকে দিয়াছিল কি তুচ্ছ বনফুলের মালা, আমি সত্য বলিতেছি, আড়াই ভরি পাকা সোণা দিয়া তোমার থাকিবার কোটা গড়াইয়া দিব। তুমি অক্ষয় ও অব্যয় হইয়া, তোমার ঐ ভুবনমোহন-কাল'রূপে সেই সোণার কোটারূপ স্বর্ণমন্দিরে দিবানিশি বিরাজ করিবে! তুমি যমুনার বিষম আবর্ত্তে ঝাঁপ দিয়া অহিতকারী কালীয় নাগের ফণার উপরে যেমন নৃত্য করিয়াছিলে, তেমনি করিয়া একবার তোমার বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তির ভার লইয়া আমার কোমরের উপরে দাঁড়াইয়া নাচ দেখি! হে যশোদা-দুলাল! তুমি চিরদিন ক্ষীর-সর-ননী ভালবাস। আমি আমার মাহিনার সব টাকা দিয়াও রোজ খাঁটী দুধ কিনিব, এবং সেইটুকুকে ক্ষীরের মত করিয়া, তোমার তৃপ্তির জন্য পান করিব। আমার প্রতি প্রসন্ন হও!"—ইত্যাদি।

গৌরী-ঠাকুরাণী পতিপুত্রবিহীনা। সংসারে তাঁহার কেহ আপনার জন ছিল না, ভরণপোষণেরও কোন উপায় ছিল না। সুতরাং সীতানাথের গৃহই তাঁহার আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। বয়সে তিনি সীতানাথের অপেক্ষা অনেক বড়। বহুদিন হইল, তাঁহার কেশ কাশ-কুসুমের শুভ্র শোভা পরিগ্রহ করিয়াছে, দন্তাবলী মুখের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, গাত্রচর্ম্ম কুঞ্চিত ও লোল হইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে জরার আবির্ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার দর্শন ও শ্রবণের দুইটি ইন্দ্রিয়কে এখনও বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা স্পর্শ করিতে পারে নাই। যাহা যাহা দেখিবার ও শুনিবার দরকার, সে সমস্তই তিনি বেশ দেখিতে ও শুনিতে পান। তবে কোনও বিষয়ে তাঁহার কোন দোষ বা ত্রুটি হইলেই তিনি ঐ দুইটা নির-পরাধ ইন্দ্রিয়ের দোহাই দিয়া স্বয়ং রেহাই পাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

যৌবনকালে তিনি নাকি পদ্মিনীর মত সুন্দরী ছিলেন, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী ছিলেন, গঙ্গার মত শীতলা এবং ধরিত্রীর মত সহনশীলাও ছিলেন। এখন কিন্তু আর তাঁহাতে ঐ সকলের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বয়সে রূপই বিকৃত হয়, গুণেরও কি বৈগুণ্য ঘটিয়া থাকে? যাহাই হউক, তিনি শুধু ভাণ্ডারের অধিষ্ঠাত্রী নহেন—সীতানাথের এই প্রবাস-গৃহের কর্ত্রী।

সীতানাথ সংসার-খরচের টাকা মাসে মাসে গৌরীদেবীর হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহার হিসাব দেখিতে চাহেন না। ভজহরি বলে, ঠাকুরাণী সংসার-খরচের টাকা বাঁচাইয়া তীর্থযাত্রার পাথেয় সঞ্চয় করিয়া থাকেন। সীতানাথ সে কথায় কাণ দেন না। অমর যদি বলিত—"দাদামশায়, পয়সা খরচ ক'রে এমন সব লোক রেখেছেন কেন—ভাল লোক কি মেলে না?" তিনি হাসিয়া বলিতেন—"এরা তা হ'লে কোথা যায় ভাই—আর কোথাও কি এদের অন্ন হবে?—তোমার কোনও বিষয়ে অসুবিধা বা কষ্ট হ'লে আমাকে বল্‌বে, আমি যেমন ক'রেই পারি, তা'র ব্যবস্থা কর্‌ব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবীনে প্রবীণে।

ছুটির দিনে ঘরে বসিয়া অমর 'মেরী করেলী'র একখানি উপন্যাস পড়িতেছিল। সীতানাথ আসিয়া বলিলেন—"কলেজের পড়া নেই ব'লে, বাজে বইগুলো প'ড়ে সময় নষ্ট কর্‌ছ?"

রামকৃষ্ণপুর হইতে অমরের চলিয়া আসিবার পর প্রায় ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে। সীতানাথ তাহাকে তাঁহার পল্লীগৃহে লইয়া যান নাই;

কলিকাতায় আনিয়া তাহাকে হিন্দু-স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি সে প্রেসিডেন্সি-কলেজ হইতে আই, এ, পরীক্ষা দিয়াছে। এখন তাহাকে দেখিয়া মনে হয় না যে, রামকৃষ্ণপুরের খোলার ঘরে দেখা, সেই ভয়ে জড়সড়, রোগা ছেলেটিই, এমন সবল, স্বাস্থ্যোৎফুল্ল, প্রিয়দর্শন যুবায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তারাচাঁদ ও রাধা-রাণীর কঠোর শাসন-গণ্ডির মধ্যে নিয়ত ভয়ে ভয়ে থাকায়, তাহার আকারে, আওতার চারা-গাছের শ্রীহীন-নির্জ্জীবতার মত যে একটা ম্রিয়মাণ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার স্বভাবে ও কণ্ঠস্বরে রমণী-সুলভ যে একটা মৃদুতা আসিয়া পড়িয়াছিল, সীতানাথের স্নেহাশ্রয়ে আসিবার পরেই সে সকল অপগত হইয়াছে।

অমর সম্মুখের টেবিলে বইখানি মুড়িয়া রাখিয়া দিল; এবং সীতা-নাথের কথার উত্তরে হাসিতে হাসিতে বলিল—"বইখানা খুব ভাল শুনেছি, তাই একবার প'ড়ে দেখ্‌ছিলাম।"

"পড়ার পিপাসা ভাল; তবে তা'তে একটু সংযমের দরকার। অতি তৃষ্ণায় যা'-তা' জল যথেচ্ছ পান কর্‌লে যেমন দৈহিক অসুস্থতা জন্মে, কৌতূহলের বশে যা'-তা' কতকগুলো বাজে বই পড়্‌লেও তেমনি মানসিক একটা অস্বাস্থ্য এসে পড়ে।"

"এখানা নিতান্ত বাজে বই নয়, দাদামশায়!—একখানা ম্যাগাজিন্‌এ খুব ভাল সমালোচনা দেখেছি।"

"ভাল হ'তে পারে, তবে উপস্থিত এখন যা' পড়্‌বার দরকার নেই, তাই' আমি বাজে বলি। আর, একখানা সাময়িকপত্রে একটা সমা-লোচনা দেখেই কোন বইকে ভাল বা মন্দ স্থির করাও ঠিক নয়। বইখানা প্রকৃতই ভাল কি না—বুঝ্‌তে হ'লে দেখা দরকার, সময় তা'র কিরূপ

সমালোচনা ক'রে আস্‌ছে। দীর্ঘকাল ধ'রে যেসকল বই বহুজনের সমাদর ও প্রশংসা পেয়ে আস্‌ছে তা'ই যথার্থ ভাল।"

"এ সমালোচনার কোন মূল্য নেই বলেন ?"

"মূল্যামূল্যের কথা হচ্ছে না; সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হ'লেও এটা কেবল এক ব্যক্তির অভিমত ত ? সুতরাং এতে ব্যক্তিগত রুচির একটা ছায়া থাকাই কি সম্ভব নয় ? আমি যা বল্‌ছি, সেটা কোন একজনের বা দু'পাঁচজনেরও মতামত নয়—বহুশতজনের দীর্ঘকালব্যাপী সুচিন্তিত সমালোচনার সিদ্ধান্ত।"

"আপনার মতে তা' হ'লে নূতন কিছুই পড়া ভাল নয়। 'নিবে লুঙ্গেন্ লীড্,' 'সীড্,' কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর কাশীদাসের ভারত— আর এই মনসার ভাসান বা শ্রীমন্তের মশান নিয়ে যে দু'পাঁচখানা পুরাণ' বই আছে, শুধু সেইগুলি প'ড়ে রেখে বর্ত্তমান যুগের পেছনে পড়ে থাকাই কি আপনি ভাল বলেন ?"

"পুরাণ' গুলিই আগে পড়া দরকার। শুধু তাই কেন—সেগুলি প'ড়ে সময় থাকে, ত নূতন পড়্‌বার বাধা কি আছে ? 'কিন্তু সীতা রাবণের পিসী কি দুর্য্যোধনের মাসী তা' না জেনে উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত-কথা পড়্‌তে বসা ভাল কি ? উৎপন্ন পুস্তকের সংখ্যায় তোমার বর্ত্তমান যুগ অতীতকে হারিয়ে দিয়েছে—স্বীকার করি, কিন্তু উৎকর্ষে—অতিক্রম করা দূরে থাক, তা'র নিকটেও পৌঁছাতে পারে নি।"

"এখন এই যে এত সব ভাল ভাল বই বেরুচ্ছে, এসব কিছুই নয় বলেন ?"

"সব না হ'লেও তার বেশীর ভাগই চুট্‌কী সাহিত্য—তা'র মধ্যে আবার পনের আনাই সোণার অনুকরণে গিল্‌টি করা জিনিষের মত অসার। নূতন নূতন যে একটু চাক্‌চিক্য দেখ, দশ দিন পরে আর তা'ও থাকে না।"

"কেন, দাদামশায়? তখনকার চেয়ে ত এখন শিক্ষার ও জ্ঞানের বিস্তার ঢের বেড়ে গেছে!"

"বিস্তারে যত বাড়্ছে, গভীরতায় যেন ততই কমে পড়্ছে ব'লে আমার মনে হয়—মানুষ যেন যুগে যগে ছোট হ'য়ে পড়্ছে।"

"আকারে তা'ই হ'চ্ছে বটে—ক্রমে হয় ত 'গলিভার'এর গল্পের সেই 'লিলিপুট'এর মানুষের মত হ'য়ে বেগুণগাছে আঁক্‌ষি দেবে—বিদ্যা-বুদ্ধিতেও কি তা'ই মনে করেন?"

"তা'ই ত মনে হয়, ভাই! তখনকার মানুষের মত মানুষ ত আর জন্মাতে দেখা যায় না;—যেমনটি যাচ্ছে, তেমনটিও ত কৈ আর হচ্ছে না! কণাদ বা গোতম, কপিল বা পতঞ্জলি, জৈমিনি বা বাদরায়ণ, বাল্মীকি বা কালিদাস, কাত্যায়ন বা রঘুনন্দন প্রভৃতির মত তাঁদের পরে আর কেউ জন্মেছেন কি? শুধু এদেশে নয়—পৃথিবীর সব দেশেই প্রায় তা'ই। সক্রেটিস্ বা প্লেটো, ডাণ্টে বা হোমর্, কর্ণেলি বা রেসাইন্, রুসো বা ভল্‌টেয়র্, কাণ্ট্ বা হেগেল্, গেটে বা শীলার্, নিউটন্ বা বেকন্, শেকস্‌পিয়র্ বা মিল্‌টন্ প্রভৃতির পরেই বা তাঁ'দের দেশে তাঁ'দের সমান কে জন্মেছে? বেশী দিনের বা বেশী দূরের কথা ছেড়ে দিয়ে বল দেখি, আমাদের রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ বা বঙ্কিমের শূন্য স্থান পূর্ণ হ'য়েছে কি—না কখন হ'বার আশা আছে?"

"আমার মনে হয়, দাদামশায়—আমরা অতীতের মানুষকে একটু বড় দেখি। আপনি যাঁ'দের নাম কর্‌লেন তাঁ'দিগে আমরা যতটা বড় দেখ্‌ছি, তাঁ'দের সমসাময়িক লোক বোধ হয় তা' দেখ্‌তেন না। তেমনি, অতীতের তুলনায় যাঁ'দিগে এখন আমরা ততটা বড় মনে কর্‌ছি না, পরবর্ত্তী যুগের লোক হয় ত আবার তাঁ'দিগেই খুব বড় দেখ্‌বে।"

"তা'র মানে,হয় ত তা'রা আবার আমাদের চেয়েও ছোট হ'য়ে আস্‌বে। যাক্, সে বিচার এখন নিষ্প্রয়োজন। আমার কথা হচ্ছে এই—কলেজের পড়া যখন থাক্‌বে না, তখন যদি কিছু পড়্‌তে হয়, ত এমন বই পড়, যা'তে শেখ্‌বার উপযুক্ত কিছু শিখ্‌তে পার্‌বে। বেশী পড়া ভাল, কিন্তু খুব বেশী কতকগুলো বই পড়া আমি ভাল বলি না। দশখানা বই একবার ক'রে পড়্‌লে যা' না হয়, ভাল একখানা বই দশবার পড়্‌লে তা'র চেয়ে ঢের বেশী কাজ হয়।"

"পরীক্ষার জন্যে হয় ত হয়, তা' না হ'লে একখানা বই দশবার ধ'রে পড়্‌তে ভাল লাগ্‌বে কেন, দাদামশায় ?"

"বইএর বিশেষত্ব আছে, অমর! এমন বই আছে, যা'র খানিকটা প'ড়ে বাকীটা পড়্‌তে ইচ্ছে হয় না—একবার পড়্‌লেই পড়ার দরকার শেষ হ'য়ে যায়। আবার এমনও অনেক বই আছে, যা' দশবার পড়েও আবার দশবার পড়্‌তে ইচ্ছে হয়—শতবার পড়্‌লেও পড়ার প্রয়োজন শেষ হয় না। গ্রন্থের উৎকৃষ্টতার পরীক্ষা বা প্রমাণই হচ্ছে তা'ই—যতবার পড়, ততবারই যেন নূতন— কখন পুরাণ' হ'তে চায় না।"

"দশবার পড়্‌লেও পুরাণ' হয় না এমন বই কি আছে, দাদামশায় ?"

"অনেক,—উপনিষদ্‌গুলি সেই রকমের, গীতা সেই রকমের, মহাভারত সেই রকমের। মহাভারতের মত বোধ হয় আর কিছুই নয়। একাধারে এমন উৎকৃষ্ট কাব্য, ঘটনা-বৈচিত্র্যপূর্ণ এমন মনোহর গল্প, দর্শনাংশে এমন গভীর জ্ঞান ও তত্ত্বোপদেশপূর্ণ সার গ্রন্থ জগতের আর কোনও দেশে—আর কোনও ভাষায় আছে কি না জানি না। ইংরাজেরা গর্ব্ব করে যে, তা'দের কেবল 'শেক্‌স্‌পিয়র্' আর 'বেকন্'এর গ্রন্থগুলি যদি থাকে, আর বাকী সব যদি নষ্ট হ'য়ে যায়, তা'তে তা'রা ক্ষতি বিবেচনা করে না। মহাভারত সম্বন্ধে এইরূপ গর্ব্ব করা যায়। যদি কেউ বলে—একখানিমাত্র

বই রেখে তোমাদের দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি যা' কিছু আছে সব পুড়িয়ে দেব ;---কি রাখ্‌তে চাও? আমি অসঙ্কোচে বলি—'মহাভারত' !---এক মহাভারতেই সব আছে।"

শুধু ভাল কলেজে পড়াইয়া বা বিচক্ষণ গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত রাখিয়াই যে সীতানাথ অমরের শিক্ষাসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকেন না—নিজেও যে সে বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিয়া থাকেন, উল্লিখিত কথোপকথন হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। পরীক্ষার জন্য যাহা পাঠ্য, তাহার অতিরিক্ত অনেক পুস্তক তিনি তাহাকে কিনিয়া দিয়া পড়িতে বলেন। সেই প্রকারে ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অমরের অধীত পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। কেবল অধ্যয়নমাত্রেই তিনি তাহার শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন না—বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশে, তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া, বিভিন্ন দেশের দ্রষ্টব্য দর্শনে বাহির হইয়া থাকেন। সেইরূপে ভারতবর্ষের পুরাণবর্ণিত ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যত স্থান---মহর্ষি, মহাজন ও মহাকবিগণের জন্মস্থান বলিয়া খ্যাত যত পুণ্য বন, পূত গিরি, পবিত্র নদী-তীর ও প্রসিদ্ধ জনপদ---রাজা বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ন'স্মৃতি-সমুজ্জ্বলা উজ্জয়িনী—বঙ্গের উজ্জয়িনী নবদ্বীপ— হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বসময়ের বহু কীর্ত্তি ও বহুতর স্মৃতিসমন্বিত ইন্দ্রপ্রস্থ ও আগ্রা প্রভৃতি জনপদ—প্রাচীন ভারতের সমরদুর্ম্মদ রাজন্যবৃন্দের উৎকট রণ কণ্ডূতির অবসান-ক্ষেত্র—যবনাধিপত্যের অস্ত-প্রাঙ্গণ—বীরেন্দ্রভূমি রাজপুতানার প্রসিদ্ধ শৈল-দুর্গ ও গিরি-শঙ্কট—যবন-ভীতা রাজপুত-বীরাঙ্গনাগণের চিতা-ধূমে মলিন চিতোর—যুগ-যুগান্তরের বিষাদ স্মৃতিবিজড়িত জনস্থান—বেদ-পুরাণ-সংহিতাদির সূতিকারণ্য নৈমিষ—প্রাচীন কাহিনীর স্মৃতি-সংবাহিকা শিপ্রা, সরযূ, সরস্বতী, গোমতী, গোদাবরী, গঙ্গা ও যমুনাদি নদী—দ্বৈপায়ন, চিল্‌কা ও রেণুকাদি হ্রদ—আর্য্য ঋষিগণের তপোমহিমামণ্ডিত হিমাচল—রাজপুত-

বীরত্ব-কথা-বিজড়িত বিন্ধ্য ও আরাবলী—ভারতের প্রান্তশায়ী সাগর, উপসাগর ও উপকূলস্থিত যত শৈল-মন্দির—যে যে স্থানে হিন্দু, বৌদ্ধ বা মুসলমান নৃপতিগণের প্রতিষ্ঠিত, দর্শনযোগ্য যত মন্দির, মঠ ও মসজিদ্ আছে, যত কীর্ত্তি ও কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহার অনেক তিনি অমরকে দেখাইয়া আনিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রূপের আলো।

কাশীশ্বর বাবু হাইকোর্টের একজন ভাল উকীল। সার্কুলার রোডের ধারে তাঁহার মস্ত বাড়ী, পয়সাকড়িও যথেষ্ট। তাঁহার পুত্র শৈলেন্দ্র-কুমার, অমরের সহপাঠী। প্রথম যে দিন অমর হিন্দু-স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়, সেই দিন হইতেই উভয়ের বন্ধুত্ব হইয়াছে। দুইজনেই এক স্কুল হইতে, একই বিভাগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, এক কলেজের এক শ্রেণীতে একরকমের পাঠ্য লইয়া পড়িয়া আসিতেছে। উভয়েই উভয়ের অ-ত্যাগ-সহনশীল।

অমরদের বাসাবাড়ী হইতে, দুই তিনটা পথ বাহিয়া শৈলেনদের বাড়ীতে যাওয়া যায়। অমর যে পথে প্রায়ই যাওয়া-আসা করিত, সেই পথের ধারের একটা বাড়ীর সম্মুখে বেশ একটি ফুলের বাগান। বাগানটি ছোট হইলেও তাহাতে অনেকগুলি ভাল ভাল ফুলের গাছ আছে। তাহার পাশ দিয়া যাইবার ও আসিবার সময়ে অমর অন্ততঃ দুই মিনিটও দাঁড়াইয়া ফুলের শোভা দেখিয়া থাকে।

একদিন অপরাহ্ণকালে, অমর সেই বাগানের ধারে দাঁড়াইয়া ফুলের বাহার দেখিতেছিল। সহসা উদ্যানসংলগ্ন গৃহের পথ-পার্শ্বস্থিত উপরকক্ষের

একটা বাতায়ন সশব্দে ঈষৎ উন্মুক্ত হইল, এবং সেই অর্দ্ধমুক্ত বাতায়নের অবকাশে অকস্মাৎ যেন একটি আলোর পদ্ম ফুটিয়া উঠিল!

খড়্‌খড়ি খোলার এই শব্দটা শুধু আকস্মিক নহে—একটু অস্বাভাবিকও বটে। অমর এতদিন এই পথে আসা-যাওয়া করিতেছে, একদিনের জন্যও কখন সে এই দিকের জানালা খোলা দেখে নাই। সে বাড়ীতে কাহারা থাকে এবং কেহ থাকে কি না, অনুমান ব্যতীত তাহার আর কোন প্রমাণও পায় নাই। সুতরাং সে বিস্মিত হইয়া, কৌতূহলাবিষ্ট-দৃষ্টিতে উপরে চাহিয়া দেখিল। যেমন সে চাহিল, অমনি সেই বাতায়ন সশব্দে রুদ্ধ হইয়া গেল। ত্রয়োদশানুমিতবর্ষ-বয়স্কা একটি বালিকা, বোধ হয় কিছু দেখিবার অভিপ্রায়ে খড়্‌খড়িটা একটু খুলিয়া পথের উপরে চাহিয়াছিল। অপরিচিত এক যুবা ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছে দেখিতে পাইয়াই, বালিকা তাড়াতাড়ি খড়্‌খড়িটা টানিয়া দিল। যেন কোন দেব-বালা স্বর্গের দ্বার খুলিয়া পৃথিবীর কিছু দেখিতেছিল, মর্ত্যবাসীর দৃষ্টিতে পড়িয়াই ঘন মেঘের আড়ালে লুকাইয়া পড়িল।

বিস্মিত অমর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া, বাগানের দিকে চাহিল। উদ্যানের সে শোভা নাই। সদ্যোবিকসিত ফুলগুলি যেন এই নিমেষের মধ্যেই পর্য্যুষিত হইয়া গিয়াছে! বিকাশোন্মুখ মুকুলগুলি পর্য্যন্ত যেন বাসি-ফুলের মত ম্লান, বিবর্ণ ও শ্রীহীন! প্রবল একটা আকর্ষণী শক্তি তাহার দৃষ্টিকে তখনই আবার ঊর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট করিল। সেখানেরও আর সে শোভা নাই—সে আলোর ফুল মিলাইয়া গিয়াছে! আতপ ও বৃষ্টি-বারি-বিবর্ণ বাতায়নের কর্কশ দৃশ্য তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। খড়্‌খড়িটা যেন যুবার লোলুপ দৃষ্টির ভয়েই চোখ বুজিয়া ফেলিয়াছে। শুষ্ক কাষ্ঠের সেই কঠোর খড়্‌খড়িতে এমন একটু সহৃদয়তা ছিল না, যে একটা 'পাখি'ও একটু ফাঁক রাখিয়া দেয়।

বাতায়নের সেই উদ্‌ঘাটন ও নিরোধ এবং তদবকাশে জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকার অচিরাংশুবিকাশবৎ সেই অতর্কিত আবির্ভাব ও তিরোভাব, এতই অব্যবহিত ও আকস্মিক যে, অমর ভাল করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না—বোধ হয়, বুঝিতেই পারিল না, সে প্রভাটা কিসের বা সে আলোটা কি—"তড়িদ্ বা তারা বা কনকলতিকা বা কিমবলা!"

অদৃষ্টপূর্ব্ব সেই রূপ-প্রভা দর্শন করিয়া, ভাল করিয়া আর একবার তাহাই দেখিবার ইচ্ছায়, অমর অন্যপথ ছাড়িয়া প্রত্যহ দুই বেলা সেই পথেই শৈলেন্‌দের বাড়ী যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। যতবার যায়, ততবারই সে সেই বাতায়নের পানে চাহিয়া চাহিয়া যায়। কিন্তু একদিনও আর তেমন করিয়া, সেই সবুজবর্ণ খড়্‌খড়ির পাশে, ঘন-পল্লবের কোলে গোলাপ-গুচ্ছের মত—অথবা নীল আকাশে শুক্রতারকার মত, সেই দপ্‌দপে মুখখানি ফুটিয়া উঠে না। সে খড়্‌খড়িটা পর্য্যন্ত যেন জন্মান্ধের চক্ষুর মত একবারে বুজিয়া গিয়াছিল। অনেক দিন যখন আর তেমন কিছুই দেখিতে পাইল না, তখন সে আবার পূর্ব্বের মত সেই উদ্যানের শোভা-দর্শনেই মনোনিবেশ করিল, এবং সে দিনের সে ব্যাপারটাকে অতীতের অনালোচ্য ঘটনার তালিকায় তুলিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই কি সেই ?

বসন্তের অপরাহ্ণ। ঋতুরাজের এখন আর সেদিন নাই। কাল-বিভাগের দলিলে তাহার স্বত্বের যথাযথ উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু শীত ও গ্রীষ্ম এই দুই প্রবল ঋতুর মধ্যে পড়িয়া, দুইজন পরাক্রান্ত জমীদারের মধ্যস্থিত

হীনবল ভূস্বামীর আধিপত্যের মত, তাহার দখলটা বড় কম-জোর হইয়া পড়িয়াছে। পল্লীগ্রামে তবু দুই চারি দিনের জন্য হইলেও নেবুফুল ফুটিয়া, আম্র-মুকুলের গন্ধে আকুল দক্ষিণানিল বহিয়া, বনফুলের সৌরভে দিশা-হারা কোকিল ডাকিয়া, এবং মধুপানে মত্ত ভ্রমর ঝঙ্কার করিয়া, ঋতুপতির উপযান জানাইয়া দেয়। সহরে সে সব নাই। এখানে রোগের প্রাদু-র্ভাবেই কেবল বসন্তের আবির্ভাব বুঝিতে পারা যায়—স্বভাবে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা সব ঋতুতেই সহরের সেই সমান একঘেয়ে ভাব। সেই অশ্রান্ত-কর্ম্ম-কোলাহল। পথে জনতার সেই অবিরাম স্রোত। পণ্যভারাবনত সেই শকট-শ্রেণী। ঘোড়াগাড়ীর সেই ঘড়্ঘড়ানি। ট্রাম-গাড়ীর সেই শ্রুতি-দ্রোহকর ঘণ্টা-স্বর। আর মাঝে মাঝে হাওয়া-গাড়ীর সেই ভয়-দেখান ভেঁপুর উৎকট শব্দ। কচিৎ কখন কোনও গলি-পথে চলিতে চলিতে দুই একটা পোষা কোকিলের সাড়া পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে পিঞ্জরাবদ্ধ ম্রিয়মাণ বিহঙ্গের কাতর কাকলি, স্বচ্ছন্দ-বনবিহারী মুক্ত কোকিলের মধুর কুহুস্বরের ন্যায় কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া প্রাণকে মুগ্ধ, মত্ত ও আকুল করিবার মত নহে। তবে খুব কন্কনে শীতের পরে, দগ্ধান গরম পড়িবার পূর্ব্বে, দুই এক দিন দক্ষিণা বাতাসের যে দুই একটা নিঃশ্বাস গায়ে লাগে, তাহাতেই শুধু বুঝা যায় যে, ষড়্ঋতুর রাজা এখনও পঞ্চত্ব পান নাই। যে দিনের কথা হইতেছে, সে দিন সেই রকমের বাতাস বহিতেছিল। অমর সেই ফুল-বাগানের ধার দিয়া শৈলেন্দের বাড়ী যাইতেছিল।

বাগানের মাঝখানে, একটা মাচানের চারিদিক হইতে কতকগুলি "মার্শেল নীল্" উঠিয়া, শাখা-প্রশাখা-পল্লবে বেশ একটি কুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের লতানে ডালগুলি, মুকুল ও ফুলের ভারে অবনত

হইয়া বায়ুর হিল্লোলে মন্দ মন্দ দুলিতেছিল। অমর দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছিল। সহসা সেই কুঞ্জের অন্তরাল হইতে একটি বালিকা বাহির হইল, এবং একটি আধফোটা গোলাপ তুলিয়া তাহার বিপুল কৃষ্ণ-কবরীর উপরে সযত্নে রক্ষা করিল। বালিকার পরণে একখানি জরির পাড়-বসান নীল শাড়ী, গায়ে আশ্‌মানী রং-এর একটি সেমিজ, হাতে শুধু দুই-গাছি বালা, নাকে একটি চল্‌চলে মুক্তার নোলক, আর দুই কাণে দুইটি হীরার দুল। অন্য কোন অঙ্গে আর কোন অলঙ্কার নাই। নীল রং-এর কাপড়ে তাহার উজ্জ্বল-গৌরাঙ্গের ভারি একটা খোল্‌তাই হইয়াছিল। অমর বিস্ময়-বিমুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল—"এই কি সেদিনের সেই?" অভিজ্ঞানের পূর্ব্বেই তাহার উপরে বালিকার দৃষ্টি পড়িল। বালিকা তৎক্ষণাৎ জানুদ্বয়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া, ঝোপের আড়ালে বসিয়া পড়িল। সুতরাং এ দিনের এ দেখাটাও সেদিনের মত সেই—'তড়িদিব তরল বলাকে'-গোছের না হইলেও, ভাল করিয়া দেখা হইল না। তাহা না হইলেও অমর আর সে স্থলে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। শুধু বুক নহে, তাহার পাদুইটাও বড় কাঁপিতেছিল। সে যে বালিকার পানে চাহিয়া ছিল, তাহা আর কেহ দেখিতে পাইল কি না, চারিদিকে চাহিয়া তাহাই দেখিতে দেখিতে সরিয়া পড়িল।

কিছুদূরে আসিয়াই, কৌতূহলবশতঃ অথবা অজ্ঞাত অন্য কোন কারণে অমর পশ্চাতে ফিরিয়া, বালিকা যে স্থানে লুকাইয়া বসিয়াছিল, সেই স্থানটার দিকে লক্ষ্য করিল। বালিকাও ঠিক সেই সময়ে, যে অপরিচিত যুবা তাহার পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া ছিল, সে চলিয়া গিয়াছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য ঘাড় তুলিয়া চাহিতেছিল। চোখে চোখ পড়িতেই সে একটু হাসিয়া, সেই গুপ্ত স্থান হইতে উঠিয়া ছুটিয়া পলাইল। অমর বুকভরা কম্পন লইয়া একবারে বাসায় চলিয়া আসিল। আসিবার

সময়ে তাঁহার অসংস্থিত চিত্ত, বায়ুপ্রবাহের বিপরীতে নীয়মান কেতুর চীনাংশুকের মত পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিল কি ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ।

অধ্যয়নকে তপস্যার মত করিয়া, অমর এতাবৎ যে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছিল, তাহাতে অভিনব একটা চাঞ্চল্য আসিয়া পড়িয়াছে। সে চঞ্চলতাটা তাহাকে মন দিয়া পড়িতে দেয় না, ভাল করিয়া খাইতে বা ঘুমাইতেও দেয় না। পূর্ব্বে শৈলেনের সঙ্গে দেখা হইলে, অমরের কথা ফুরাইতে চাহিত না। এখন দুই চারিটা কথা কহিলেই তাহার কথার ভাণ্ডার যেন খালি হইয়া যায়। শৈলেন্ একদিন জিজ্ঞাসা করিল—"তোর হ'য়েছে কি রে, অমর ? আজকাল তোকে এমন আন্‌মনা দেখি কেন বল্ দেখি ?" কলেজের একজন অধ্যাপকও একদিন বলিলেন, "যুবা ! তোমাকে এখন পাঠে বড় অমনোযোগী দেখ্‌তে পাই—কেন ?" অমর দেখিল, তাহার অন্তরের ভাবটা ক্রমেই মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। শৈলেন্ তাহা দেখিয়াছে, অধ্যাপক তাহা দেখিয়াছেন। সীতানাথও হয় ত তাহা দেখিয়া থাকিবেন। তাহার বড়ই লজ্জা হইল, আপনার মনের উপরে ভারি রাগও হইল। সঙ্কল্প করিল, অতঃপর সে নিজের মনকে আবার পূর্ব্বের মত অহোরাত্র অধ্যয়নের দুর্ভেদ্য অয়োবর্ম্মে আবৃত রাখিবে, মুহূর্ত্তের জন্যও আর তাহাতে ছাত্র-জীবনের বিরোধী কোন চিন্তাকে প্রবেশ করিতে দিবে না। তখন সে অন্য একটা পথ দিয়া শৈলেন্‌দের বাড়ী যাওয়া-আসা আরম্ভ করিল। যে পথ-পার্শ্বস্থ গৃহের বাতায়নে আলোর পদ্ম ফুটিয়া উঠে, যে পথের ধারে ফুলবাগানের ঝোপের আড়ে বিদ্যুতের লতা লুকোচুরি

খেলিয়া নিরীহ পথিক-যুবাকে আহার-নিদ্রা ও পড়াশুনা ভুলাইয়া দেয়, সে পথে পদার্পণ করিল না।

অনুদ্ভিন্নযৌবনা বালিকার সে সরল দৃষ্টি বা হাসিতে এমন কি ছিল---এমন কি থাকিতে পারে, যাহা অমরের মনে এরূপ একটা ভাবান্তর উপস্থাপিত করিল? বল ত, কিছুই নহে। সে দৃষ্টি অর্থশূন্য। সে হাসি সাগর-তরঙ্গের মত স্বাভাবিক—সমীর-হিল্লোলের মত অনিমিত্ত। আর বল ত, তাহা গভীর অর্থে পূর্ণ। সে অর্থ কি, তাহা কেহ বলিতে বা বুঝিতে পারে না—তাহা সৃষ্টিরহস্যের মত অজ্ঞেয়; অথবা তাহা বুঝিতে পারিলেও প্রকাশ করিতে পারা যায় না—তাহা ব্রহ্মজ্যোতির ন্যায় অনির্ব্বচনীয়। সে হাসি যে দেখিয়াছে, সে অর্থ সেই বুঝিয়াছে। যে বুঝিয়াছে, সেই মজিয়াছে। কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। বালিকার সে দৃষ্টিতে বিলাস, বিভ্রম বা হাব ভাব ছিল না; ছিল শুধু একটা চঞ্চলতা। সে চাঞ্চল্যও বর্ষীয়সীর চাতুর্য্যপূর্ণ, বিলোল ও কুটিল কটাক্ষ-বিক্ষেপ নহে, তাহা ত্রস্তা হরিণীর চকিত দৃষ্টির চাঞ্চল্যের মত সরল। তবে আর কিছু না থাকিলেও তাহাতে ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ড-স্পর্শের ন্যায় এমন একটা মোহিনী শক্তি ছিল, যাহা অমরের হৃদয়-কক্ষের এতাবৎ-রুদ্ধ একটা দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল। ভূমিকম্প সময়ে সময়ে নদীর প্রবাহকে বিপরীত পথে ফিরাইয়া দেয়। বালিকার দৃষ্টি-স্পর্শে অমরের সর্ব্বাঙ্গে যে একটা শিহরণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহারও চিন্তার প্রবাহ একটা নূতন পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। অমর ভাবিত, তাহাকে দেখিয়া বালিকার এত লজ্জা কেন? সে অপরিচিত পথিকমাত্র। পথে কত লোক সর্ব্বদাই যায় আসে। তাহাকে দেখিয়াই বালিকা লুকায় কেন? লুকাইয়াও আবার চুরি করিয়া চাহে কেন? তাহাকে চাহিতে দেখিয়াই বা সে হাসিয়া পলায় কেন?

এক রবিবার অপরাহ্ণে শৈলেন্দের চাকর আসিয়া অমরকে ডাকিয়া গেল। বিশেষ দরকারে শৈলেনের মা—উমাসুন্দরী, তাহাকে ডাকিয়াছেন; দরকারটা কি, তাহা বলিয়া দেন নাই। অমর একটু চিন্তিত হইল। সেইমাত্র সে তাঁহাদের বাড়ী হইতে আসিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে তাহার দেখাও হইয়াছিল। তখন কিছু না বলিয়া, এখনই আবার ডাকিবার কারণ কি?

অমর ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইল। মনে কোন রকমের একটা ভাবনা থাকিলে, পথের প্রতি মানুষের লক্ষ্য থাকে না। কিছু দূর আসিয়া অমর দেখিল, যে পথে সে চলিবে না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে, চিত্তের একটু অনবধানতার সুযোগ পাইয়া, তাহার চরণদ্বয় তাহাকে সেই চিরাভ্যস্ত পথেই আনিয়া ফেলিয়াছে। নিজ পদদ্বয়ের এবম্প্রকার বিশ্বাসঘাতকতায় যার পর নাই বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া, অমর ফিরিতে উদ্যত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, চাকরটা শীঘ্র যাইবার কথা বলিয়া গিয়াছে। এমন কি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্যই সে দাঁড়াইয়া ছিল। এ পথে এতটা দূর আসিয়া এখন যদি ফিরিয়া অন্য পথে যাইতে হয়, তবে অনেক বিলম্ব হইবে। অগত্যা সে সেই পথেই চলিল; কিন্তু সঙ্কল্প করিল যে, সেই বাগান বা বাড়ীটার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিবে না। সেইস্থান হইতেই সে সেই বাগানের বিপরীত দিকের ফুটপাথ ধরিয়া, অন্যদিকে চাহিয়া চলিতে লাগিল। যতই অমর সেই উদ্যানের সন্নিহিত হইতে লাগিল, তাহার সঙ্কল্পের বাঁধন যেন ততই শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। নিকটে আসিতেই সে বাঁধন একবারে এলাইয়া গেল। তখন ভাবিল, বাগানের দিকে চাহিতে দোষ কি? বাগান দেখিয়া ভাবিল, বাড়ীটাই বা কি দোষ করিয়াছে? বাগান বা বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া কিন্তু তাহার মনটা বেশ প্রসন্ন হইল না। বাগানখানি

একবারে জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। বড় বড় ঘাস মাথা তুলিয়া, ছোট ছোট গাছগুলিকে গ্রাস করিয়াছে। বাড়ীটাও যেন পরিত্যক্ত—অধিবাসিশূন্য!

শৈলেন্ বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। দূর হইতে অমরকে দেখিতে পাইয়াই সে বলিল, "বেশ! এই এত দেরী?"—"ব্যাপার কি বল্‌দেখি? এই ত গেছি, এখনই আবার ডাকাডাকি কি জন্যে?"—"তেমন কিছু নয়, হটাৎ বাবার পাঁপর-ভাজা খেতে ইচ্ছে গেল, তা'র সঙ্গে দুচারখানা কচুরীও হ'ল। পাঠাতে গেলে জুড়িয়ে যায়, তাই মা খোলা নাবিয়ে ব'সে আছেন, তুই এলে গরম গরম ভেজে দেবেন।" এই বলিয়া শৈলেন্ অমরের হাত ধরিয়া, তাহাকে লইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

ফিরিবার সময়েও অমর শৈলেনের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে সেই পথেই আসিয়া পড়িল। সেই বাড়ীটার নিকটে আসিয়া শৈলেন্ বলিল—"এঃ, বাগানটা একবারে মাটি হ'য়ে গেছে!"

অমর অন্যমনে বলিল—"হঁ্যা, বাগানটায় অনেকগুলি ভাল ভাল ফুলের গাছ ছিল—বেশ বড় বড় গোলাপ ফুট্‌ত।"—"শুধু গোলাপ কেন, আরও কত কি"—বলিয়া, শৈলেন্ অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে অমরের মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল।

"হাস্‌লি যে বড়?"—বলিয়া, অমর শৈলেনের হাত চাপিয়া ধরিল। শৈলেন্ আরও একটু বেশী হাসিয়া বলিল—"একটা কথা মনে প'ড়ে গেল।" "কি কথা, বল্‌তে হবে"—বলিয়া অমর পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে, শৈলেন্ হাসিতে হাসিতে বলিল—"কেন বল্‌ব—সবাই কি সব কথা সকলকে বলে?"

অমর বুঝিল, আজ বলি—কাল বলি করিয়া, সে যে কথা শৈলেন্‌কে বলিতে পারে নাই, শৈলেন্ কোনও প্রকারে সেই কথা শুনিয়াছে। একটু অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

অমর যে দিন সেই উদ্যানবিহারিণী নীলবসনা বালিকার পানে বিস্ময়-বিহ্বলদৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে দেখিতে পায় নাই, ঠিক সেই সময়ে, পথের অন্যদিকের ফুটপাথ দিয়া, শৈলেন্‌দের এক বুড়া চাকর কোথাও যাইতেছিল। বুড়া কিছু রসিক। সে বাড়ীতে গিয়াই শৈলেন্‌কে বলিয়া দিল, "দাদাবাবু! আর কেন, এই বেলা মনোরঞ্জনবাবুকে ব'লে তাঁর মেয়ের সঙ্গে আপনার বন্ধুটির বে'র ঠিক ক'রে ফেলুন্। ও দিকে যে শুভ-দৃষ্টি আরম্ভ হ'য়ে গেছে!" অমর কোন কথা বলে নাই বলিয়া, শৈলেন্‌ও এতদিন সে কথা প্রকাশ করে নাই! আজ সব কথা প্রকাশ করিয়া, বলিল—"তুই মনে করিস্ বোধ হয় যে, ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পায় না—তা' কি হয়? গভীর রাতে ঘরে ব'সে চুপে চুপে কে কি বল্‌ছে না বল্‌ছে, তা শোন্‌বার জন্যে দেয়ালের কাণ বেরোয়, আর দিনের বেলা সহর-পথে কে কি কর্‌ছে না কর্‌ছে, তা' দেখ্‌বার জন্যে ফুটপাথের চোক ফুট্‌তে পারে না?—সে যা হ'ক, এখন ত জানাজানি হ'য়ে গেল, আর লুকোছাপা কেন—বে'র কথাটা তা' হ'লে তুল্‌ব?—দ্যাখ্! মনো-রঞ্জনবাবু বাবার মক্কেল; প্রভাকেও আমরা দেখেছি—বেশ মেয়ে—"

অমর শৈলেনের কথায় বাধা দিয়া বলিল—"আচ্ছা, সন্ধ্যে হ'য়েছে এখন বাড়ী যা! দরকার হ'লে ঘটকালি কর্‌বার জন্যে তোকে ডেকে পাঠাব তখন!—আমি চল্লুম।"

শৈলেন্ অমরকে ধরিয়া রাখিয়া বলিল—"আমি তামাসা কর্‌ছি না, অমর! বে' ত সেই তোকে একদিন কর্‌তেই হবে; প্রভাকে মনে ধ'রে থাকে ত বল্! মনোরঞ্জনবাবু হাওয়া বদলাতে গেছেন, ভাল পাত্রের সন্ধান পেলে খবর দিতে ব'লে গেছেন। পেটে ক্ষিধে মুখে লাজে কোন লাভ নেই, নিজেকেই ঠক্‌তে হয়, পরে পস্তাতেও হয়।—আমি বাবাকে বলি, তিনিই দাদামশায়ের মত নিয়ে তাঁকে খবর দেবেন এখন।"

অমর গম্ভীরভাবে একটু হাসিয়া বলিল—"তুই কি আমাকে এতই পাগল মনে করিস্, শৈলেন্?—বিদ্যুতের আলো দেখে যারা তা'র রূপে মুগ্ধ হয়, তা'রাও পাগল বটে, কিন্তু তা'রা সাধারণ পাগল। অস্থির ও ক্ষণস্থায়ী হ'লেও বিদ্যুতেরও একটা স্থিরতা আছে—মেঘের কোলে বার বার লুকিয়ে পড়্‌লেও তখনই আবার প্রকাশ পায়। কিন্তু কোথায় কবে কোন্ প্রান্তর-পথে চল্‌তে চল্‌তে একবার বা দু'বারমাত্র একটা আলেয়ার আলো জ্ব'লে উঠে নিবে যেতে দেখে, যে তা'র প্রতি প্রণয়বান্ হ'তে পারে, সে সাধারণ পাগল নয়। বে' যদি কর্‌তেই হয়, ত এখন দু'পাঁচ বছর নয়—অন্ততঃ লেখাপড়ার শেষ না ক'রে ত নয়ই।"

শৈলেন্ একটু হাসিয়া বলিল—"আমারও এই রকম ইচ্ছে ছিল। সে কথা যাক্,—আমার বেশ বোধ হচ্ছে—তুই হয় আমার কাছে মনের কথা খুলে বল্‌ছিস্ না, নয় ত নিজের মনের সঙ্গেই লুকোচুরি খেলাচ্ছিস্। মানুষ, জেগে আছি—মনে ক'রেই অনেক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে—জানিস্ ত? জেগে থাক্‌বার দরকার থাক্‌লে ঘুমবার সময়েও তার মনে হচ্ছে, বেশ জেগে রয়েছি; ঘুমে চোক বুজে আস্‌ছে, তখনও মনে হচ্ছে, ঘুমুই নি ত, সবার কথা শুন্‌তে পাচ্ছি, কত কি ভাব্‌ছি,—পরক্ষণেই বস্, একবারে গভীর নিদ্রা! তোরও ঠিক তাই হয়েছে কি না বুঝে দ্যাখ্!"

অমর বুঝিয়াও বুঝিল না; শৈলেন্‌কে এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিতে নিষেধ করিয়া দিল। দুই পাঁচদিন পরেই কিন্তু সে বুঝিতে পারিল যে, শৈলেনের কথাই ঠিক; সত্যই সে, জাগিয়া আছি—মনে করিয়া, ঘুমাইয়া পড়ার মত করিয়া—'ভালবাসি নাই,বাসিব না' করিতে করিতে দিনে দিনে ভালবাসার পথেই আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা না হইলে, পথের ধারের সেই বাড়ীটায় কেহ ফিরিয়া আসে নাই দেখিলেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যায় কেন? আলোকময়ী সেই বালিকাকে পুনর্ব্বার

দেখিবার জন্য তাহার মনে যে একটা আগ্রহাতিশয় জন্মিয়াছে, এই অনস্বীকার্য্য সত্যটাকে সে আর ঠেলিয়া রাখিতে পারিল না ; বিস্মিত হইয়া ভাবিল, আমি যে প্রণয়-চিন্তাকে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিব না বলিয়া মনকে অধ্যয়নের অভেদ্য লৌহ-কবচে আবৃত রাখিয়াছিলাম, সে চিন্তা তাহাতে কি করিয়া প্রবেশ করিল ? প্রেমবৈচিত্র্য-অনভিজ্ঞ যুবা জানিত না যে, হৃদয়ে প্রণয়ের প্রবেশ-পথ কেহ কখন একেবারে রুদ্ধ করিতে পারে নাই। মনকে তপস্যার তুঙ্গ শিখরে তুলিয়া, কঠোর বৈরাগ্যের পাষাণ-প্রাকার ও শাস্ত্রচিন্তার সুগভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত রাখিলেও, তাহাতে সাঁতালী পর্ব্বতের উপরে বেহুলার লোহার বাসরে কালনাগিনী-প্রবেশের মত, প্রণয়-প্রবেশের একটু পথ থাকেই থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দায়গ্রস্ত অতিথি।

সীতানাথ ইদানীং মধ্যে মধ্যে দেশে গিয়া, দশ পনের দিন করিয়া থাকিয়া আসেন। দেশ হইতে কলিকাতার বাসাবাড়ীতে ফিরিবার সময়ে একদিন একটি ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। বাহিরে কোথাও গিয়া বাসায় ফিরিবার সময়ে তিনি প্রায়ই দুই এক জনকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনেন। অজানা সহরে নূতন আসিয়া কে গন্তব্যের বা পথের ঠিকানা পায় নাই—সমাসন্ন সন্ধ্যায় সমুদ্বিগ্নমনে পথ জিজ্ঞাসা করিয়া বা আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, দূরাগত বা দূরযাত্রী কোন পথিক অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া পথপার্শ্বে পতিত রহিয়াছে, গাঁইটকাটার বা পকেট-মারার অত্যাচারে হৃতসর্ব্বস্ব কোন বিপন্ন বিদেশী ব্যক্তি পাথেয়-সংগ্রহের অভিপ্রায়ে ইঁহার-উঁহার-তাহার নিকটে পয়সা ভিক্ষা করিয়া লাঞ্ছিত ও

অপমানিত হইতেছে, এমন কোন লোক—সে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা বর্ণাধম শূদ্র, হিন্দু বা মুসলমান, বালক বৃদ্ধ বা যুবা, স্ত্রী বা পুরুষ যাহাই হউক,—সীতানাথের দৃষ্টিতে পড়িলে আর তাহার আশ্রয়, পথ্য বা পাথেয় কিছুরই অভাব থাকে না। তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া, পীড়িত হইলে গাড়ী বা পাল্কী করিয়া আনিয়া, বৈঠকখানায় রাখিয়া স্বয়ং তাহাদের পরিচর্য্যাদি করিয়া থাকেন। সুতরাং নূতন বা অপরিচিত কেহ বাড়ীতে আসিলে তাঁহার পরিজনবর্গ কৌতূহল ও বিস্ময়পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া থাকে না—জানিতেও চাহে না, লোকটা কে বা কেন আসিয়াছে।

এদিন সীতানাথ যে ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন, তাঁহাকে বৈঠকখানায় না রাখিয়া, একবারেই নিজের শয়নকক্ষে আনিয়া তুলিলেন। আগন্তুকের বয়স চল্লিশের বড় বেশী হইবে না, পরিচ্ছদাদি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত; পরণে থান ধুতি, গায়ে শাদা মোটা চাদর, পায়ে চটি জুতা, হাতে গামছা-বাধা ছোট একটি পুটলী—বোধ হয় এক খানি অতিরিক্ত পরিধেয়, চেহারাটি বেশ সুন্দর ও শান্ত, শিখাটি শুধু একটু প্রচণ্ড রকমের। আর সে সৌম্য মূর্ত্তির অভ্যন্তরে, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় একটা তেজস্বিতাও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সন্ধ্যাবন্দনা ও জলযোগাদির শেষে সীতানাথ আগন্তুককে লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে বসিলেন। নাম-ধামাদি পরিচয়ের কথা বোধ হয় পথেই হইয়া থাকিবে; কারণ, সীতানাথ বলিলেন—"স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নামটি তখন—সিতিকণ্ঠ বল্লেন নয়?"—"আজ্ঞে হ্যাঁ"—"নিকটেই কোথাও নিমন্ত্রণের পত্র ছিল বোধ হয়?"— 'নাঃ, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ত এখন এক প্রকার উঠে গেছে বল্লেই চলে। তখন কেউ দশ বিশ হাজার খরচ কর্‌লে দু'টো পাঁচটা টাকা পাওয়া যেত। এখনও লোকে

কাজে কর্ম্মে খরচ করে, কিন্তু পরভাগ্যোপজীবী গরিব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কথা আর কেউ বড় একটা মনে করে না। সে সব নয়, এসেছিলাম একবার এই হাবড়ার রামকৃষ্ণপুরে, একটি পাত্রের সন্ধানে— মেয়েটি বড় হয়েছে।" —"ঠিক ঠাক্ হ'ল ?"—"না, সে হবার মত নয়। পাত্রটির পিতা আমার পরিচিত—আমাদের গ্রামেই তাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল। তাই ভেবেছিলাম, জানাশুনা রয়েছে, আর লোকটার অভাব নেই—পয়সাকড়ি কিছু করেছে, কামড় অল্প হবে; তা'নয়?"—"আপনার গ্রামে পূর্ব্ব-নিবাস ছিল?—লোক-টার নাম কি বলুন দেখি!"—"নামটা কর্ব ?— তা এখন আপনার আশ্রয়ে এসে পড়েছি, কর্তে পারা যায়—তারাচাঁদ চাটুজ্যে"—"ও! মাণিকের সঙ্গে সম্বন্ধ কর্তে গিছ্লেন ?"—"মাণিক কি হীরে জানি না, তবে ঐ রকমেরই কোন দুর্ল্লভ রত্নবিশেষই হবে। তারাচাঁদকে জানেন এই যে দেখ্ছি—লোকটা কি অভদ্র! মশায়! এতটা দূর থেকে তার বাড়ীতে গেছি,—গ্রামের লোক, তা' একবার বস্তে অবধি বল্লে না!"

সীতানাথ একটু হাসিয়া বলিলেন—"তারাচাঁদ কিছু কৃপণস্বভাব। বাড়ীতে লোকজন যাওয়া টাওয়া সে বড় ভালবাসে না—কেউ গেলে বা থাক্লেই কিছু খরচ আছে ত ?"

"থাক্তে কে গেছে বলুন না! দু'টো মিষ্টি কথা ব'লে ফিরিয়ে দিতে ত আর কিছু খরচ হ'ত না!—নিরক্ষর দোকানদার, তার কাছে ভদ্রতার প্রত্যাশা করাই ভুল!"

"দোকানদার বা মূর্খ হ'লেই যে ভদ্র হয় না, তার কিছু মানে নেই। জাতি, ব্যবসায়, পাণ্ডিত্য বা মূর্খতার সঙ্গে ভদ্রতার কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে ব'লে বোধ হয় না—ওটা স্বভাব! উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট্, অধ্যাপক প্রভৃতি কারুকেই ত আর মূর্খ বল্তে পারেন না; কিন্তু তাদের মধ্যে সকলেই যে ভদ্র, তা' বল্তে

পারেন কি? সে যাই হ'ক, কন্যার বিবাহ আপনি ত আর কুলের সঙ্গে বা টাকার সঙ্গে দেবেন না, সচ্চরিত্র একটি পাত্রের সন্ধান করুন! হ'লই বা গরিবের ছেলে—কি থাক্‌লই বা কুলে একটু আধটু দোষ?"

"তা'তেই বা অল্পে হয় কৈ?—আঘাটায় নাব্‌তে গিয়েও দেখেছি, থৈ পাই না। নির্দ্দোষ, নবলক্ষণবিশিষ্ট কুলীন ত এখন আর দেখাই যায় না। কুল-লক্ষণের সবগুলিরই গোড়ায় একটা না একটা কিছু উপসর্গ এসে জুটেছে!—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, এসব এখন অনাচার, অবিনয়, অবিদ্যা আর অপ্রতিষ্ঠা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দান হ'য়েছে, আদান। তীর্থদর্শন আর তপঃ ত একবারেই লোপ পেয়েছে। নিষ্ঠার মধ্যে আছে শুধু বিবাহে পণ-নিষ্ঠা, আর আবৃত্তি হ'য়েছে পুত্র-পণ্যে বণিক্-বৃত্তি। কুলীন শব্দের ব্যুৎপত্তিই এখন উল্‌টে গেছে। বল্লাল সেন প্রবর্ত্তিত নবগুণ-বিশিষ্ট কুলগৌরবান্বিত ব'লে এখন আর কেউ কুলীন নয়, এখন এরা সব মন্দার্থক 'কু'তে লীন বা আসক্ত ব'লেই কুলীন। হ'লে কি হয়, কুলীনের বংশজ কি না! ক্রমে দেখ্‌বেন, কৌলিন্য আর ব্রাহ্মণ্যের মত পরীক্ষা-লভ্য উপাধিগুলিও বংশগত হ'য়ে দাঁড়াবে। পাঠশালের মুখ না দেখেও স্মৃতিতীর্থের ছেলে বল্‌বে—"আমি অমুক স্মৃতিতীর্থ" আর বি, এ-পাশ-করার ছেলেও লিখ্‌বে—"অমুক বি, এ!"

সীতানাথ নীরবে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। সিতিকণ্ঠ নস্য-দান খুলিয়া, একটিপ নস্য লইয়া, একটু উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেন—"ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার পর—সেই সূতিকা-গৃহের খরচ থেকে, তা'র বিবাহ যাবৎ, তা'র প্রতি যা খরচ হ'য়েছে, তা'র উপরে বিবাহের খরচ-পত্র, পাকা দেখা, কুটুম্ব-নিমন্ত্রণের পত্র ছাপান, তাঁ'দের যাতায়াতের খরচ;

গাত্র-হরিদ্রা, পাকস্পর্শ, ফুলশয্যা, লোকজন খাওয়ান, বাড়ী-ঘর সারান, যদি কিছু দেনা থাকে বা অবিবাহিতা কন্যা থাকে তা'র বিবাহের খরচ, সব খতিয়ে যা হয়, সেগুলি দিতে পার? তা' হ'লে তোমার মেয়েটিকে তিনি কৃপা ক'রে তাঁর বাড়ীতে দাসীপনা করতে গ্রহণ করেন। শুধু তা'ই নয়—মেয়েকেও এক সের পাঁচ পোয়া গিনিসোণার গয়না, তাঁর ফর্দ্দমত গড়িয়ে—সম্প্রদানের পূর্ব্বে সেকরা ডেকে গালা বাদে ওজন দিয়ে, দিতে হবে। সোণা, রূপা ও পিতল-কাঁসার, সভা-উজ্জ্বল-করা দান সামগ্রীর মধ্যে কোনটা যদি একটু নিরেস বা অ-পছন্দসই হ'ল, ত সেটা বাতিল ক'রে তা'র বদলে ভাল একটা দিতে হবে। যা'র কোন কুলে কেউ নেই, তা'র ফর্দ্দেও পঞ্চাশখানা নমস্কারী কাপড়, তা'র মধ্যে পাঁচখানা গরদ, সাতখানা তসর, অন্ততঃ দশ পনেরো খানা দেশী তাঁতের হওয়া চাই। তোমার নেই?—যেখান থেকে পার ধার কর! জমি জরাৎ, বাস্তু ভিটে, গরু জরু, তৃণ তরু, যা আছে, বেচ—বাধা দাও! না পার—তোমার মেয়ে আইবড় থাক্! ডাকাত, গাটকাটা—এরাও যা'র আছে; তা'রই ওপরে পড়ে। আছে কি না—দেখে না শুধু ঠেঙ্গাড়েরা, আর ঠেঙ্গাড়ের বেহদ্দ নিষ্ঠুর এখনকার এই কুলীন-কুলজাত কুলাঙ্গারেরা। সতীদাহ-প্রথাটা নিষ্ঠুরতা ব'লে কোম্পানী জোর ক'রে তুলে দিয়েছে,আর পণ-প্রথাটাকে একটা আইন-কানুন কিছু জারি করে উঠিয়ে দিতে পারে না? নীলকরের অত্যাচার একদিন বড়ই প্রবল হ'য়ে উঠে-ছিল; ভগবান্ দেশ থেকে নীলের চাষ উঠিয়ে দিয়েছেন। ক্রীতদাস-প্রথাও গল্পে পরিণত হ'য়েছে। কুলগৌরবশূন্য কৌলীন্যাভিমানের এ অত্যাচার, হে ভগবান্! আরও কত দিন চল্‌বে?"

ভজহরি আসিয়া ভোজনের কথা জানাইয়া গেলে, অমর আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া আহার করিতে নামিল। সীতানাথ একাহারী। রাত্রিতে

তিনি সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া থাকেন। ভজহরিকে ডাকিয়া, নিজের কক্ষে স্বতন্ত্র আর একটি শয্যা-রচনার আদেশ দিয়া, তিনি, সিতিকণ্ঠের আহারের কিরূপ ব্যবস্থা হইল, তাহা দেখিতে গেলেন।

আহারান্তে উপরে আসিয়া সিতিকণ্ঠ বলিলেন—"আপনার দিব্য দৌহিত্রটি ত! দেখ্‌লে চোখের পাপ দূর হয়, কথাগুলি শুন্‌লে কাণ জুড়ায়! যেমন রূপ তেমনি গুণ! আহা! কি বিনীত স্বভাব! কি মধুর কণ্ঠস্বর! ওটি আপনার নিকটেই থাকে বুঝি?"

"আমাদের দাদা-নাতির সম্বন্ধটা কতকটা আপনাদের ইতরেতরাশ্রয়-ভাবের। ওর মা নেই, বাপ আবার বিয়ে ক'রেছে—আর আমারও সংসারে ঐ একমাত্র অবলম্বন।"

"বিবাহ দিয়েছেন কোথায়?"

"এখনও দি নি—সম্প্রতি দেবার ইচ্ছেও নেই।"

"কেন, বিবাহের যোগ্যটি হ'য়েছে ত।—আপনার সংসারেও দেখ্‌ছি লোকাভাব, দিলেই ত ভাল হয়?"

"নিজের একটু আনন্দ বা তৃপ্তির জন্যে এত শীঘ্রই ওর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে একটা বিঘ্ন জুটিয়ে দেওয়াটা আমি ভাল মনে করি না।"

সিতিকণ্ঠ কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রিতে আর কোন কথা হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চুক্তি।

প্রভাতে গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সিতিকণ্ঠ শুনিলেন, সীতানাথ প্রত্যূষে উঠিয়া কোথায় গিয়াছেন, তখনও ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া চলিয়া যাওয়াটা ভাল হয় না ভাবিয়া, তিনি তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বেলা নয়টার সময় সীতানাথ ফিরিয়া আসিলেন, এবং সিতিকণ্ঠকে বিদায়োন্মুখ দেখিয়া বলিলেন—"বিশেষ আবশ্যক কিছু থাকে ত নিষেধ কর্‌তে পারি না, কিন্তু গৃহস্থের বাড়ী থেকে স্নান-আহার না ক'রেই চ'লে যাওয়ার বেলা অতীত হ'য়েছে।"

"না, বিশেষ দরকার তেমন কিছু নেই; এ বেলাটা থেকে গেলেই যদি সুখী হ'ন—তা'ই করি"—বলিয়া সিতিকণ্ঠ হাতের পুটলী ও ছাতা রাখিয়া দিলেন।

সীতানাথ প্রসন্নমুখে বলিলেন—"উত্তম, বসুন! আপনার সঙ্গে কথাও আছে।—আপনার কন্যাদায়-কাতরতা দেখে, গত রাত্রিতে আমার ভাল ঘুম হয় নি; তাই ভোরে উঠেই একবার সেই চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম। আপনার মেয়েটি কেমন বলুন দেখি?"

"আমার মেয়ে, আমি আর কি বল্‌ব? যাঁরা পছন্দ কর্‌বেন, তাঁরা দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন!"

"সুন্দরী কি না—জিজ্ঞাসা কর্‌ছি না; কাণা, খোঁড়া বা কুলক্ষণা নয় ত?"

"কাণা, খোঁড়া বা কাল-কুচ্ছিতও নয়। লক্ষণের মধ্যে—একটা

কাণের পেছনে একখানা কাল জড়ুল আছে। সেটা কু কি সু, তা' জানি না ; তবে দেখ্‌বার পক্ষে অ-শোভাকর হয় নি—সম্মুখ থেকে লক্ষ্যই হয় না।"

"লেখা পড়া জানে ?"

"পাড়াগেঁয়ে গরিব গৃহস্থের মেয়ে, ইস্কুলেও যায় নি, আর ঘরেও শেখাবার জন্যে বিশেষ কোন যত্ন করা হয় নি। তা'র নিজের চেষ্টায় একটু আধটু—সে আর পরিচয় দেবার মত নয়।"

"শিল্প কাজ ?"

"পিঁড়েতে আল্‌পনা, ছেঁড়া কাপড় সেলাই, কাঁথায় তালি লাগান পর্য্যন্ত ; মোজা, কার্‌পেট্ বা উলের ফুল টুল বুন্‌তে জানে-না।"

"গৃহকর্ম্ম কিছু কিছু জানে ত ?"

"সে বিষয়ে তা'র মত নৈপুণ্য বোধ হয় অল্প পুরন্ধ্রীরও দেখা যায়—অতিথি-অভ্যাগত এলে, কি ক'রে তাঁদের স্বচ্ছন্দ-বিধান কর্‌তে হয়, তা' জানে। রেঁধে দশজনকে ভাত দিতে পারে। গৃহস্থের পালনীয় আচারগুলি জানে। শ্রাদ্ধ-শান্তি বা হিন্দুর অনুষ্ঠেয় বারব্রতের আয়োজন জিজ্ঞাসা না ক'রেই কর্‌তে পারে।"

"বয়স কত হ'য়েছে ?"

"বোধহয় এখনও ত্রয়োদশ উত্তীর্ণ হয় নি—বা এই হ'য়েছেমাত্র ; তবে ছিমাল গড়ন ব'লে তা'র চেয়েও কিছু বেশী দেখায়।"

"ঠিকুজী আছে ?"

"ইচ্ছে ক'রেই তা' প্রস্তুত করাবার চেষ্টা করি নি। জন্ম-মুহূর্ত্তে গ্রহ-নক্ষত্রের সংস্থান বা দৃষ্টি অনুসারে মানুষের শুভাশুভের তারতম্য বা সুখদুঃখের ন্যূনাতিরেকে বিশ্বাস করি না ব'লে নয় ; নিয়তি মেনে যদি চল্‌তে হয়, ত ঠিকুজীর অনিশ্চিত ফলাফল গণনা নিয়ে মাথা-

ঘামানর কোন দরকার আছে ব'লে মনে হয় নি! গণনের আবশ্যক হয়, নামে নামেও ত হ'তে পারে?"

"আপনার কন্যার নামটি কি?"

"পদ্মাবতী।"

"খরচপত্র কতদূর কি ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বেন বলুন দেখি?"

"সুপাত্র যদি হয়, ত আমার যথাসর্ব্বস্ব খরচ কর্‌তেও প্রস্তুত আছি। তবে ব'লে রাখি, আমার যথাসর্ব্বস্বের মূল্য পাঁচ সাতশ'র বেশী হবে না।"

"আমার দৌহিত্রটিকে আপনার পছন্দ হয়?"

"এমন কি ভাগ্য ক'রেছি যে, এরূপ সুপাত্রে কন্যাদান কর্‌তে পা'ব—আপনার মত কুটুম্ব পা'ব?"

"কুটুম্ আমি বড় ভাল হব না,—যদি ঘটে, তখন তা' বুঝ্‌তে পারবেন; তবে হাঁ—অমর যে সুপাত্র, সে কথা আমিও মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি। আর কুলশীল সম্বন্ধেও আপনাকে কিছু জান্‌তে শুন্‌তে হবে না। এটিও তারাচাঁদেরই অন্য পক্ষের ছেলে।"

অমরের পরিচয় শুনিয়া, সিতিকণ্ঠ যেন কিছু অপদস্থ হইলেন; তাঁহার মনে হইল, পূর্ব্বরাত্রিতে তিনি তারাচাঁদের অনেক নিন্দা করিয়াছেন। কি বলিয়া সেগুলা সারিয়া লইবেন, নীরবে বসিয়া তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

সীতানাথ বলিলেন—"গত রাত্রিতে আপনি যখন অমরের বিয়ের কথা বলেন, তখনই আমার এ কথা মনে হ'য়েছিল; কিন্তু ওর বাপ রয়েছে, তা'র মত না জেনে ত আপনাকে কোন কথা বল্‌তে পারি না—বলা উচিতও নয়। তাই ভোরে উঠেই একবার তারাচাঁদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিছ্‌লাম!—এখন আমি ভরসা কর্‌তে পারি। আপনার পছন্দ হ'য়ে থাকে, ত বলুন!—কিন্তু এক সর্ত্তে!"

"সাধ্যের অতিরিক্ত অর্থব্যয় ছাড়া আর যা' বল্‌বেন।"

"প্রথমেই আপনাকে ব'লেছি, এখন অমরের বিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে নেই ; অপেক্ষা কর্‌তে সম্মত হ'ন, ত হ'তে পারে। তবে কথার এদিক-ওদিক হবে না—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন।"

সিতিকণ্ঠ বেশ করিয়া একটিপ নস্য গ্রহণ করিলেন, এবং চোখ বুজিয়া একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—"দেখুন, আপনার কথায় আমার অপ্রত্যয় হয় না ; তবে ভবিষ্যতের উপরে অতিনির্ভরটাও ভাল নয়। মানুষের জীবন অস্থায়ী, মনের গতি অস্থির। কোন্ দিক থেকে কখন কি বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হবে, তা' ত কিছুই বলা যায় না। সেই জন্যে—"শুভস্য শীঘ্রং"ই ভাল। অমরের পড়াশুনার বিঘ্ন ছাড়া যদি আপনার অন্য কোন আপত্তি না থাকে, তবে আরও একটা কাজ কর্‌তে পারা যায়, যা'তে আপনার অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হয় অথচ আমাকেও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাক্‌তে হয় না। বিবাহটা এখন হ'য়ে থাক্! যতদিন অমরের পড়াশুনা শেষ না হয়, মেয়ে আমার বাড়ীতেই থাক্‌বে। আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি যে, আপনি যতদিন না বল্‌বেন, ততদিন আমি মেয়েকে পাঠা'বার চেষ্টা কর্‌ব না, বা কোন উপলক্ষেও অমরকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে যত্ন কর্‌ব না। আর সপ্তাহে সপ্তাহে যা'তে মেয়ের কাছ থেকে খামে মোড়া চিঠি না আসে, তা'রও ব্যবস্থা কর্‌ব!"—বলিয়া সিতিকণ্ঠ একটু হাসিলেন।

সীতানাথও একটু হাসিয়া বলিলেন—"মন্দের ভাল বটে—আরও একটা কথা আছে ;—অমর যদি লেখাপড়া শিখ্‌তে বিলাত বা অন্য কোন দূর দেশে যেতে চায়, আমি নিষেধ করব না। সে বিষয়ে আপনার অভিমত কি ?"

সিতিকণ্ঠ এইবার ঠেকিলেন। বেশ করিয়া খানিক নস্য টানিয়া

লইয়া, একটু চিন্তার পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"বা—বা! বি—লা—য়া—ত!!—তবেই—হ'য়েছে!!!—তা' বিলাত কেন, এ দেশে কি আর লেখাপড়া হয় না? এই যে এত জজ্-মেজেষ্টর-কালেক্টর—এরা কি সবাই বিলাত থেকে লেখাপড়া শিখে আসে?"

"যাবেই যে, তা' বল্ছি না; যদি সে এমনই কিছু শিখ্তে চায় যা, বিলাত বা অন্য কোন ম্লেচ্ছদেশে না গিয়ে হয় না, তা'র কথা কি?"

"ফিরে এসে তা' হ'লে ত এই সব ফিরিঙ্গীগুলোর মত বালিশের খোল প'রে, সোলার ধুচুনি মাথায় দিয়ে, ভূত সেজে বেড়াবে বলুন!—মেয়েটাকেও হয় ত কোমরে মশারি জড়িয়ে, গায়ে ঘেরাটোপ এঁটে বেড়াতে হবে?"

সীতানাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"তা'তে কি আসে যায়, পোষাকটা বাইরের আবরণমাত্র বই ত নয়—ভিতরে মানুষ ত যা' তা'ই থাকে?"

"বাইরের হ'লেও পোষাক অনুসারে মনেরও যে একটু ভাবান্তর হয়, মশয়!—বিশেষ ঐ 'হ্যাট্ কোট্'-পোষাকটা মানুষের মনকে যেন বেশ একটু গরম ক'রে তোলে ব'লে বোধ হয়। তা' না হয় হ'ল, কিন্তু বিলাত গেলে জাত যাবে ত—তা'র কি ভেবেছেন?"

"জাত-কুল ত এখন অর্থগত; কিসে যে যায় আর কিসে থাকে, তা' ত আজ পর্য্যন্ত ঠিক বুঝে উঠ্তে পারলাম না! সংস্রব-দোষে বা খাদ্যাখাদ্যের অবিচারে যদি যায়, ত জাত যে ক'জনের আছে তা' বলা যায় না।"

নসিতিকণ্ঠ এইবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বিস্ফারিতনেত্রে, তিনি বেশ একটু উচ্চকণ্ঠে এবং সম্পূর্ণ উত্তেজিতভাবে বলিলেন—"এ্যাঁ! বিলাত গেলে জাত যায় না?—বলেন কি, মশয়!—আপনি হিন্দু ন'ন? শাস্ত্র মানেন না?—আমি ত মেয়ের বিবাহের চেষ্টা অন্যত্র করবই, কিন্তু

আপনার বয়েস্ হ'য়েছে, পিণ্ড-তর্পণের একমাত্র অধিকারী দৌহিত্রকে আপনি ম্লেচ্ছের রান্না শোর-গরু খেতে বিলাত পাঠাবেন?—ছি—ছি—ছি!"

সীতানাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু ও মধুর হাস্য করিয়া শান্তভাবে বলিলেন—"অন্যে আমাকে কি বলে না বলে—জানি না, আমি ত হিঁদু ব'লেই নিজের পরিচয় দিয়ে থাকি—আর শাস্ত্রও যথাসাধ্য মেনে চলি। তবে আমার বিশ্বাস, শাস্ত্র ঈশ্বরের অনুশাসন নয়—প্রাজ্ঞ-বচনমাত্র। ব্যক্তিগত যদৃচ্ছাচার আর তন্নিবন্ধন সামাজিক বিশৃঙ্খলতা-নিবারণের উদ্দেশ্যেই প্রাচীনেরা ব্যবহারের কতকগুলি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ ক'রেছিলেন। জনসমাজ তা'র দ্বারা নিয়মিত বা শাসিত হয় ব'লেই তা'র নাম শাস্ত্র। শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাগুলি যে প্রায় সবই সব কালের উপযোগী, আর ব্যক্তি-বিশেষের ও জনসমাজের হিতসাধক, সে বিষয়েও সংশয় করি না। তবে হিন্দু রাজার আমল থাক্‌লে, অথবা সর্ব্বজনমান্য কোন ব্যবস্থাপক সভাসমিতি থাক্‌লে, সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে, যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে সকলের আংশিক পরিবর্ত্তন হ'ত না—এমনটাও মনে করি না। সে রকম যখন কিছু নেই, আমরা অবিচারেই সেই সব বাঁধা নিয়ম মেনে চল্‌তে বাধ্য হ'য়ে থাকি। কিন্তু চল্‌তে চল্‌তে যদি কেউ ভ্রমে বা বিশেষ প্রয়োজনের বশে সেই বাঁধা পথের একটু আধটু এদিকে-ওদিকেই গিয়ে পড়ে—তা'র জন্যে কি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নেই।"

"প্রায়শ্চিত্ত আছে ব'লে কি জেনে শুনে পাপ কর্‌তে হবে? পাপ দ্বিবিধ—জ্ঞানকৃত আর অজ্ঞানকৃত—পাপের শক্তিও দ্বিবিধ, এক নরকোৎ-পাদিকা, আর এক ব্যবহার-বিরোধিকা"—বলিয়া, সিতিকণ্ঠ শাস্ত্রীয় বচন ও রঘুনন্দনপ্রমুখ স্মার্ত্তগণের মত উদ্ধৃত করিয়া, বিরাট বিচারের উপক্রম করিয়া তুলিলেন। সীতানাথ সস্মিতমুখে কিয়ৎক্ষণ শুনিয়া বলিলেন—

"শাস্ত্রের বিচারে আমি আপনার সঙ্গে পেরে উঠ্‌ব না। অমরকে আপনার কন্যাদান ক'রে কাজ নেই ;- আপনি আপনার মনোমত একটি সুপাত্রের সন্ধান করুন! তা'তে আপনাকে সাধ্যের অতিরিক্ত যা' কিছু খরচ কর্‌তে হবে, সেটা বরং আমি দিতে স্বীকৃত হচ্ছি।"

অমরকে কন্যাদান করিতে পাইবেন না বলিয়া সিতিকণ্ঠ একটু দুঃখিত হইলেন বটে,কিন্তু সীতানাথ যে ধৈর্য্যসহকারে তাঁহার শাস্ত্রীয় আলোচনাটা শুনিলেন না, তাহাতে,বোধ হয়,তদপেক্ষা অধিক দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না ;—সীতানাথের প্রস্তাবিত সাহায্যের কথাতেও, বোধ হয়, অণুমাত্র আনন্দ অনুভব করিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে সীতানাথ বলিলেন—"দেখুন, বিচার না ক'রেই আমরা অনেক সময়ে গড্ডরিকাপ্রবাহ-ন্যায়ে কার্য্য করি—মতামতও প্রকাশ করি। ম্লেচ্ছের সংস্রবাদি অনাচার-দোষের জন্যই, বোধ হয়, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হ'য়েছে। কেউ যদি ফিরে এসে, প্রায়শ্চিত্ত ক'রে, তা'তে আর প্রবৃত্ত না হয়, তবে সে কেন সমাজের পরিত্যাজ্য হ'য়ে থাক্‌বে, সেটা ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। বিলাত-ফেরতের নাম শুনেই আমরা চম্‌কে উঠি ; তা'র ছায়া মাড়িয়ে গঙ্গা-স্নান ক'রেও আপনাকে শুচি মনে কর্‌তে সঙ্কোচ বোধ করি। কিন্তু দেশে ব'সেই শুধু সখ বা বাহাদুরি ক'রে, যা'রা সাহেবের হোটেলে ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্টপাত্রে, যবনের রান্না যাচ্ছে-তাইগুলো গিলে এসে সামাজিক ভোজনের পরিবেশনে ভাতের থালা ধর্‌ছে, তা'দের বেলা ত কথাটি কই না? তা'র মানে আর কিছুই নয়, সমাজ কারু দোষ খুঁজে নিতে চায় না, বা তা'র দৃষ্টির বাইরে গোপনে অনুষ্ঠিত পাপাচরণের জন্যও কারুকে দণ্ড দিতে যায় না। আপনি পাপের দু'টো দিকের কথা বল্‌ছিলেন না?—তা'র মধ্যে যেটা ব্যবহার-বিরোধিকা—সমাজ শুধু সেই

দিক্‌টাই দেখে, সেই দোষেরই দণ্ড বিধান করে। দণ্ড যে নিতে চায় না, তা'কেই ত্যাগ করে—করাই কর্ত্তব্য। শাসন যে মাথা পেতে নিয়েছে, তা'কে ত্যাগ করে না—করা উচিত্‌ও নয়। তবু যদি করে, তবে বুঝ্‌তে হবে যে, সে ক্ষমাশূন্য, নিতান্ত দাম্ভিক, অনুদার ও সঙ্কীর্ণ সমাজের উচ্ছেদ সমাসন্ন। সে সমাজে থাক্‌বার জন্যে আপনার উন্নতির পথ রুদ্ধ করা কারু কর্ত্তব্য নয়।"

সিতিকণ্ঠ আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, হাতের নস্যটুকু রন্ধ্রগত করিয়া বলিলেন—"না ওসব কিছু নয়—আপনি যদি ভরসা দেন,ত আমি অমরকেই কন্যাদান করি। এর পরে সে বিলাতই যাক্ আর যাই করুক, এখন ত আমি স্বভাব-কুলীনের সন্তান, শিক্ষিত; সুধীর সুপাত্রে কন্যাদান ক'রে ধন্য হই।"

"দেখুন—সে আপনার ইচ্ছে! আমার যা' কিছু বক্তব্য, তা' সমস্তই ব'লে দিয়েছি।"

"আমাকে কি দিতে হ'বে, তা' ত এখনও কিছু বলেন নি?"

"আপনি আবার দেবেন কি?—কন্যাটিকে শুধু দেবেন! বরাভরণ বা দানের বস্তু কিছু দেবার দরকার নেই। আপমার মেয়েকে আপনি স্বেচ্ছায় ও সাধ্যানুসারে যদি কিছু দেন, তা'তে আমি নিষেধ কর্‌তে পারি না; কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। পুরোহিত ও পরামাণিক আপনার। এখান থেকে বরযাত্রী—যদি কেউ যায়, ত কেবল এই বুড়ো। তা'র পরে যা'কে যা' দিতে হয়, সে ভার আমার।"

"আপনি আবার কা'কে কি দেবেন?"

"বেশ!—তারাচাঁদ নগদ চার পাঁচ হাজার না নিয়ে ছেলের দাবী ছাড়্‌বে—মনে করেন? সে তখন আমি বুঝ্‌ব। ইচ্ছে হয়, আপনি আজই পাত্র-আশীর্ব্বাদ সেরে যেতে পারেন।"

"সে কি—আপনি এখনও মেয়েটিকে দেখেন নি!"

"মেয়ে দেখা, আশীর্ব্বাদ, সব সেই বিবাহের রাত্রিতে। আপনি ব'লেছেন, মেয়ে কাণা বা খোঁড়া নয়।"

সিতিকণ্ঠ বিস্ময়স্তব্ধদৃষ্টিতে সীতানাথের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দরবার।

অমরের মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হইত, প্রসঙ্গক্রমে সেই পরিত্যক্ত বাড়ীটার কথা তুলিয়া, তাহার অধিবাসীরা কতদিনে ফিরিয়া আসিবে, শৈলেনের নিকটে তাহা জানিয়া লয়। প্রভাবতীর সহিত পরিণয়ের কথাটা তুলিবারও ইচ্ছা হইত কি? সাধিয়া তুলিবার আগ্রহ না থাকিলেও, শৈলেন্ স্বয়ং-প্রবৃত্ত হইয়া কথা তুলিলে, তাহাকে বারণ করিবার প্রবৃত্তিটা তাহার অনেক দিন হইল মরিয়া গিয়াছে।

অকস্মাৎ মেঘ-নির্মুক্ত নীল আকাশে অশনি-নির্ঘোষের মত, সিতিকণ্ঠের কন্যার সহিত নিজের বিবাহের কথা তাহার শ্রুতিগোচর হইল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, কোথাও পলাইয়া গিয়া এই অপ্রত্যাশিত ও অনীপ্সিত বিবাহের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু সীতানাথের ইচ্ছাক্রমে এই বিবাহ হইতেছে ভাবিয়া, মুখে অনিচ্ছার একটি কথাও প্রকাশ করিল না।

অমর এই নির্যাতনের ব্যবস্থা নীরবে মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেও সীতানাথের পরিজনবর্গ তাঁহার এই অত্যাচারটা নিতান্ত নীরবে সহ্য করিতে পারিল না। তাহাদের চঞ্চল রসনা তাঁহার এই কার্য্যের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-জল্পনায় প্রবৃত্ত হইল। সীতানাথ তাহা শুনিতেন আর হাসিতেন। একদিন তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে গৃহ-প্রাঙ্গণে এক সভা বসিল। মান্যের হিসাবে গৌরীঠাকুরাণী সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। বক্তা—শ্রীমান্ ভজহরি। শ্রোতৃবর্গ—রামকুমার, মঙ্গলা এবং আরও এক বৃদ্ধা। সে সেই সময়ে ঘুঁটের দাম লইতে আসিয়াছিল। অমরের বিবাহটা এই প্রকার নীরবে, সম্পূর্ণ আড়ম্বরশূন্যভাবে, কোথাকার কোন্ পাড়াগেঁয়ে গরিবের মেয়ের সঙ্গে সম্পন্ন হওয়া উচিত কি না, তাহাই এ সভার আলোচ্য।

ভজহরি তাহার দীর্ঘ বক্তৃতার উপসংহারে বলিল—"আর যাই হ'ক, পাঁচটা নয় সাতটা নয়, একটা নাতির বে', এই রকম—কাগে-বগে-টের-না-পাওয়ার মত ক'রে, দেওয়াটা কি কত্তাবাবুর ভাল হচ্চে? আমরা কত দিন থেকে আশা ক'রে র'য়েছি, সহরে বড়মানুষের বাড়ী বে' হবে, আমরা গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে যাব—খাব, পরব, দু'টাকা পাব, তা'র কিছুই নয়! কোথা থেকে এক সংক্রান্তি-বামুন অতিথ্ হ'য়ে এসে কত্তাকে ধূলো-পড়া দিয়ে বশ করে গেল! আবার শুনছি, বরযাত্রী পর্য্যন্ত কেউ এখান থেকে যেতে পাবে না—এমন কি শৈলেনবাবু অব্ধিও না! কত্তার ভীমরতী হ'য়েছে—"

বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সীতানাথ গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের কিসের সভা ব'সেছে, গৌরী দিদি?"

ঠাকুরাণী দন্তবিহীন তুণ্ডে ঈষৎ হাস্যের অভিনয় করিয়া বলিলেন, "এই অমরের বে'র কথা হচ্ছেল। তা' হ্যাঁ সীতেনাথ! এত দূরে—এমন গরিবের ঘরে নাতির বে' দেবার জন্যে কি তাড়াতাড়ি প'ড়ে গেছে? মেয়েটি কেমন—থ্যাদা কি প্যাঁচা, তা' অব্ধি একবার নিজের

চোকে দেখে এলে না? এখনকার ছেলেপিলে—পরে একটা বিভ্রাট না ঘটে!"

সীতানাথ দেখিলেন, সকলের অসন্তোষটা কিছু বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আজ আর অন্যদিনের মত কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন না—বলিলেন, "তাড়াতাড়ি কি আমি কর্‌ছি, দিদি? জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ কি মানুষের মুটোর ভেতর? দূর—দূর যে তোমরা বল্‌ছ, দূরটা কি বল দেখি? রেলে পাঁচ ছ'ঘণ্টার পথ, আর নেবেও বড় জোর তিন ক্রোশ। এ আবার দূর কি? তোমরা কি রকম বোঝ—জানি না। আমি ত গরিব গৃহস্থের মেয়ে ঘরে আনাই ভাল মনে করি। তা'রা প্রায়ই সুস্থ, সবল আর কর্ম্মপটু হয়; স্বামীর ঘরে এসে সামান্য সুখকেও সমৃদ্ধি মনে করে—রূপের যদি কিছু অভাব থাকে, সেটাও গতরে পুষিয়ে দেয়। বড় মানুষের মেয়েরা ন'ড়ে বস্‌তে চায় না। সব বিষয়েই তা'দের কেবল মুখ-সিট্‌কান আর মুখ-বাঁকান—কিছুই পছন্দ হয় না। আর গাড়ী বা পাল্কী থেকে নেবে এসেই বৌকে যা'দের বাড়ীতে হাঁড়ীর কানা ধর্‌তে হ'বে, তা'দের ডানা-কাটা পরী এনে ঘর সাজান কেন—তা' বুঝ্‌তে পারি না। মেয়ের রূপ দেখার আগে তা'র বংশ কেমন, মা-বাপ কেমন রীতের লোক, আগে তা'ই দেখা দরকার। সিতিকণ্ঠের মত সরল, নির্ভীক, তেজস্বী, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এখনকার দিনে বড় দেখা যায় না। গরিব ব'লে এমন লোকের মেয়ে না এনে, বড়মানুষ ব'লে একটা কদাচারী যাচ্ছে-তাই লোকের মেয়ে ঘরে আন্‌ব? আর গরিবের ঘরেই কি মেয়েকে সুশ্রী হ'তে নেই? দেখি আর নাই দেখি, আমি ব'লে দিচ্ছি—দেখে নিও!—মেয়েটি খ্যাঁদা-প্যাঁচা হবে না—সুন্দরীই হবে।"

গৌরীঠাকুরাণীর দরবারে দাঁড়াইয়া সীতানাথ যে দিন সকলের সমক্ষে উক্ত প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, সেইদিন হইতে সকলের

মুখ বন্ধ হইল। ইহার তিন চারি দিন পরেই সিতিকণ্ঠ বিবাহের দিনস্থির ও আয়োজন করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। সীতানাথের তখন ভারি জ্বর। সিতিকণ্ঠ বিষণ্ণমুখে, বিবাহ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিলে, সীতানাথ বলিলেন—"কেন? সব আয়োজন হয়েছে, শুভ কার্য্য হ'য়ে যাক্! আমি নাই যেতে পার্‌লাম? আপনি অমরকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান! আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।"

সীতানাথ বধূর জন্য যে সকল অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা, এবং আবশ্যক খরচপত্রের জন্য কিছু টাকা সিতিকণ্ঠের হাতে দিয়া তাঁহার সঙ্গে অমরকে পাঠাইয়া দিলেন। ভজহরির বাসনাও অপূর্ণ রহিল না—সে অমরের সঙ্গে যাইবার অনুমতি পাইল।

নবম পরিচ্ছেদ

বিবাহ।

নিজের ঘরটিতে বইগুলি লইয়া বসিয়া থাকিতে পাইলেই অমর বেশ স্বচ্ছন্দ থাকে। যেখানে সেখানে যাওয়া বা অপরিচিত যার-তার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কহা, সে বড় ভালবাসে না। বিশেষতঃ বিবাহের নামে তাহার যেন কেমন একটা ভয়ই ছিল। উমাসুন্দরী একদিন কথায় কথায় তাহার বিবাহ সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন; তাহার পর একমাস সে তাঁহার সহিত দেখা করে নাই। অতএব সম্পূর্ণ অজানা দেশে ভজহরি ভিন্ন আর সমস্তই অচেনা লোকের মধ্যে বরভাবে আসিয়া পড়িয়া, তাহার দিন যে কিরূপে অতিবাহিত হইতেছিল, তাহা সেই জানে, আর জানেন যিনি তাহার অন্তর্যামী। গাত্র-হরিদ্রার ব্যাপারেই তাহার মনে হইয়াছিল, এক দৌড়ে ষ্টেশনে গিয়া,

একখানা টিকিট লইয়া কলিকাতায় পলায়ন করে। কিন্তু বর পলাইয়াছে জানিতে পারিয়া, পাছে 'ধর্' 'ধর্' করিতে করিতে তাহার পিছনে পিছনে লোক ছুটিয়া যায়, এবং পলাতক চোর-ধরার মত করিয়া তাহাকে আবার ধরিয়া লইয়া আইসে, এই ভয়েই কেবল সে তাহা করিতে পারে নাই।

বিবাহের রাত্রি যতই আসন্ন হইতেছিল, অমরের লজ্জা, ভয় ও উদ্বেগ যেন ততই বাড়িতেছিল। সন্ধ্যার সঙ্গে সিতিকণ্ঠের ক্ষুদ্র গৃহখানি বিবাহ-দর্শনার্থে সমাগতা মহিলাগণে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। বিবাহপর্ব্বে হিন্দু-বাঙ্গালীর গৃহের কোলাহল গাজনের গোলকেও ছাপাইয়া উঠে। অমরের মনে হইতেছিল, আনন্দ-কোলাহলপূর্ণ সেই জনাকীর্ণ গৃহখানি—"হুতবহ-পরীতং গৃহমিব।"

সন্ধ্যার পরেই বিবাহের লগ্ন। দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত সিন্দূরতিলক ও লোহিতমাল্যে শোভিত, অসহায় ছাগশিশু যেমন যাজকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, মাংসাশী দর্শকবৃন্দের ভক্তি অথবা মহাপ্রসাদ-লালসা-প্রবর্দ্ধিত কোলাহলের মধ্যে হাড়িকাঠের নিকটে নীত হইয়া থাকে, লাল-চেলি-পরা বেচারা অমরও প্রায় সেই ভাবেই স্ত্রী-আচার-সম্পাদনার্থে সম্প্রদান-গৃহ হইতে ছাঁদ্‌লাতলায় নীত হইল। পুরাঙ্গনাকীর্ণ প্রাঙ্গণের একদেশে কৌতুকিনী রমণীসঙ্ঘে পরিবৃত ও তাঁহাদের কৌতু-হলাবিষ্ট দৃষ্টির কেন্দ্রীভূত হইয়া, অসহায় অমর যখন আলিপনা-দেওয়া পীঁড়ার উপরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মনোভাব যথার্থই বর্ণনাতীত। সে কাষ্ঠবৎ—স্তম্ভিতবৎ—অথবা চিত্রার্পিতারম্ভবৎ দাঁড়াইয়া কথিত আচার-সম্পাদননিরতা পুরমহিলাগণের সহাস্য-পরিহাস-উক্তি এবং "কড়ি দে' কিনেছি, দড়ি দে' বেঁধেছি, হাতে দিয়েছি মাকু" —ইত্যাদি স্ত্রী-আচারের মন্ত্রপাঠ শুনিতে শুনিতে সীতানাথ ও শৈলেনের উদ্দেশে অনুচ্চারিত ভাষায় আত্মহৃদয়ের উচ্ছ্বাসিত রোষরাশি

উদ্গিরণ করিতেছিল। বিবাহের ব্যাপার যে এতটা দূর গড়াইবে, তাহা জানিলে সে সীতানাথের আদেশ-পালনে সম্মত হইত না। তিনি জানিয়া শুনিয়াও কি প্রকারে এই সমস্ত লজ্জা-জনক, বিরক্তিকর ব্যাপার-সম্পাদনের জন্য, কাপালিকের হস্তে বলি-প্রদানের ন্যায় তাহাকে সিতিকণ্ঠের হস্তে সমর্পণ করিলেন? আর শৈলেন্—সেই বেহদ্দ নির্ব্বোধ, নিরেট মূর্খ—মহামূর্খ—গণ্ডমূর্খ—গোমূর্খ—হস্তিমূর্খ—পাশকরা মূর্খ—ব্রাহ্মণের ঘরের শিক্ষিত গদ্দভ,—সে যদি অমরের সেই লজ্জাপ্রণোদিত বা পরিহাস-বিজল্পিত নিষেধ-বচন না মানিয়া প্রভাবতী-প্রণয়ের কথাটা সীতানাথের কর্ণগোচর করিয়া রাখে, তাহা হইলে কি এ সর্ব্বনাশ এত শীঘ্র এমন ভাবে ঘটিতে পায়?

অমর যে সময়ে উক্ত প্রকার চিন্তায় মগ্ন ছিল, সেই সময়ে একটা অতি অদ্ভুত দৃশ্য তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সেই গাদিলাগা মহিলার ভিড় ঠেলিয়া নিতান্ত বেহায়া দুইটা ষণ্ডামার্ক যুবা, একখানা পীঁড়ার উপরে বসান, লাল-কাপড়-জড়ান, কিম্ভূতকিমাকার কি একটা বহিয়া আনিয়া, তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল; শেষে সেইটাকে তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া রাখিল। লোহিত-বস্ত্রাবৃত জড়পিণ্ডবৎ-প্রতীয়মান সেই বস্তুটাই যে ক্ষৌমাবৃতা বধূ, অমর তাহা কিরূপে বুঝিবে? পথে চলিতে চলিতে সে অনেক বরকে শোভাযাত্রা করিয়া বিবাহ করিতে যাইতে দেখিয়াছে, এবং বিবাহান্তে বধূকে লইয়া ফিরিতেও দেখিয়াছে,—হয় ত ছেলেবেলা কাহারও বিবাহ উপলক্ষে কোন বাড়ীতে লুচিও খাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু বিবাহের ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত কখন তাহার প্রত্যক্ষ হয় নাই। সুতরাং বধূকে সেই ভাবে উপস্থাপিতা দেখিয়া তাহার অল্প বিস্ময় হইল না।

অতঃপর ভয়ানক হইতেও ভয়াবহ সেই শুভদৃষ্টির ব্যাপার! বরের

উত্তরীয়খানি তিরস্করণীরূপে বরবধূর উপরে প্রক্ষিপ্ত হইলে, বরানুগামী নরসুন্দর—শ্রীমান্ ভজহরি উচ্চকণ্ঠে গদ্যপদ্যময় অদ্ভুত ছন্দে মন্দলোকাপসরণের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কৌতুকিনী বামাগণ তিরস্করণীর অভ্যন্তরে ঘন ঘন উঁকি ঝুঁকি আরম্ভ করিলেন। দৃষ্টি-বিনিময়ের জন্য চারিধার হইতে বরবধূর প্রতি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও আদেশ চলিতে লাগিল।

অমর এ বিবাহটাকে বিবাহ বলিয়াই মনে করে নাই। সীতানাথের কার্য্যে তাহার ধারণা হইয়াছিল, এটা তাঁহার একটা পরহিতৈষণার কার্য্য মাত্র। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণকে দায়মুক্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য। সুতরাং অনীপ্সিত কর্ত্তব্যের অনিচ্ছাকৃত-পালনের মত করিয়াই সে এতাবৎ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিল। দৃষ্টি-বিনিময়ের জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া, সত্বর এই বিরক্তিকর ব্যাপারের অবসান-বাসনায় সে মুখ তুলিয়া চাহিল।

বর চাহিল বটে, কিন্তু বধূ তখনও লজ্জায় ঘাড় গুঁজিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া ছিল। সুতরাং অমরের চাওয়াটা বৃথাই হইল। ওদিকে স্ত্রী-আচারেই রাত্রি প্রভাতা হয় দেখিয়া, পুরোহিত ঠাকুর বলিতেছেন—"ওগো তোমরা কর কি?—শীঘ্র শীঘ্র সেরে লও—বরকে ছেড়ে দাও—লগ্ন যে অধিকক্ষণ নাই!" বামাগণ তাহাতে অধীরা হইয়া উঠিলেন। কেহ বলিলেন, "দেরী হবে না ত কি—ঢ্যাঁটামেয়ে কি কথা শোনে?" কেহ বলিলেন, "ছি!—ভারী থ্যাঁচড়া!" কেহ বলিলেন, "থুবড়ী ক'রে রাখ্‌লেই এম্‌নি হয়—ছোট মেয়েকে যা' বল তা'ই শোনে।" অবশেষে এক বুদ্ধিমতী প্রৌঢ়া প্রস্তাব করিলেন—"না—কথায় হবে না, তোরা এক কাজ কর্! কেউ ওর মুখখানাকে তুলে ধর্—আর কেউ চোকদুটোকে চিরে ধর।"

শুভদৃষ্টির এবম্বিধ জুলুমের ব্যবস্থায় বধূর মনে বোধ হয় ভীতির সঞ্চার হইল। সে চাহিবার উপক্রম করিল। কিন্তু একেবারেই ততটা সাহসের কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিল না—মুখখানি তুলিল বটে—চোখ চাহিতে পারিল না। তাহার দীর্ঘ নেত্রের পল্লবদুইখানি যেন লজ্জার ভরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অনেক সাধাসাধনার পর পদ্মার লজ্জা-মুকুলিত নয়নপদ্ম যেন সহসা একবার কোরকের আবরণ ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

মানব-জীবনে যুগান্তকারী যে দুই চারিটা মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, এই শুভদৃষ্টির মুহূর্ত্তটা তাহার অন্যতম। এই সময়ে বর প্রথম তাহার জীবন-সঙ্গিনীকে দেখিতে পায় এবং বধূও তাহার সংসার-পথ-প্রদর্শকের দর্শন লাভ করে। এখন যদিও কেহ কেহ পাত্রীনির্ব্বাচনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া, অথবা সে ভার অন্য অভিভাবকের উপরে ন্যস্ত থাকিলেও বরের বন্ধুরূপে পরিচিত হইয়া বিবাহের পূর্ব্বেই শুভদৃষ্টির কার্য্যটা সারিয়া রাখে, এবং ক্বচিৎ আলোকচিত্রের কল্যাণেও অতি অল্পসংখ্যক বরবধূ পরস্পরের চিত্রিত মূর্ত্তি দেখিবার সুবিধা পায়; তথাপি অনেককেই এই শুভদৃষ্টি-মুহূর্ত্তের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। মুহূর্ত্তটা খুবই ক্ষণিক; লজ্জার আবরণের মধ্যে কখন আসিয়া, কোন্ পথ দিয়া অতীতের অনন্তগর্ভে লুকাইয়া পড়ে, বর বা বধূ কেহই তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু এই চঞ্চল, পলায়নপর, ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত্ত যাহা দান করিয়া যায়, তাহা নিতান্তই ক্ষণিক নহে। মনোমত না হইলে বর তাহা বদল করিয়া লইতে পারে, কিন্তু বধূর সে স্বাধীনতা নাই; ভাল বা মন্দ যেমনই হউক, সুখ বা দুঃখ, প্রণয় বা অপ্রণয়, শান্তি বা অশান্তি যাহাই আনয়ন করুক, বিধাতার দেওয়া বলিয়া সে তাহা নতশিরে গ্রহণ ও আমরণকাল ভোগ করিয়া থাকে।

অমর মনে করিয়াছিল, অযত্নপালিতা, দরিদ্রবালার কুৎসিত, না হয় ত যেমন-তেমন একখানা কৃষ্ণবর্ণ মুখের উপরেই তাহার দৃষ্টি পড়িবে। সে অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছে; যেখানে যত সুন্দরী বালিকা দেখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মনোরঞ্জন বাবুর কন্যা প্রভাবতীকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী বলিয়া তাহার ধারণা হইয়াছিল। পদ্মার রূপ তাহার সে ধারণার উচ্ছেদ করিতে না পারিলেও, তাহার মূলে সজোরে কুঠারা-ঘাত করিল।

পদ্মাবতীর বর্ণ প্রভাবতীর মত উজ্জ্বল-গৌর না হইলেও তাহার মুখ-খানি বড় সুন্দর—নিখুঁত, এবং তাহার চোখদুইটির গঠন ও চাহনির ভাব বড়ই মধুর ও মনোহর—অতুলনীয়। বিধাতা যেন অনবদ্য-সুন্দর কিছু সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় বিরলে বসিয়া অনন্যমনে শুধু কোমলতা আর সৌন্দর্য্যের উপাদানে তাহার এই মুখখানিকে গড়িয়া তুলিয়া, অতি যত্নে ও সাবধানে সূক্ষ্ম তুলিকায় তাহার ভ্রূ এবং নেত্রযুগ চিত্র করিয়াছেন। যাহা হউক, বিবাহের অবশিষ্ট কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন করিতে করিতে অমর মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল; অনেকবার তাহাকে মনে করিতে হইয়াছিল —এ নদীয়ার কারিগরের হাতে গড়া মুখ—এ শুদ্ধান্তদুর্ল্লভ রূপ লইয়া কি কোন অপ্সরোবালা দেবতার অভিশাপে স্বর্গের পথ ভুলিয়া এই দরিদ্র পল্লীবাসীর কুটিরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে?

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

অমরের সঙ্কল্প।

বর্ষাকাল। আকাশে মেঘ। পথে কাদা। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। অমর একখানি বই খুলিয়া ঘরে বসিয়া আছে। শৈলেন্ দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল, ছাতা রাখিল, পাপোষে জুতার কাদা মুছিল; অমর ঘাড় তুলিয়া চাহিল না।

শৈলেন্ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেখিল, অমর বইএর একখানা পাতাও উলটাইল না বা তাহার দৃষ্টি যে পাতার যে অক্ষর-পঙ্ক্তির উপরে পড়িয়া ছিল, সে-স্থান হইতে এক চুলও সরিল না। কাশির ছলে শৈলেন্ গলার একটু আওয়াজ করিয়া নিজের উপস্থিতি জানাইলে, অমর চমকিয়া চাহিয়া দেখিল; এবং হাসিতে হাসিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, শৈলেন্‌কে ধরিয়া আনিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া দিয়া বলিল—"এত বাদলে বেরিয়েছিস্ যে বড়?"

"কি করি—না বেরুলে ত আর তোর দেখা পাবার জো নেই—ক'দিন যাস্ নি কেন বল্ দেখি?"

"ক'দিন! মোটে ত কাল যাই নি; আজ বেরুব মনে কর্‌ছি—আর জলটা এল; তাই একটু দেরী কর্‌ছিনু।"

"সেটা আজও মনে মনেই থেকে যেত! এত মগ্ন হ'য়ে কি ভাব্‌ছিলি—সেই মুখখানি?"

"চুপ্‌ ! দাদামশায় এসেছেন !"

"দাদামশায় আজকাল এত ঘন ঘন দেশে যাওয়া-আসা আরম্ভ করেছেন কেন বল্‌ দেখি ? এখানে ত আর প্রায়ই থাকেন না ! সে মেঠো দেশে তাঁর আছে কি ?"

"কি জানি—ভাই ! দাদামশায়ের দেশ একটা আছে শুনেছি—মেঠো কি বুনো, তা ত আজ পর্য্যন্ত চোখে দেখ্‌তে পেলাম না। ভজার মুখে শুনতে পাই, মানকরে নেবে অনেক দূর গরুর গাড়ীতে যেতে হয়। সেই বলে—দেশে তাঁর অনেক কাজ ; জিগেসা করলে তিনি কিন্তু কিছু বলেন না—শুধু হাসেন। যাবার কথা যখনই বলি, তখনই—'এখন না, দিনকতক যাক্‌—সে দেশের জল-হাওয়া ভাল নয়, গেলেই তোমার জ্বর হবে—পড়াশুনা বন্ধ হবে'—এই কথাই বলেন।"

"সে কথাটা বড় মিছে নয়—তিনি ত যখনই যান জ্বর নিয়ে আসেন, —দেশটা ম্যালেরিয়া ভরা।"

"যেতেও ত ছাড়েন না ! জ্বর হ'লেই পালিয়ে আসেন, কিন্তু জ্বরটা গেলেই আর একদিনও থাক্‌তে চান না।"

এই সময়ে সীতানাথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"কি হে শৈলেন্‌ যে !—তোমাদের খবর সব ভাল ত ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া শৈলেন্‌ তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি আরাম-কেদারাখানি জানালার নিকটে একটু টানিয়া লইয়া বসিতে বসিতে—"তোমাদের কি কথা হচ্ছিল বল দেখি—গোপনীয় কিছু না কি ?" —বলিয়া মৃদু হাস্য করিলেন।

শৈলেন্‌ হাসিতে হাসিতে বলিল—"গোপনীয় একটু বটে, তা বলে' রাখাই ভাল ; আপনি ত নিয়ে যাবেন না—আমরা আপনাকে না বলে' একদিন আপনার দেশ দেখ্‌তে যাবার পরামর্শ করছি।"

সীতা। এই কথা?—তা যেও তখন! ঘরবাড়ী সব গরমেরামতে নষ্ট হ'য়ে গেছ্‌ল; সেগুলো সারিয়ে সুরিয়ে একরকম গুছিয়ে এনেছি—এখনও কিছু বাকী আছে। সে ত পরের কথা—এখন পাশ করে' তোমরা কে কি কর্‌বে মনে করেছ বল দেখি?

অমর। শৈলেন্ ব্যারিষ্টার হ'তে চলল, দাদামশায়!

সীতা। বেশ ত!—তুমি কি কর্‌বে?

অমর। আইন পড়্‌তে বলেন, এইখানে যা হয় পড়ে' পাশ করতে পারি; কিন্তু আইনের ব্যবসাতে যেতে আমার ইচ্ছে নেই।

সীতা। অনিচ্ছের ত একটা কারণ আছে—সেটা কি?

অমর একটু হাসিয়া বলিল—"আমার মনে হয়, মনুষ্যত্ব বজায় রেখে এ ব্যবসাটা ভাল করে' করা একটু কঠিন।"

শৈলেন্ হাসিয়া বলিল—"শুনলেন, দাদামশায়! বাবাকে অমর মনুষ্যের মধ্যেই মনে করে না।"

অমর। সবার কথা বলছি না; তবে আইন-ব্যবসায়ীদের মধ্যে খাঁটি মানুষ শতকরা যে বড় বেশী নয়, তা'তে আমার সংশয় নেই।

সীতা। যাক্—তুমি তা হ'লে কি করবে?—এম. এ. দিয়ে মাষ্টারি বা প্রোফেসারি?

অমর। বৃত্তিটা ভাল—লেখাপড়ার চর্চ্চা থাকে, বিবেক-বিরুদ্ধ কোন অন্যায় কাজ কর্‌বারও দরকার হয় না; কিন্তু বড় দায়িত্বপূর্ণ, দাদামশায়! আর প্রতিদিন প্রতিপদে পরীক্ষা—অগাধ বিদ্যের দরকার! তা ছাড়া চাকরি ত?

সীতা। চাকরিতেই যদি অনিচ্ছে, ত ডাক্তারি পড়!

অমর। চিকিৎসার দোষগুণে রোগী মরেবাঁচে যদি ঠিক হয়, তা

হ'লে এটাও আবার বড় গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ! আর মানুষের মরা-বাঁচা নিয়ে দোকানদারী করতে হবে ত?—সে আমি পারব না।

শৈ। দোকানদারীটা কি?

অমর। নয়?—বুঝতে পারছি, মানুষটা বাঁচবে না—দেখতে পাচ্ছি শ্বাস হয়েছে—আর আধঘণ্টার মধ্যেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হবে; তখনও ত -"ও কিছু নয়, এই ওষুধটা এনে খাওয়ালেই চাঙ্গা হ'য়ে উঠবে"—ব'লে ভিজিটের টাকাটা পকেটজাত করতে হবে?

সীতা। সে দোষ ব্যবসায়ের নয়, অমর!—ব্যবসায়ীর; সেটা যে করতেই হবে এমন কি কথা?—সকলেই তা করে না।

অমর। তা নাই করি, ভুল করব না—এমন ত আর বলতে পারি না! চিকিৎসার ভুলে কারুকে মেরে ফেলেছি—এ ধারণা নিয়ে, নিজের বিবেকটাকে পর্য্যন্ত মেরে ফেলতে না পারলে ত আর জীবনে শান্তির আশা করা যায় না।

সীতা। যাক্—ডাক্তারিও নয়! তা হ'লে করবে কি মনে করছ? কিছু একটা ত করা চাই—লেখাপড়া শিখে ঘরে ব'সে থাকলে ত কেউ ডেকে পয়সা দিয়ে যাবে না।

"এ সব ওর পছন্দ নয়, দাদামশায়! ওর মতলবটা কি জানেন—কবিতা টবিতা লেখে—কাব্য ও নাটক রচনা করে, হ'ল বা—দৈনিক, সাপ্তাহিক্ বা মাসিক একখানা কাগজ টাগজ 'এডিট্' করে, মোট কথা—সাহিত্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে।"—বলিয়া, শৈলেন্ অমরের মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল। অমর ভ্রূকুটি করিয়া শৈলেনের প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ করিল; তাহার মর্ম্ম—'যাঃ! তুই ভারি চেঙ্গড়া!"

সীতানাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"সঙ্কল্প খুবই উচ্চ—খুব উদারও বটে; কিন্তু তা'তে সিদ্ধিটা খুব সুলভ ব'লে আমার মনে হয় না।

অমর! দেবকার্য্য উপোষ ক'রে করতে হয়--তা জান ত? বিশেষতঃ তুমি যার সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে মনে করেছ, সে বড় কঠোর দেবতা! ভরা-পেটে অতি অল্প লোকেই তার সেবা করতে পারে। সেবার ফলে দেশময় কল্যাণ ও প্রসাদ বিতরিত হয় বটে, কিন্তু হতভাগ্য সেবকের অদৃষ্টে—তা'র ঘরে যদি ভাত না থাকে—উপবাস!"

শৈলেন্ হাসিতে হাসিতে অমরের মুখপানে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল; তাহার ভাবটা—"কেমন—কবিতা লিখ্বে?"

অমর কোন কথা কহিল না; মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল। সীতানাথ আরও বলিলেন—"সাহিত্যের সেবায় সাধ হ'য়ে থাকে, কখনো নিষেধ করি না; তবে নিজের নিত্য-সেবার জন্যেও ত তোমাকে যা হয় একটা কোন অর্থকরী বৃত্তি অবলম্বন করতে হবে--তা'রই বা কি স্থির করেছ? আমার যা কিছু ছিল, তা'ত তোমাকে সেবার অনুষ্ঠান শেখাতেই নিঃশেষ হ'য়ে এল—উপকরণ কেনবার জন্যেও যে কিছু রেখে যেতে পারব, তা মনে হয় না।"

অমরের ভ্রূযুগ কুঞ্চিত হইল; সে মুখভার করিয়া বলিল—"আমি কি বল্‌ছি যে, আপনি টাকা রেখে যাবেন, আমি তাই ব'সে ব'সে খাব আর কাব্য-নাটক লিখে বা কাগজ ছাপিয়ে বিতরণ করব?"

সীতানাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তা ছাড়া তোমার সঙ্কল্পিত সেবা বৃত্তি চল্‌বার ত আর কোন উপায় দেখি না, ভাই! আমাদের দেশে, পয়সা-খরচ ক'রে পড়্‌বার ঝোঁক ক'জনের আছে? খুব একটা হুজুকের দিনেও যদি কেউ একজন, একটা পয়সা খরচ ক'রে একখানা খবরের কাগজ কিন্‌লে, অমনি দশদিক থেকে কুড়িটে হাত বা'র ক'রে দশজন সেইখানাকেই কাড়া-ছেঁড়া করবে, তবু আর একজন আর একটা পয়সা বাজে খরচ করবে না। মাসে চারগণ্ডা পয়সা চাঁদা দিয়ে, কেউ যদি

কোন লাইব্রেরী থেকে একখানা বই পড়্‌তে এনেছে, ত সতের জন সেই খানাকে পড়্‌বার-জন্যে তা'র উমেদার ; অথচ তা'রা প্রত্যেকেই হয় ত এক একটা লাইব্রেরী করতে পারে। যাদের পয়সা আছে, তা'রা দশটা খোসা-মুদে প্রতিপালন করে, গাইয়ে বাজিয়ের প্রতিও দশটাকা খরচ করে, তবু দরিদ্র কবি বা দুঃস্থ সাহিত্যিকের জন্যে একটা পয়সা খরচ করতে চায় না। দেশে বিক্রমাদিত্য বা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির মত রাজা রাজড়াও নেই। তা'তেই ত বলতে হয় যে, সাহিত্যসেবা পুণ্যব্রত হ'লেও ঘরে যাদের ভাত নেই, তাদের জন্যে নয়।"

শৈ। কেন—ভাল হ'লে কি আর চলে না, দাদামশায়? অনেকে ত আবার এইতেই বেশ পয়সাকড়িও করেছে শুনতে পাই।

সীতা। দুই একজন ভাগ্যবান কবি বা সাহিত্যিকের কথা হয় ত তুমি শুনে থাকবে, শৈলেন!—বেশীর ভাগই দরিদ্র। কেউ খান ঘাটে জল, কেউ খান ভাঁড়ে—এই পর্য্যন্ত। কবি ও সাহিত্যিকদের দুর্দ্দশার ইতিহাস খুবই বিশাল। ইতালীর লোকবিশ্রুত তাস্‌সো, ফরাসী দেশের প্রথিতযশা কর্ণেলি, স্পেন দেশের প্রতিভাশালী সারবেনটীজ্, পর্তুগেল গৌরব কামোইঁশ্, ইংলণ্ডের স্পেনসার ও ড্রাইডেন প্রভৃতির দুর্দ্দশার কথা মনে কর! সাতটা দেশ যাঁর জন্মস্থান ব'লে ধন্য হবার দাবী করে, সেই হোমর্‌ও দরিদ্র ছিলেন শুনা যায়। আমাদের মধুসূদন হেমচন্দ্রের কথা ত জানই! এতে এ-দেশ সে-দেশ, এ-কাল সে-কাল, ছোট বড় বা ভাল মন্দ নেই,—"যে জন সেবিবে ও পদযুগল, সেই সে দরিদ্র হবে!"—অর্থ ত নেইই—যশও সকলের ভাগ্যে ঘটে না; সমসাময়িক খ্যাতি বা সমাদর আবার অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। তবে প্রতিভার কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়; প্রতিভা যে পথে যায়, সেই পথেই একটা আলোকের রেখা ফেলে যায়। সব সময়ে সঙ্গে-সঙ্গেই সে আলোর

বিকাশ দেখা না গেলেও পরবর্ত্তী যুগে তা'র প্রভা উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

শৈ। লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদটা চিরকাল সব দেশেই আছে। তবে ইংরেজী-সরস্বতী এ দেশে আসাতে সে বিবাদ যেন অনেকটা কম হ'য়ে এসেছে দেখা যায়। ইংরেজী-লেখাপড়ার জোরে, লোক যেমন ক'রেই হোক্ দশটাকা এনে খেতে পারে। কিন্তু বেচারা কবি আর সাহিত্যিকদের ললাটে বিধাতা সেই যে উড়েদের তালপাতার পুঁথি লেখার মত ক'রে মোটা গুনছুঁচের কলমে কুঁদে লিখে দিয়েছেন—"অয়ং দরিদ্রো ভবিতা"—এ নিষ্ঠুর অভিশাপ-লিপির কি আর কোন কালে ক্ষয় হবে না, দাদা মশায়?

সীতা। এটা বিধাতার অভিশাপ কি মানুষের অকৃতজ্ঞতা ও অ-গুণ-গ্রাহিতার ফল, তা ঠিক বুঝে ওঠা যায় না, শৈলেন্! আমরা ফুলের শোভা-সৌরভে মুগ্ধ হ'য়ে থাকি; কিন্তু ফুলটিকে যিনি এই রকম সুন্দর ও সুরভিপূর্ণ ক'রে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হ'তে জানি কি? যাঁর অসীম করুণা, নিয়ত আমাদের উপরে কল্যাণ বর্ষণ করছে, যাঁর দয়াতেই আমাদের সব, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক্—বাঞ্ছিতটি পেতে একটু বিলম্ব হ'লেই আমরা এমন অধীর আর অজ্ঞান হ'য়ে পড়ি যে, তাকেই নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, বিচারবর্জ্জিত প্রভৃতি কত কি ব'লে গাল দিয়ে থাকি—বল দেখি? কবিদের কৃপাতেই আমরা অন্তর্জ্জগতের যত কিছু মহান্ ও সুন্দর, তা উপভোগ করতে পাই। কিন্তু যাঁরা আপনাদের সুখ-স্বচ্ছন্দ, আরাম-ব্যারাম উপেক্ষা ক'রে, দুঃখ ও দরিদ্রতাকে আভরণ ক'রে, আমাদিগে সেই সব উপভোগ্যগুলি উপহার দেবার জন্যে দিনরাত অকাতরে পরিশ্রম করেন, প্রতিদানে আমরা তাঁদিগে কি দি? বইখানা খুব ভাল শুনি, ত কারু কাছে থেকে একবার চেয়ে নিয়ে প'ড়ে

দেখি, তা'তে নিন্দে কর্‌বার মত কি আছে। যদি কোন স্থানে কিছু একটু ভ্রম, প্রমাদ, ত্রুটি বা অসাবধানতার পরিচয় পাই, অমনি নিন্দের ঢাক কাঁধে ক'রে বেড়াই। অন্য কোন গ্রন্থকারের সঙ্গে তাঁর মতের, কথার বা যে কোন রকমের যদি কিছু একটা মিল—একটা অযত্নসম্ভূত সাদৃশ্যের একটু ছায়া বা গন্ধ পাই, অমনি অসঙ্কোচে ব'লে বেড়াই—"ওঃ ভারি ত! আগা-গোড়া অমুকের ছাঁকা চুরি!"—না, অমর! যে বৃত্তি এমন অকিঞ্চিৎপ্রদ—যাতে এমন "যা'র জন্যে চুরি করি সেই বলে—চোর" —তা'তে প্রবৃত্ত হ'তে আমি তোমাকে উৎসাহ দিতে পারি না। তবে তাই যদি তোমার স্থির সঙ্কল্প হয়, ত এইবেলা থেকে হৃদয়টাকে একটু দৃঢ় কর্‌তে চেষ্টা কর—দুঃখ-দরিদ্রতা, অকৃতকার্য্যতার নৈরাশ্য, প্রতিকূল সমালোচনার বিষদংশ, এ-সকলের জন্যে প্রস্তুত হও! আমি একটু হেঁকে একটা কথা বল্‌লে আজও তোমার চোখ ছল্‌ছল্‌ করে, খেতে একদিন একটু বেলা হ'লেই তোমার মুখখানি শুকিয়ে যায়, তুমি কি ততটা পার্‌বে?

অমর মৃদু হাসিয়া বলিল—"ও একটা ঝোঁক—একটা নেশার মত, দাদামশায়! যাদের আছে, তা'রা জেনে শুনেও তাইতে প্রবৃত্ত হয়, সে দুঃখে ও দরিদ্রতাতেও কেমন একটা আনন্দ পায়—তৃপ্তি বোধ করে। তবে শৈলেনের কথা আপনি শুন্‌বেন না! কবে হয় ত রহস্যের ছলে—কি ব'লে থাক্‌ব, তাই ব'লে দিয়ে আমাকে বকুনি খাইয়ে মজা দেখ্‌বার জন্যে ও বলেছে—আমি কি কর্‌ব না কর্‌ব, তা কিছুই ঠিক করি নি —আর নিজে তা কর্‌বও না; আপনি যে পথে যেতে বল্‌বেন, সেই পথেই যাব।"

সীতা। যা'তে তোমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নেই, আমি তোমাকে তা'তে প্রবৃত্ত হ'তেও বলি না। সাহিত্যসেবায় সাধ হ'য়ে থাকে—ক'রো!

তবে সেটাকে পেশা না ক'রে যদি সখের ওপরে পার, ত ভাল হয়। খুব ভাল কাজকেও পেশা ক'রে নিলে আর তা'র সে গৌরব থাকে না; যে সে কাজ করে, তা'রও তেমন ইজ্জৎ থাকে না। ইচ্ছে ক'রে যদি কেউ কোন দেবতার সাধনা করে, সে—সাধক ; আর দেবার্চ্চনাকেই যে পেশা ক'রে নিয়েছে, সে দেবযাজী বা দেবল-ব্রাহ্মণকে লোকে পূজারি বামুণ ছাড়া আর কিছু বলে কি ?

সীতানাথ হাসিতে হাসিতেই উল্লিখিত কথাগুলি বলিলেন। শৈলেন্ও তাহা হাসিতে হাসিতেই শুনিতেছিল। অমরের মুখে কেবল হাসি ছিল না ; সে ঐ কথাগুলিকে ভৎ'সনামূলক ব্যঙ্গোক্তি বুঝিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া ছিল।

সীতানাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরপি বলিলেন—"আমার মতে প্রতিভা বা কবিত্বশক্তি যা'র নেই, তা'র কবিতায় হস্তক্ষেপ করতে যাওয়া ধৃষ্টতা। কবিতা হৃদয় থেকে উৎসের মত বেরিয়ে যা'র কলমকে ঠেলে নিয়ে যায় না—হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে যাকে কথা খুঁজে বেড়াতে হয়—ছন্দের মিলের জন্যে মাথা ঘামাতে হয়, তা'র কবিতা লেখ্‌বার সাধ বিড়ম্বনা মাত্র। প্লেটোই বোধ হচ্ছে বলেছেন,—যাদের অন্তরে কবিত্বের উন্মাদনী শক্তি নেই, বিদ্যাবলে কবিতাদেবীর মন্দির-দ্বারে গিয়ে করাঘাৎ করে, তা'রা মাথাকুটে মলেও সে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত পায় না—তা'র ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না ;—এ কথা ঠিকই। কবিত্ব-শক্তিটা বিদ্যাবলে লাভ করবার নয়—এটা স্বভাব জাত ও সুদুর্ল্লভ। ইহ লোকে মনুষ্যজন্মই দুর্ল্লভ, তা'তে বিদ্যা আরও দুর্ল্লভ, কবিত্ব আরও অধিক দুর্ল্লভ, কবিত্বশক্তি আবার সুদুর্ল্লভ। ছন্দোবদ্ধ বাক্যমাত্রই কবিতা নয়। ভাষার লালিত্য কবিতার অঙ্গ বটে, কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাবই কবিতার প্রাণ। কবিতা না

লিখেও মানুষ কবি হ'তে পারে, কিন্তু মন্দ কবিতা লিখে তা পারে না। কবিতাই সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য ও চিত্র প্রভৃতি যাবতীয় ললিত-কলার মিলনভূমি বা কেন্দ্রস্বরূপ। কবি কথায় ছবি আঁকেন—মূর্ত্তি গ'ড়ে তোলেন। সুন্দর চিত্র যেন মৌন কবিতা, আর ভাল কবিতা যেন বাঙ্ময় চিত্র! কাব্য মাত্রই চিত্রের মালা। উচ্চ অঙ্গের কবিতা—সত্য,সুন্দর ও কল্যাণের একত্র সমাবেশ। দর্শন, বিজ্ঞান আর কবিতা তিনেরই প্রতিপাদ্য এক—পার্থক্য কেবল পথের। দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিক এঁরা সত্যকে তা'র স্বাভাবিক কঠোর মূর্ত্তিতেই লোকের চোখের সাম্‌নে ধ'রে দেন, হিতের জন্যে লোককে কটু-কষায়-তিক্ত সেবন করতে বাধ্য করেন। আর কবি সত্যকে সুন্দর ক'রে বা সৌন্দর্য্যের আবরণ পরিয়ে লোকের সমক্ষে বা'র করেন—সৌন্দর্য্যের দ্বার দিয়ে সত্যে উপনীত হন। কবি মধুর রসের দ্বারাই কল্যাণ সাধন করেন—হিত-কথাও মনোহর ক'রে বলেন। দায়িত্বপূর্ণ ব'লে তুমি মাষ্টারি বা ডাক্তারি করতে ভয় পাচ্ছ—অথচ কবি হবার সাধ করেছ। মনে কর কি কবির কোন দায়িত্ব নেই? কবি জনসমাজের নেতা—পথপ্রদর্শক, মনুষ্যজাতির সুহৃদ্‌ ও শিক্ষক। তাঁর আসন যেমন সবার উচ্চে, দায়িত্বও তেম্‌নি খুব বেশী। স্বভাবলব্ধ শক্তি ভিন্ন সে দায়িত্বের যথোচিত প্রতিপালন সম্ভব নয়। তোমার সে শক্তি আছে কি তা জানি না—অন্ততঃ আজ পর্য্যন্ত তাঁ'র কোন পরিচয় পাই নি: তাই তোমাকে সাবধান ক'রে দেবার জন্যে এত কথা বল্‌লাম।"

এই সময়ে ভজহরি আসিয়া সংবাদ দিল, মাধাইদাস আসিয়াছে। সীতানাথ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মাধাই এবার একা নহে—তাহার সঙ্গে গোবর্দ্ধন-মাষ্টার! তিনি উভয়কে অভ্যর্থনা করিয়া নিজের কক্ষে লইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাণিকের ক্রমোন্নতি।

মাণিককে মানুষের মত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া তারা চাঁদ দেখিলেন, তাহার বুদ্ধি অন্যান্য সর্ব্ববিষয়গ্রাহিণী হইলেও বিদ্যানুসারিণী হইবার মত নহে। সে ছোট বড় করিয়া ছাঁটা চুলে টেরা-টেড়ি কাটিয়া, বেশ পরিচ্ছন্ন হইয়া প্রতিদিন যথাসময়ে বাড়ী হইতে বাহির হয়; কিন্তু সব দিন স্কুলে যায় না, যে দিন যায়---আধ ঘণ্টা—বড় বেশী এক ঘণ্টার অধিক থাকে না। দেখিয়া শুনিয়া তারাচাঁদ খরচপত্র সম্বন্ধে একটু সাব ধান হইয়া গেলেন। তবে পাশ না করিলেও ছেলে পড়িতেছে এই পরিচয়টা বিবাহ-কালে টাকার দাওয়াতে সহায়তা করে বুঝিয়া, বিবাহ-যাবৎ স্কুলের খাতায় পুত্রের নামটা রাখিবার ইচ্ছায় মাহিনাটা ঠিক মাসে মাসে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। তারাচাঁদের খাতিরে---বিদ্যালয়ের দুই একজন শিক্ষক ধারে তাহার দোকানের চাউল খাইয়া থাকেন—মাণিক বছরে বছরে উপর শ্রেণীতে উঠিতে লাগিল। বই কাগজ প্রভৃতি কিনিবার জন্য প্রায়ই তাহার মোটা মোটা টাকার দরকার। তারাচাঁদ হাত গুটাইয়াছেন। কাজে কাজেই রাধারাণীকে নিজের গুপ্ত সঞ্চয় হইতে সে-সব খরচ সরবরাহ করিতে হয়। কখন যদি প্রমদাসুলভ কৌতূহলবশতঃ তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"এত টাকার কি বই, মাণিক?" মাণিক হাঁকিয়া উঠে—"তুমি মেয়েমানুষ বই এর কি বুঝবে বল দেখি?" তাহাতেও যদি তিনি বলেন—"তা নিতি নিতিই বই কিনতে হয়? এত বই তুই পড়িস্ কখন—রাখিস্ কোথা বল দেখি? ঘরে ত একখানাও বই দেখ্‌তে পাই না—একবারও বই হাতে করিস্ না!" মাণিক তাহাতে ভারি চটিয়া যায়, বলে—"এত কৈফিয়ৎ

দিতে পারি না—ইচ্ছে হয় দাও, নয় ত পড়া ছেড়ে দি!" পুত্র মূর্খ হইবার ভয়ে তিনি প্রার্থিত টাকা, কথাটি না কহিয়া গণিয়া দেন।

একদিন বই কিনিবার জন্য মাণিকের কুড়ি টাকার দরকার হইল। পূর্ব্বদিনে মাত্র রাধারাণী তাহাকে পনের টাকা দিয়াছেন। তাঁহার মনে কি হইল—বলিলেন, "এই যে কাল পনের টাকা নিয়েছিস্ মাণিক!" মাণিক ক্রুদ্ধ বৃষভের মত গর্জ্জাইয়া উঠিল—"চাই না, যাও! এত যাদের ট্যাকার মায়া—তাদের ছেলে মুক্‌খু হ'য়ে থাকাই দরকার—কাল থেকে আর ইস্কুলে যাচ্ছি না!"

"রাগ করিস্ কেন, বাবা! না হয় জিগেসাই করেছি—মা বাপ থাক্‌লে এমন করে: নিয়ে যা না—দিচ্ছি ত" —বলিতে বলিতে টাকাগুলি গণিয়া বাহির করিয়া তিনি মাণিকের হাতে গুঁজিয়া দিলেন। টাকার মধুর শীতল স্পর্শেই বোধ হয় মাণিকের মনটা একটু ঠাণ্ডা হইল; রুষ্ট মাণিক তুষ্ট হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"রাগ কি সাধে করি? বাবার যদি আক্কেল থাক্‌ত তা'হলে ইস্কুলের মাইনের মত মাসে মাসে আমাকেও হাত-খরচের জন্যে কিছু কিছু ট্যাকা দিত—তোমার কাছে রোজ রোজ চাইতে হ'ত না! শুধুই কি বই—আমার কি আর দু'পাঁচটা ট্যাকার দরকার হয় না?"

মাণিকের দরকার অনুমান করিয়া রাধারাণী বলিলেন—"তা সে না দেয় আমি ত দিচ্ছি—যার কাছ থেকেই হ'ক তুই ত পাচ্ছিস্, বাবা? তা হাঁ রে—ও গুলো খাস্ কেন? ও ছাইপাঁশ গুলোতে যে বুক খারাপ হয়?"

"হ্যাঁ—ওসব বাজে কথা কা'র মুখে শুনেছ? সস্তার এই সব গুলোতে কি হয় না হয় জানি না—হাইক্লাশ্ ইজিপ্‌শিয়েন্ কি ভার্জ্জিনিয়ার খাঁটি জিনিষে তা হয় কোন্ বেটা বলে বলুক দেখি! সাহেবরা অবধি

তাই খায়—তা জান? তাদের বুকের ছাতি কি—এই এয়াসা একবারে” —বলিয়া মাণিক বুক চিতাইয়া সাহেবদের বুকের বহরটা কত তাহা জননীকে দেখাইয়া দিল। তাহাতে মায়ের মন বুঝিল না, তিনি বলিলেন —“হ্যাঁ রে গোরাদের সঙ্গে কি তোদের তুলনা?—তা’রা গোটা গোটা গরু পার ক’রে দেয়—শুনতে পাই, আর তোরা এক ছটাক জোলো দুধও খেতে পাস্ না! না বাবা! ও সব খাস্নি! তার চেয়ে গোব্রা টোব্রা যা খায় তাই খাস্ না কেন?”

মাণিক হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। সে যে দোয়াত-কলমের সঙ্গেই হুঁকা ধরিয়াছিল, এবং এখন হুঁকা ছাড়িয়া তাহার উপরের জিনিষ ধরিয়া যাহা টানে তাহাও টানিতে আরম্ভ করিয়াছে, রাধারাণী তাহা জানিতেন না।

কখন বই কিনিবার জন্য, কখন থিয়েটার ও সার্কাস্ প্রভৃতি দেখিবার জন্য টাকা লইয়া মাণিক প্রায়ই কলিকাতায় রাত কাটাইয়া আসিত। তাহা দেখিয়া রাধারাণী একদিন তারাচাঁদকে বলিলেন—“হ্যাঁগা আমার বয়েস উঠ্ছে না পড়্ছে বল দেখি—চেরকালই কি আর সমানে খাট্তে পারি? মাণিক ডাগরটি হয়েছে—ওর একটি বৌ ক’রে দাও না! সে এসে জলটুকু পাণটা দিলেও ত আমার ঢের আসান হয়!” তারাচাঁদ পাঁচ দিন শুনিয়া একদিন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—“এত ব্যাস্ত হ’লে চলে কি?—সত্যিই ত আর একট নিকোড়ে মেয়ে কুড়িয়ে আন্তে পারি না—দু’পাঁচ হাজার পেতে হবে ত?” এই কথা লইয়া পতি ও পত্নীর মধ্যে বেশ মিঠেকড়া রকমের একটু বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। রাধারাণী বলিলেন—“দু’পাঁচ হাজার অম্নি প’ড়ে রয়েছে আর কি! ছেলে একটাও পাশ করে নি, ঘর-বাড়ীর এই ছিরি, মানুষ কি দেখে দেবে?—কা’র সিন্দুকের ভেতরে কি আছে না আছে তা আর কে দেখ্তে

আস্ছে ?"—তারাচাঁদ বলিলেন—"ঈঃ ! দেবে না ! তাদের ঘাড় দেবে। বলি—আমার বাপের ত আর কোঠা ভিটে ছেল না গো ! আর বিছেও ত আমার সেই পাঠশাল অবধি—তাও কলাপাতে এগুতে হয় নি—তালপাতেই সাঙ্গ করেছি, তবু কি বে'টায় যেমন তেমন ক'রে সব রকমে তিন চার হাজার ক'রে ঘরে এনেছি ত ? শেষবারটায়—"ভেজবোরে ভেজবোরে" ক'রে তোমার বাপই যা ফাঁকিতে সেরে গেছে।" ফাঁকির কথায় রাধা-রাণীর গা জ্বলিয়া গেল ; বলিলেন—"ফাঁকিটা কি রকম ? সতিনের ছেলে দেখেও তেজবোরেকে মেয়ে দিয়ে গেছেন এই কত না ! তাও কি অমনি হ'য়েছিল না কি ? পুরুষের গুণ ত কত—গাড়ী-বলদে যায় না !" রূপের কথাটা তবু রাধারাণী উহ্য রাখিয়া দিলেন।

পুরন্ধ্রীমাত্রেরই প্রজ্ঞা —"পুরুষ গুণবিজ্ঞান বিমুখী"। শুধু রাধারাণী নহে—সকল ঘরের সকল রাণীই প্রায় তাহাদের পুরুষদের গুণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তারাচাঁদ বোধ হয় সেটা জানিতেন না, তাহাতেই রাধারাণীর বাক্যে তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইলেন। তবে ভিতরে ভিতরে মাণিকের বিবাহের চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের কি দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, তাহারা স্কুলের আয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া দুর্নামের ভয়ে ছাত্র-তালিকা হইতে মাণিকের নামটিকে তুলিয়া দিলেন। তাহাতে যে শুধুই বিবাহ-বিপণিতে তাহার দর কমিয়া গেল তাহা নহে—তাহার হাতখরচেরও বড় টানাটানি পড়িল। রাধারাণী আর বই কিনিতে টাকা দেন না। একটা কথা আছে—আবশ্যকতাই আবিষ্কারের জনয়িত্রী। মাণিক হাতখরচের টাকা পাইবায় একটা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল।

কোথাও কিছু নাই হঠাৎ একদিন মাণিক আসিয়া রাধারাণীকে বলিল—"মা !. আমার হার্ট্-ডিজিজ্ হয়েছে ! বেশীদিন আর তোমাদের

ভোগাব না।”—“সে কি কথা রে—মাণিক ?”—“হাঁ গো—থেকে থেকে বুকটার ভেতর কেমন ধড়ফড় ধড়ফড় করে—যেন ফাঁকা হ’য়ে যায়—দম বন্ধ হ’য়ে আসে। কোন্ দিন শুনবে যে, পথে ঘাটে কোথাও ম’রে প’ড়ে আছি আর কি !”

ভাল একজন সাহেব-ডাক্তার দেখাইয়া, ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া লইবার জন্য টাকা দিয়া তদ্দণ্ডেই রাধারাণী মাণিককে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। মাণিক প্রফুল্লচিত্তে টাকা লইয়া গেল, এবং ব্যবস্থা-পত্রের সহিত টনিকের বোতল আনিয়া দেখাইল। ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন—রোগ অনেক দিনের, বেশী দিন ধরিয়া ঔষধ-সেবন করিতে হইবে। মাণিকের হাত-খরচের টানাটানিটা গেল, বুক-ধড়ফড়ানিও কম পড়িল। রাধারাণীরও উদ্বেগ দূর হইল। কিন্তু আর একদিকে মাণিকের টনিক ভারি একটা গোলযোগ ঘটাইল।

সন্ধ্যার সময়ে একদিন তারাচাঁদ পথে কোন অশুচিপদার্থবিশেষ পদদলিত করিয়া, প্রক্ষালিতপাদুকাহস্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কেমন ইচ্ছা হইল, জামা কাপড়গুলায় একটু গঙ্গাজল ছিটাইয়া দেন। গঙ্গাজলের ঘটীটা কোথায় থাকে—কখন দরকার হয় না বলিয়া—তিনি তাহা জানিতেন না। সন্ধ্যা-আহ্নিকের বাতিকটা তাঁহার নাই। রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেই কাপড় কাচিতে হইবে—হয় ত রাত্রিকালে স্নান করিতেও হইবে। জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি নিজেই খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; অনুমান করিলেন, ভাঁড়ারঘরে যে কুলঙ্গীতে লক্ষ্মীর হাঁড়ি থাকে, গঙ্গাজলের পাত্রটা তাহারই নিকটে কোথাও থাকাই সম্ভব। একটা কেরাসিনের ডিপা জ্বালাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে দেখেন, লক্ষ্মীর হাঁড়ির পাশে কি একটা চকচক করিতেছে ! অন্ধকারে একান্তে বসিয়া লক্ষ্মীর হাঁড়ি কি মহামূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছে, তাহা দেখিবার

আগ্রহে তারাচাঁদ গঙ্গাজলের কথা ভুলিয়া গেলেন; কুলঙ্গীর নিকটে আলোটা ধরিয়া দেখিলেন, কাল একটা থ্যাবড়া বোতল আর তাহার পাশে ছোট একটা শাদা কাঁচের গেলাস্! দেখিয়াই তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। এ কি কাণ্ড! রাধারাণী কি আজকাল বোতলে গঙ্গাজল রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন? বোতলটা বাহিরে আনিলেন। নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—গোবর্দ্ধনকে ডাকিলেন। পরীক্ষায় স্থির হইল, সেটা 'হুইস্কি'র বোতল। সর্ব্বনাশ! লক্ষ্মীর হাঁড়ির পাশে 'হুইস্কি'র বোতল! তারাচাঁদ তাহা লইয়া হুলস্থূল করিয়া তুলিলেন। রাধারাণী যদিও পুনঃ পুনঃ বলিলেন যে, সেটা তা নয়—মাণিকের বুকের অসুখের টনিক, তথাপি তারাচাঁদ থামিলেন না; মাণিক বাড়ীতে আসিলে তাহাকে যাহা মুখে আসিল বলিয়া ভৎসনা করিলেন। সেই হইতে গোবর্দ্ধন ও মাধাই-এর উপরে হইল মাণিকের মহা রাগ। এই শেষ-বোতলটা আনিবার দিনে তাহারা দুইজনেই তাহা দেখিয়াছিল। মাণিক প্রতিজ্ঞা করিল, তাহাদের দুইজনকেই ভিটাছাড়া না করিয়া সে আর হুইস্কিস্পর্শ করিবে না।

পাঁচ সাত দিন পরেই একদিন মাণিক,—"ওঃ—গেলুম—বুক গেল—মলুম"—বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিল, এবং উঠানের মাঝে দাঁড়াইয়া ঠিক অভিনয়ের আহত-নটের মত সটান হইয়া মাটীতে পড়িয়া, গোঁ-গোঁ-শব্দ করিতে লাগিল। রাধারাণী উন্মত্তার প্রায় ছুটিয়া আসিয়া মৃতানুমিত, কপট-মূর্চ্ছিত পুত্রের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া, ঠিক পেশাদারী যাত্রার ধরণে—'মরি রে প্রাণ কুমার আমার"—ইত্যাদি সুর ধরিলেন। তারাচাঁদও বাড়ীতেই ছিলেন। তিনি দেখিলেন, নিতান্ত নিশ্চেষ্ট থাকিলে রাত্রিতে উননে হাঁড়ি চড়িবে না—পেটের জ্বালায় তাঁহাকেও হয় ত পুত্রের অনুগমন

করিতে হইবে। তিনি গোবর্দ্ধনকে ডাক্তার ডাকিতে বলিলেন। ডাক্তার মাণিকের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া, তাহার মস্তকে শীতল জল ঢালিবার ব্যবস্থা দিয়া গেলেন। একটু পরেই রাধারাণীর প্রশ্নে, রক্তবর্ণ দুইটি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, মাণিক উত্তর করিল—"মামাবাবুতে আর মেধোতে কি খাচ্ছিল—আমাকে টান্‌তে বল্‌লে ; তামাক মনে ক'রে যেমন টেনেছি, অম্‌নি বোঁ ক'রে মাথাটা ঘুরে গেল—এখনও গা-মাথা ঘুর্‌ছে ! বেটারা আজ আমার দফা সেরেছিল আর কি !"

অতঃপর যাহা যাহা ঘটিল, তাহার সবিস্তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, ফলে—মাণিককে গাঁজা-চরস প্রভৃতি খাইতে শিখানর অপরাধে গোবর্দ্ধন ও মাধাই 'চাঁদ' গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হইয়া তাহারা সীতানাথের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে।

সীতানাথ সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—"তোকে ত আমি অনেক দিন থেকেই চ'লে আস্‌তে বল্‌ছি, মাধাই ! টাকা আদায় হ'ক আর নাই হ'ক, সেখানে আর যাস্‌ নি—আমার বাড়ীতেই থাক ! আর গোবর্দ্ধনবাবু ! তুমিও থাক ! আমি যতদিন আছি, ততদিন তোমাদের কোন চিন্তা নেই—ভগবান্‌ আমাকে ভাতের কাঙ্গাল করেন নি। আমি না থাক্‌লেও অমর তোমাদের উপকার ভুল্‌তে পারবে না। সংসারে যতদিন তা'র মাথা রাখ্‌বার স্থান থাক্‌বে, একমুঠা ভাত জুট্‌বে, ততদিন তোমাদেরও আশ্রয় বা অন্নের জন্যে কারো দ্বারস্থ হবার দরকার হবে না।" ইহার দুই তিন দিন পরেই তিনি গোবর্দ্ধন ও মাধাইকে সঙ্গে লইয়া দেশে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রেম-বৈচিত্র্য।

অনেক দিন হইল অমর, দায়ে পড়িয়া দারপরিগ্রহ করার মত পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে। সিতিকণ্ঠ দৃঢ় নির্ব্বন্ধসহকারে প্রতিশ্রুতির পালন করিয়া আসিতেছেন। সীতানাথের স্নেহপ্রবণ হৃদয় কিন্তু এই ব্যবস্থার কঠোরতায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে ভাবিয়া থাকেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তেজস্বী ব্রাহ্মণ চুক্তির পালনে শৈথিল্য দেখাইবেন না; কিন্তু তাঁহার পত্নী? তিনি কি মনে করিতেছেন? তাঁহাদের গ্রামের ও পাড়ার লোকেই বা কি বলিতেছে? আর পদ্মাবতী—সেও নিতান্ত বালিকা নহে—সেই বা কি মনে করিতেছে? সে, কি দোষে দীর্ঘ কাল এমন "জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়া" হইয়া পড়িয়া থাকিবে? অমর যদি আরও দশ বৎসর পড়িতে চাহে, দশ বৎসরই কি পদ্মা বাপের বাড়ীতে এইরকম উপেক্ষিতার মত—পরিত্যক্তার মত পড়িয়া থাকিবে? তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছেন, শীঘ্রই একদিন অমরকে লইয়া সিতিকণ্ঠের গৃহে যাইবেন, এবং পদ্মাকে নিজের বাড়ীতে আনিবার ব্যবস্থা করিবেন। এ সঙ্কল্প কিন্তু তিনি কাহারও নিকটে ব্যক্ত করেন নাই। গৌরীঠাকুরাণী যদি বলিতেন— "নাতবৌ কেমনটি হ'ল, তা অবধি আজও একবার দেখতে পেলাম না— সীতেনাথ!" সীতানাথ উত্তর দিতেন—"আর দিনকতক যেতে দাও, দিদি! নাত-বৌ ত আর কোথাও পালাচ্ছে না—তোমাদের জিনিষ তোমাদেরই আছে; দশদিন পরেই দেখতে পাবে।" অমর লজ্জা পায় ভাবিয়া, তাহার নিকটে সীতানাথ প্রসঙ্গক্রমেও পদ্মার কথা উত্থাপন করেন না। আর সকলে কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার মত সাবধান হইয়া চলিত না;

শৈলেন্ ত সর্ব্বদাই অমরকে অন্যমনস্ক বা তন্মনস্ক দেখিতে পায়। তাহার জননী উমাসুন্দরীও অমরের দেখা পাইলেই বলিয়া থাকেন—"এ তোদের কেমন ধারা আচরণ, অমর? গরিব ব'লে কি তাদের প্রাণে মানিষ্যি জন্মের সাধ-আহ্লাদও নেই? বাবার (সীতানাথের) দেখা পেলে ইচ্ছে হয় একদিন গোটাকতক কথা শুনিয়ে দি!" বাড়ীতে গৌরীঠাকুরাণী ত তাল ফাঁক দেন না। অমর যদি কোন দিন মন্দাগ্নিপ্রযুক্ত অল্প আহার করে, ঠাকুরাণী তাহাকে নাত-বৌএর প্রসঙ্গ করিয়া টিট্‌কারি দিতে ছাড়েন না। লঙ্কার জ্বালায় ত অমরের প্রাণে চূণ কম বা বেশী হইয়াছে, বলিবার জো ছিল না, বলিলেই বৃদ্ধা বলিবে—"আর কি এখন তোমাকে লঙ্কার পাণ ভাল লাগ্‌বে, দাদা বাবু! দু'দিন সবুর কর—নতুন হাতের সাজা মিঠে খিলি খেও!"

এ ত গেল পাঁচজনের কথা; অমরের মনের কথা কি, তাহা কেহ বলিতে পারেন? প্রভাবতীর রূপ যে দিনে দিনে ধীরে ধীরে অমরের হৃদয়ে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, সে কথা আর কেহ না জানিলেও পাঠকের অবিদিত নহে। বিবাহের অঙ্গ স্ত্রী-আচারের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে অমরের হৃদয়ে সেই নবাম্বুদবিলাসিনী সৌদামিনীর ন্যায় উদ্যানবিহারিণী নীলবসনা কিশোরীর রূপ একাধিপত্য করিতেছিল, তাহা বলা হইয়াছে। শুভদৃষ্টির পরমুহূর্ত্ত হইতেই অমর দেখিতেছিল, প্রভাবতীর আলোকময়ী প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে, ঊষার অরুণাম্বরে শুক্রতারকার মত, আর একটি স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়ী কিশোরী-মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। এই শেষোক্তাই সতিকণ্ঠের কন্যা—রক্তচেলাবগুণ্ঠিতা বধূবেশিনী পদ্মা। ইহারা দুইজনে দুই দিক হইতে অমরের মনটাকে অনুরাগ-রজ্জুর ফেরে ফেলিয়া বেশ একটু টানাটানি করিতেছিল, এবং তাহার ফলে অমরের হৃদয়ে মন্থনের অনুরূপ একটা আলোড়নও আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার হৃদয়ের

অধিকার লইয়া তাহাদের দুইজনের মধ্যে যেন একটা ঝগড়াও চলিতেছিল. প্রভা যেন বলিতেছিল—"নবাগতা! তুই আবার কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিতেছিস? আমি তোর অপেক্ষা অধিক সুন্দরী; আমিই অগ্রে এ হৃদয়ে প্রণয়-কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছি—অনুরাগের তরঙ্গ তুলিয়াছি; তোর পূর্ব্বেই এ হৃদয়ে আমার অধিকার জন্মিয়াছে. তুই সরিয়া যা!" আর পদ্মা যেন বলিতেছিল—"নিঃসম্পর্কীয়া! তুমি কে? আমি সুন্দরী বা অসুন্দরী যাই হই—এঁর ধর্ম্মপত্নী, ইনি আমার স্বামী। সামাজিক প্রথা, এঁর উত্তরীয়-বসনের সঙ্গে আমার বিবাহ-দুকূলের অঞ্চল বাঁধিয়া দিয়াছে। শাস্ত্রীয় বিধান, সে বাঁধন মন্ত্রপূত করিয়া, সুদৃঢ় ও অচ্ছেদ্য করিয়া দিয়াছে। তুমি কেন আর এখনও এ হৃদয়ের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াও? তুমি তোমার যে রূপের প্রভায়, এই শান্ত হৃদয়ে অবৈধ অনুরাগের তরঙ্গ তুলিয়াছিলে, সেই রূপের কলসী গলায় বাঁধিয়া, সেই রূপোত্থিত তরঙ্গের আবর্ত্তে ডুবিয়া মর!"

নিরীহ অমরের অবশ—অনাত্মবশ মনটাকে লইয়া তাহারা দুইজনে উক্তপ্রকার বিবাদ করিতেছে—টানাটানি কাড়াকাড়ি করিতেছে, আর সে বেচারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, অমরের ধর্ম্মবুদ্ধি তাহার সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়া বলিল—"বাপু হে! প্রভা অধিক রূপবতী হইলে কি হইবে—পদ্মা তোমার ধর্ম্মপত্নী। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়াছ—দেবতার সমক্ষে তাহাকে তোমার জীবন-সঙ্গিনী করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ। সপ্তপদী-গমনের পদে পদে, বিবাহ-অঙ্গ হোম-মন্ত্রে, প্রত্যক্ষ দেবতা অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া, সে তোমাকে যাহা বলিয়াছে এবং তুমি তাহাকে যাহা বলিয়াছ, তাহা মনে করিয়া দেখ! সে তোমার চিরজীবনের সঙ্গিনী হইবে, গৃহ-সংসার-যজ্ঞ হোম-দানাদি যাবতীয় কার্য্যে তোমার সহকারিণী হইবে, সুখে হৃষ্টচিত্তা

হইয়া, দুঃখে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, সব্বাবস্থায় মঞ্জুভাষিণী ও অনন্য-হৃদয়া হইয়া তোমার ভজনা করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে। তুমিও তোমার ধনধান্য ও সুখসম্পদ সমস্তই তাহার অধীন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, দেবতার সমক্ষে তাহাকে বলিয়াছ—"যদেতদ্ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম!" এবং "যদেতদ্ হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব!" তবে আর কেন কুমারী প্রভার অ-ধর্ম্মানুসারিণী চিন্তাকে মনে স্থান দিয়া পাপ সঞ্চয় করিতে চাহ—হৃদয়ে অশান্তির আগুন জ্বালিয়া তাহাতে পুড়িয়া মরিতে ইচ্ছা কর?" তদবধি অমর প্রভার চিন্তাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রভার স্মৃতি পর্য্যন্ত তাহার মন্থনাকুল হৃদয়ের আবর্ত্তে ডুবিয়া তলাইয়া গিয়াছে। সমুদ্র-মন্থনের শেষে স্থিরতরঙ্গ সাগরবক্ষে লক্ষ্মীর ন্যায়, অমরের অপ্রমত্ত—প্রশান্ত হৃদয়ে এখন ভাসিয়া আছে শুধু পদ্মা!

বিবাহের সমস্ত কর্ত্তব্যগুলি নিঃশেষে সম্পন্ন করিবার জন্য, অমরকে দুই তিনদিন সিতিকণ্ঠের গৃহে বাস করিতে হইয়াছিল। বিবাহের রাত্রিতে পদ্মাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা না হইলেও তাহার পরে সে সুবিধা অনেকবার অমরকে সাধিয়াছিল; কিন্তু উৎকট লজ্জা তাহাকে তাহা করিতে দেয় নাই। দেখিবার বা কথা কহিবার সুবিধা পরিত্যাগ করিলেও, অমর সেই অল্প সময়ের মধ্যে নবোঢ়ার প্রকৃতি ও তাহার হৃদয়-ভাবের একটু পরিচয় পাইয়া আসিয়াছিল। সে এক দিনের একটা অতি তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু অনেক তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়াও অনেক সময়ে হৃদয়ের অনেক গভীর ভাব পরিব্যক্ত হইয়া থাকে।

একটা রাত্রি অমরকে পদ্মার সঙ্গে একঘরে একশয্যায় অতি-বাহিত করিতে হইয়াছিল। নবোঢ়া পদ্মাই যে তখন লজ্জায় একহাত ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া শয্যার একটি প্রান্তে জড়সড় হইয়া পড়িয়া ছিল, তাহা নহে, অমরেরও লজ্জা তখন খুব বলবতী। পুরুষের ঘোমটার ব্যবস্থা

থাকিলে বোধ হয় সেও দেড়হাত ঘোমটায় মুখ ঢাকিত। সে ব্যবস্থা না থাকায় সেও শয্যার অন্য প্রান্তে---পদ্মার দিকে পিছন ফিরিয়া---শুইয়া ছিল। উভয়ের মধ্যে তিনহাত বিছানা পড়িয়া থাকিলেও স্বচ্ছন্দভাবের অভাবে অমরের ঘুম আসিতেছিল না। ঘুম না আসিলে মানুষ বিছানায় ছট্‌ফট্‌—এপাশ-ওপাশ করিয়াও যেন একটু শান্তি পায়; অসাবধানে পাছে পদ্মার গায়ে হাতটা বা পা টা ঠেকিয়া যায়, এই আশঙ্কায় অমর তাহাও করিতে পারিতেছিল না। সমস্ত রাত্রি একপার্শ্বে একভাবে থাকিয়া অনিদ্রায় যাপন করিয়া ভোরবেলা কখন তাহার চোখে একবার একটু তন্দ্রা উপস্থিত হইয়াছিল।

বৈশাখের প্রথমে অমরের বিবাহ হয়। অনেক সময়ে বৈশাখের শেষ রাত্রিতে গায়ে কিছু একখানা ঢাকা না থাকিলে ঘুমের একটু ব্যাঘাত ঘটে শীত-বোধ হওয়ায় অমরের পাতলা ঘুমটা মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া যাইতে ছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল--কোঁচার কাপড়টা খুলিয়া গায়ে ঢাকা দেয়, কিন্তু জাগরণের পর নিদ্রার আলস্যে তাহা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কাপড়টা এইবার গায়ে দি-- এইরূপ মনে করিয়া, তখনই আবার আফিম খোরের ঝিমানির মত ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল। সহসা পাদদেশে কিসের একটা কোমল ও শীতল স্পর্শে তাহার ঘুমের ঘোরটা ভাঙ্গিয়া গেল; জাগিয়া দেখিল, একখানা পাটকরা কাপড় তাহার গলা হইতে পা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া গায়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে! শয্যার কিছু দূরে ছোট একটা জানালা খোলা ছিল। বাহিরের জ্যোৎস্না ঘরের অন্ধকারটাকে একটু পাতলা করিয়া দিয়াছিল; তাহাতে জিনিষপত্র সবই অস্পষ্টভাবে হইলেও দেখা যাইতেছিল। অমর দেখিতে পাইল, তাহার পায়ের নিকট হইতে অবগুণ্ঠনবতী একটি ছায়া-মূর্ত্তি ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে! অলঙ্কার শিঞ্জনের মত একটা মধুর, মৃদু রুণুঝুনু শব্দও একবার

শুনিতে পাইল। আর কিছু দেখিবার বা শুনিবার প্রয়োজন হইল না; কাপড় পাট করিয়া তাহার গায়ে ঢাকা দেওয়ার এই কার্যাটা কাহার, অমর তাহা বুঝিতে পারিল। নিদ্রার ঘোর তখন অপগত হইয়াছিল; কিন্তু আর একটা যেন কিসের ঘোর, তাহাকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া, তাহার নিদ্রাশিথিল, অলস ইন্দ্রিয়গণের মোহ উৎপাদন করিল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না—সে মোহাচ্ছন্নভাবটা কি—"প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ!"—তাহার সে অবস্থাটা নিদ্রা নহে—জাগরণ বা স্বপ্ন বলিয়াও সে মনে করিতে পারিতেছিল না। সেটা যেন জাগ্রৎ,স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনের অতিরিক্ত অথচ এই তিনের মিশ্রণজনিত, আনন্দমোহময় একটা তুরীয় অবস্থা! সেই ভাবেই রাত্রি প্রভাত হইল।

সেই ঘটনাটা, ভাব-সাহচর্য্যে অমরের মনে বহুদিনের একটা বিস্মৃত-প্রায় ঘটনাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। রামকৃষ্ণপুরে সে যখন বালক, মাণিক তখন তাহার নিকটে শয়ন করিত। চৈত্রনিশার শেষে শীত-বোধ হওয়ায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে অমর দেখিল, মাণিক শীতে কুকুর-কুণ্ডলী হইয়া ঘুমাইতেছে দেখিয়া রাধারাণী একখানা কাপড় পাট করিয়া আনিয়া তাহার গায়ে ঢাকা দিয়া গেলেন। সন্তানের অভাব অনুমান করিয়া লইয়া তাহার প্রতিবিধানে জননীর যত্ন হইতে পারে। কিন্তু নবোঢ়া বালিকার সে আগ্রহ কেন? দুইদিনমাত্র অমরের সঙ্গে তাহার একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল; তখনও উভয়ের আলাপ-পরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই। ইহা কি স্ত্রীজাতির অশিক্ষিতপটুত্ব, না পতিপ্রাণা হিন্দুবালার জন্মান্তরের সংস্কার? যাহাই হউক, তাহা হইতেই অমর বুঝিয়াছিল যে, বালিকার হৃদয় আছে, এবং সে হৃদয়ে স্বামীর সুখস্বচ্ছন্দ-বিধানের জন্য একটা আগ্রহ জাগিয়াছে। লজ্জা বালিকার বাক্‌প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিয়া রাখিলেও তাহার প্রীতিপ্রবণ হৃদয়কে নিরুদ্ধবৃত্তি করিয়া

রাখিতে.সমর্থ হয় নাই। সেই ঘটনাটা মনে হইলেই অমরের হৃদয়ে আনন্দ ও প্রীতির একটা প্রবাহ ছুটিয়া থাকে—তাহার সমস্ত হৃদয়টা যেন কি একটা মধুরভাবে ভরিয়া যায়!

বিবাহ-রাত্রিতে একটিবারমাত্র শুধু সেই নিমিষের দেখা—কথাবার্ত্তা একটিও হয় নাই! তাহার পরেও আর দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা, পত্রলিখা লিখি—কিছুই নাই! তাহাতেই অমর পদ্মার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল? পাঠকের মনে বোধ হয় এরূপ সংশয় হইবে না। একত্রাবস্থান ব্যতীত প্রণয়-বন্ধন দৃঢ়তর হয় না—একথা প্রাকৃত জনের। প্রণয়-সঙ্ঘটনের জন্য একবারমাত্র দুইজনের দেখাসাক্ষাৎই যথেষ্ট—প্রণয়-বীজ অঙ্কুরিত হইবার জন্যই একবার রসের আবশ্যক হয়, অঙ্কুরিত হইলে আর কিছুরই দরকার হয় না। তখন প্রেম নবজাত অশ্বত্থের ন্যায় লোক-লোচনের অলক্ষ্যে রস-সঞ্চয় করিয়া আপনার পুষ্টিসাধন করে—বর্দ্ধিত ও বদ্ধমূল হইয়া থাকে। পরস্পরের দৃষ্টির বাহিরে দূরে দূরে পড়িয়া থাকিলে, দুইজনের সামান্য স্নেহ-ভালবাসার হ্রাস হইতে পারে, প্রণয়ের তাহা হয় না; ইহাই প্রেমের বৈচিত্র্য। বিরহে দেহ কৃশ হয়, বর্ণ ম্লান হয়, হৃদয়-শোষক, দারুণ দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া যায়; কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের রস শুষ্ক হয় না—প্রেমের হ্রাস হয় না, বরং সম্ভোগের অভাবে রসের উপচয় হেতু প্রেম বর্দ্ধিত বা পুঞ্জীভূতই হইয়া থাকে। নশ্বর দেহ দীর্ঘ বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিয়া মিলনের দিন পর্য্যন্ত টিকিতে না পারে, কিন্তু প্রেমের বিনাশ নাই; প্রেম অজর—অমর! ইহা অবিনশ্বর আত্মাকে আশ্রয় করিয়া, অনন্তকাল ধরিয়া পুনর্ম্মিলনের দিন চাহিয়া থাকে। বিরহ ও মিলনের মধ্যে বিরহটাই বোধ হয় প্রকৃত প্রেমিকের নিকটে সমধিক আদরণীয়। কারণ, বিরহেই প্রেমের প্রকর্ষ ও উৎকর্ষ;

মিলনে—"সৈব তু একা", কিন্তু—"ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে" ! অমরেরও বোধ হয় তাহাই হইয়াছিল। প্রত্যূষে ও প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে, সায়াহ্নে ও নিশীথে অবসর পাইলেই—অনবসরেও একটু অবসর করিয়া লইয়া, অমরের মন পদ্মার সন্ধানে ছুটিয়া যায় ; এবং জনাকীর্ণ মহানগরী হইতে বহুদূরে, বনাকীর্ণ, বিরলবাস পল্লীর স্বল্পপরিজন-গৃহের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া, তাহার পদ্মা তাহাদের এই প্রতীয়মান উপেক্ষা ও অনাদরের দুঃখে শিশিরমথিতা পদ্মিনীর ন্যায় শ্রীহীনা হইয়া পড়িয়াছে কি না, তাহাই দেখিতে চেষ্টা করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেনামা চিঠি।

মাধাই ও গোবর্দ্ধনকে লইয়া সীতানাথ দেশে যাইবার পরে তাহার নামে একখানা চিঠি আসিল। খামের উপরে ডাকঘরের মোহর দেখিয়া অমর বুঝিল, পত্রখানা অনেকদিন পূর্ব্বে তাহার শ্বশুরের গ্রাম হইতে সীতানাথের বাড়ীর ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছিল। ডাকঘরের ভুলে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া সেখানা সে-স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল ; কিন্তু সীতানাথ সে-সময়ে সেখানে উপস্থিত না থাকায়, তাঁহার কলিকাতার ঠিকানায় ফেরৎ হইয়া আসিয়াছে। পত্রখানা কি সংবাদ লইয়া এতদিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা জানিবার কৌতূহল প্রবল হইলেও অমর তাহা খুলিতে সাহস করিল না ; এবং দুই চারিদিনের মধ্যেই সীতানাথের ফিরিবার কথা ছিল বলিয়া পুনর্ব্বার সেখানাকে তাঁহার গ্রামের ঠিকানায় পাঠানও যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না। সীতানাথের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় পত্রখানা তাঁহার শয্যার উপরেই পড়িয়া রহিল। সপ্তাহ চলিয়া

রাখিতে সমর্থ হয় নাই। সেই ঘটনাটা মনে হইলেই অমরের হৃদয়ে আনন্দ ও প্রীতির একটা প্রবাহ ছুটিয়া থাকে—তাহার সমস্ত হৃদয়টা যেন কি একটা মধুরভাবে ভরিয়া যায়!

বিবাহ-রাত্রিতে একটিবারমাত্র শুধু সেই নিমিষের দেখা—কথাবার্ত্তা একটিও হয় নাই! তাহার পরেও আর দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা, পত্রলিখা লিখি—কিছুই নাই! তাহাতেই অমর পদ্মার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল? পাঠকের মনে বোধ হয় এরূপ সংশয় হইবে না। একত্রাবস্থান ব্যতীত প্রণয়-বন্ধন দৃঢ়তর হয় না—একথা প্রাকৃত জনের। প্রণয়-সঙ্ঘটনের জন্য একবারমাত্র দুইজনের দেখাসাক্ষাৎই যথেষ্ট—প্রণয়-বীজ অঙ্কুরিত হইবার জন্যই একবার রসের আবশ্যক হয়, অঙ্কুরিত হইলে আর কিছুরই দরকার হয় না। তখন প্রেম নবজাত অশ্বত্থের ন্যায় লোক-লোচনের অলক্ষ্যে রস-সঞ্চয় করিয়া আপনার পুষ্টিসাধন করে—বর্দ্ধিত ও বদ্ধমূল হইয়া থাকে। পরস্পরের দৃষ্টির বাহিরে দূরে দূরে পড়িয়া থাকিলে, দুইজনের সামান্য স্নেহ-ভালবাসার হ্রাস হইতে পারে, প্রণয়ের তাহা হয় না; ইহাই প্রেমের বৈচিত্র্য। বিরহে দেহ কৃশ হয়, বর্ণ ম্লান হয়, হৃদয়-শোষক, দারুণ দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া যায়; কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের রস শুষ্ক হয় না—প্রেমের হ্রাস হয় না, বরং সম্ভোগের অভাবে রসের উপচয় হেতু প্রেম বর্দ্ধিত বা পুঞ্জীভূতই হইয়া থাকে। নশ্বর দেহ দীর্ঘ বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিয়া মিলনের দিন পর্য্যন্ত টিকিতে না পারে, কিন্তু প্রেমের বিনাশ নাই; প্রেম অজর—অমর! ইহা অবিনশ্বর আত্মাকে আশ্রয় করিয়া, অনন্তকাল ধরিয়া পুনর্ম্মিলনের দিন চাহিয়া থাকে। বিরহ ও মিলনের মধ্যে বিরহটাই বোধ হয় প্রকৃত প্রেমিকের নিকটে সমধিক আদরণীয়। কারণ, বিরহেই প্রেমের প্রকর্ষ ও উৎকর্ষ;

মিলনে—"সৈব তু একা", কিন্তু—"ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে" ! অমরেরও বোধ হয় তাহাই হইয়াছিল। প্রত্যূষে ও প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে, সায়াহ্নে ও নিশীথে অবসর পাইলেই—অনবসরেও একটু অবসর করিয়া লইয়া, অমরের মন পদ্মার সন্ধানে ছুটিয়া যায় ; এবং জনাকীর্ণ মহানগরী হইতে বহুদূরে, বনাকীর্ণ, বিরলবাস পল্লীর স্বল্পপরিজন-গৃহের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া, তাহার পদ্মা তাহাদের এই প্রতীয়মান উপেক্ষা ও অনাদরের দুঃখে শিশিরমথিতা পদ্মিনীর ন্যায় শ্রীহীনা হইয়া পড়িয়াছে কি না, তাহাই দেখিতে চেষ্টা করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেনামা চিঠি।

মাধাই ও গোবর্দ্ধনকে লইয়া সীতানাথ দেশে যাইবার পরে তাঁহার নামে একখানা চিঠি আসিল। খামের উপরে ডাকঘরের মোহর দেখিয়া অমর বুঝিল, পত্রখানা অনেকদিন পূর্ব্বে তাহার শ্বশুরের গ্রাম হইতে সীতানাথের বাড়ীর ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছিল। ডাকঘরের ভুলে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া সেখানা সে-স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল ; কিন্তু সীতানাথ সে-সময়ে সেখানে উপস্থিত না থাকায়, তাঁহার কলিকাতার ঠিকানায় ফেরৎ হইয়া আসিয়াছে। পত্রখানা কি সংবাদ লইয়া এতদিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা জানিবার কৌতূহল প্রবল হইলেও অমর তাহা খুলিতে সাহস করিল না ; এবং দুই চারিদিনের মধ্যেই সীতানাথের ফিরিবার কথা ছিল বলিয়া পুনর্ব্বার সেখানাকে তাঁহার গ্রামের ঠিকানায় পাঠানও যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না। সীতানাথের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় পত্রখানা তাঁহার শয্যার উপরেই পড়িয়া রহিল। সপ্তাহ চলিয়া

গেল, সীতানাথ ফিরিয়া আসিলেন না। আজ কাল করিয়া যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সে পত্রখানাকে ফেরৎ পাঠান অযৌক্তিক বলিয়া অমরের মনে হইতে লাগিল। পক্ষান্তে সীতানাথ ফিরিয়া আসিলেন।

অমর নিজের ঘরে বসিয়া পড়িতেছিল ; সীতানাথের সাড়া পাইয়াই উঠিয়া বাহিরে আসিল। সীতানাথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে—যেন অতিকষ্টে উপরে উঠিয়া আসিলেন, এবং নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়াই শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। অমর পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল—"গিয়ে জ্বরে প'ড়েছিলেন বোধ হয় ?"

উঠিয়া বহির্শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সীতানাথ বলিলেন—"হ্যাঁ—ভাই ! দু'দিন একটু ভাল ছিলাম ব'লে বেরিয়ে এলাম—পথেই আবার আজ একটু হয়েছে। তুমি ভাল ছিলে ত ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া, অমর সীতানাথের গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া বলিল—"একটু কি বল্‌ছেন, দাদামশায় ?—এই যে খুব জ্বর হ'য়েছে !"

"হ্যাঁ—জ্বরটা একটু বেশীই হ'য়েছে"—বলিয়া একটু হাসিয়া, সীতানাথ শয়ন করিলেন ; এবং অমরের হাত হইতে পাখাখানি লইয়া ধীরে ধীরে নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"ভজাকে এক গেলাস্ জল আন্‌তে বল দেখি !"

অমর নিজেই জল লইয়া আসিয়া দেখিল, সীতানাথ পাখা ফেলিয়া গালে হাত দিয়া শয্যার উপরে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখখানি কিছু অপ্রসন্ন। সেই পত্রখানা তাঁহার পাশেই খোলা পড়িয়া আছে। অমর সভয়ে ও সবিস্ময়ে পত্রখানার দিকে আড়ে আড়ে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইয়া বলিল—"জল এনেছি, দাদামশায় !"

সীতানাথ অমরের হাত হইতে গেলাস্‌টা লইয়া বলিলেন—"এ পত্রখানা এখানে কতদিন এসে প'ড়ে আছে, অমর ?"

অমর। আপনি যাবার পরেই এসেছে ; আজ আসেন—কাল আসেন এই ক'রে আর ফেরৎ পাঠান হয় নি।

"ছি ছি!—বড় বিলম্ব হ'য়ে গেছে!"—বলিয়া, সীতানাথ জল পান করিয়া গেলাস্‌টা রাখিতে রাখিতে বলিলেন—"যা হবার হ'য়েছে—এখন ভজাকে একবার ডাক দেখি!—সে গেল কোথা?"

অমর ভজহরিকে ডাকিল। সে আসিলে তাহার হাতে দশটাকার একখানি নোট দিয়া সীতানাথ বলিলেন—"যা দেখি! মিছ্‌রি, বেদানা, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্‌, খেজুর, পান্‌ফল,—রোগীর খাবার মত আরও যদি কিছু পাস্‌—নিয়ে আয় দেখি! যেন তামাক খেতে ব'সে কোথাও দেরী করিস্‌ নি—যাবি আর আস্‌বি!—আর আস্‌বার সময়ে একখানা গাড়ী ডেকে আনিস্‌!"

ভজহরি সবিস্ময়ে একবার সীতানাথের, একবার অমরের এবং একবার হাতের নোটখানার দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলে, সীতানাথ পত্রখানা অমরকে পড়িতে দিলেন। পত্রে লেখকের নাম নাই—সিতিকণ্ঠের কোন প্রতিবেশী লিখিয়াছেন—"পত্রপাঠ আপনার দৌহিত্রকে একবার এখানে পাঠাইবেন! তাহার শাশুড়ীর কঠিন পীড়া—জীবনরক্ষার আশা নাই। অমরকে একবার দেখিবার জন্য তাঁহার বড়ই আগ্রহ। শীঘ্র না আসিলে দেখা হইবার সম্ভাবনা অল্প। সিতিকণ্ঠকে না জানাইয়া পত্র দিলাম। মেয়েরা কলিকাতার ঠিকানা ঠিক বলিতে না পারায় আপনার গ্রামের ঠিকানায় লিখিতে হইল। ইতি—"

অমর পত্রখানা পড়িয়া সীতানাথকে ফিরাইয়া দিল—কোন কথা কহিল না। সীতানাথ বলিলেন—"যাও—তুমি প্রস্তুত হ'য়ে থাক। ভজা এখনি গাড়ী নিয়ে আস্‌বে।"

এ পত্রের সংবাদ সত্য বলিয়া অমরের বিশ্বাস হইতেছিল না—এটা

তাহাকে লইয়া যাইবার একটা ছল বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সীতানাথ বলিলেন—"দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

অমর মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল—"আর তিন দিন পরেই যে আমার একজামিন্, দাদামশায়!"

সীতানাথ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"একজামিন্ কাল হ'লেও আজ তোমাকে যেতে হবে, অমর!—এটা ত সখের যাওয়া নয়!"

"হ্যাঁ! কে একখানা উড়ো চিঠি লিখে দিয়েছে, সেই খবর শুনেই অম্‌নি ছুট্‌তে হবে! সত্যি সত্যিই তাই হ'লে কি এতদিন শ্বশুরমশায় কোন খবর দিতেন না?"

"দেওয়া উচিত ছিল বটে; কিন্তু তিনি না দিতেও পারেন—তা'র অন্য কারণ আছে। সত্য-মিথ্যা যাই হ'ক, এ খবর কাকের মুখে শুনেও চুপ ক'রে থাকা উচিত হয় না। জ্বরটা এত বেশী না হ'য়ে পড়্‌লে আমিই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম; তা ভজা সঙ্গে যাবে, তোমাকে কোন অসুবিধে ভোগ করতে হবে না"—বলিয়া, খরচের মত টাকাকড়ি দিয়া তিনি অমরকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভজহরি যথাদিষ্ট দ্রব্যাদি ও একখানা গাড়ী ডাকিয়া লইয়া আসিল। ভজহরি আসিবার দশ মিনিটের মধ্যেই তাহাকে ও অমরকে লইয়া সেই গাড়ী শিয়ালদহের রেলওয়ে-ষ্টেশন অভিমুখে ছুটিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কৃতান্তের জাল।

সন্ধ্যা হয় এমন সময়ে অমর ও ভজহরি রেলগাড়ী হইতে নামিয়া সিতিকণ্ঠের গ্রাম অভিমুখে চলিল। সঙ্কীর্ণ পথ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়া গিয়াছে। গাড়ী হইতে নামিয়া, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোক—যাহারা সেই পথে আসিয়াছিল তাহারাও কিছুদূর আসিয়াই, ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়া গেল। প্রান্তরের মধ্যেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। ভজহরি দুই তিনবার আসা যাওয়া করিয়াছে—পথ তাহার জানা; সে অগ্রগামী হইল। অমর নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। পত্রের সংবাদ যে মিথ্যা, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় না থাকিলেও, এ যাওয়াটা শুভযাত্রা বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল না। সে মনে মনে নানা কথা তোলাপাড়া করিতে করিতে চলিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে প্রগাঢ় হইতে লাগিল। আসন্ন তমস্বিনীর অসিত ছায়া দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহের উপান্তবনরাজিগর্ভে ঘনীভূত হইতেছিল। তাল, নারিকেল প্রভৃতি উন্নততরুচিহ্নিত পল্লীগুলি, একে একে তিমিরগর্ভে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। দিক্‌চক্রবালের ধূমাভ বৃত্তরেখাও ক্রমে সর্ব্বব্যাপিনী নিশার প্রগাঢ় অন্ধকারে মিশিয়া হারাইয়া গেল। সম্মুখের কতিপয়হস্তমাত্র ভূমি তখনও অস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে পথ চিনিয়া, বিদেশী পথিকদ্বয় দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল। প্রায় দুইঘণ্টা অবিশ্রান্ত চলিয়া তাহারা গ্রামপথে উপনীত হইল।

গ্রামপথও নির্জ্জন। রাত্রিকালে পল্লীপথ সাধারণতঃ নির্জ্জন ও নীরবই

হইয়া থাকে ; কিন্তু সে নির্জ্জনতা ও নীরবতার মধ্যেও যেন জীবন ও জাগরণের একটা সাড়া পাওয়া যায়। ইহাতে সেভাব নাই—এ যেন মরুভূমির নির্জ্জনতা আর শ্মশানের নিস্তব্ধতা ! পথের ধারে মাঝে মাঝে দুই একখানা বাড়ীও দেখা যাইতেছিল, কিন্তু সে বাড়ীগুলাও যেন পরিত্যক্ত গৃহের মত অথবা সমাধি-মন্দিরের মত নীরব ও নিস্তব্ধ !

গ্রামপথে কিয়দ্দূর আসিয়া ভজহরি অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল—"এসে পড়া গেছে, দাদাবাবু ! ঐ দেখ—বাড়ী দেখা যাচ্ছে !" সুদূর তীর্থের দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া দূর হইতে তীর্থ-দেবতার মন্দির দেখিতে পাইলে ভক্ত তীর্থাগতের হৃদয় যেমন আনন্দের একটা উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠে, ভজহরিপ্রদর্শিত গৃহের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া অমরের হৃদয়েও প্রায় সেইরূপই একটা ভাব উপস্থিত হইল। কলিকাতার বাসা-বাড়ীতে দেহটা থাকিলেও তাহার মন প্রতিনিয়ত যে গৃহোপকণ্ঠে পড়িয়া থাকিত, আজ সে সশরীরে সেই পুর পরিসরে উপস্থিত !

"ভজা ! তুই যা—গিয়ে খবর দে !—আমি এইখানে দাঁড়াই" —বলিয়া, অমর সেই গৃহের অনতিদূরে লজ্জা-উৎকণ্ঠা-আনন্দ-উদ্বেগ বিকম্পিতহৃদয়ে দাঁড়াইয়া সিতিকণ্ঠের সাদর অভ্যর্থনার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভজহরি অদৃশ্য হইবার পর বোধ হয় দুই মিনিটও অতীত হয় নাই, তথাপি অমরের মনে হইতেছিল, যেন সে সেই স্থানে কত মাস—কত বৎসর—কত যুগযুগান্তর ধরিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে ! অল্পক্ষণের মধ্যেই সে দেখিতে পাইল, কে একজন অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই গৃহ হইতে বাহির হইল। সিতিকণ্ঠ আসিতেছেন বুঝিয়া অমর নতমস্তকে দাঁড়াইয়া, কি-ভাবে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। পরক্ষণেই ভজহরি ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"এ কিরকম বল দেখি, দাদাবাবু !—বাড়ীতে কেউ নেই কেন ?"

ভজহরির কথাগুলা যেন অমর ভাল শুনিতে পাইল না; মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলছিস্?"

ভজহরি আবার সেইকথা বলিলে, অমর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"এ বাড়ীটা তা'হ'লে নয়—অন্ধকারে এ কা'র বাড়ীতে এনে হাজির করলি ত্যাখ্!"

ভজহরি মাথার মোট নামাইয়া সেইস্থানে বসিয়া পড়িয়া বলিল—"বেশ! অন্ধকারে মাঠের পথ চিনে আস্তে পারলুম, আর বাড়ীটা চিন্তে পারলুম না?"

অমর একটু ভাবিয়া বলিল—"তা হ'লে হয় ত এঁরা কাজকর্ম্ম উপলক্ষে নিকটেই কাদেরও বাড়ীতে গিয়ে থাক্বেন। তা বস্লে কি হবে, জিগেস। করবার চেষ্টা গ্যাখ্!"

ভজহরির মাথার বোঝাটা নিতান্ত লঘুভার ছিল না। সে রাগে গর্গর করিয়া বলিল—"অন্ধকারে এই হাড়পেকের বোঝা ঘাড়ে ক'রে কোথা এখন ঘুরি বল দেখি?—তেম্নি দেশ কিনা—এই হেথা এক ঘর আর সেই আধকোশ তফাতে আর এক ঘর আছে কি না আছে!"

অমর কোন কথা কহিল না—কর্ত্তব্য কি তাহাই ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভজহরি বলিল—"এখানে দাঁড়িয়ে আর মিছে দেরী ক'রে কি হবে—চল ইষ্টিশেনে ফিরে যাই!"

অমরও তাহাই সদ্যুক্তি মনে করিল; তবে কিছু একটা খবর না লইয়াই ফিরিয়া গেলে, সীতানাথ—বোকা বলিয়া—ভৎর্সনা করিবেন ভাবিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সেই সময়ে একটু দূরে কে একজন গান ধরিল—"জাল ফেলে জেলে রয়েছে ব'সে"—

ভজহরি ফিরিয়া যাইবার ব্যগ্রতা ও পথশ্রম ভুলিয়া শুনিতে লাগিল; এবং একটু শুনিয়াই বলিল—"বাঃ! মেয়েলি মেয়েলি বেশ গলাটি—নয়,

দাদাবাবু? আহা! গলাটি যেন গুড়-মাথান—বোধ হয়, যাত্রার দলের ছোক্‌রা হবে!"

ভজহরির কথায় অথবা সঙ্গীতের মধুরতার প্রতি অমরের মন ছিল না; সে ভাবিতেছিল, যে গায়িতেছে সে তাহাদের দিকেই আসিতেছে কি না—আসিলে জিজ্ঞাসা করিবার একটা লোক মিলে। তাহার বোধ হইতেছিল, গীত ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই গায়ক দৃষ্টিগোচর হইল।

অদূরে শাদা জামা-কাপড়-পরা কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইয়াই বোধ হয় আগন্তুক গুণ-গুণ করিয়া নিম্নকণ্ঠে গায়িতেছিল :—

"পালাবার পথ নাহিক এ জালে,
পালাবি কি মন, ঘিরেছে যে কালে,"—

সন্নিকটে আসিয়াই সে গান বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওখানে দাঁড়িয়ে কে গা!"

অমর তাহার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া উত্তর করিল—"আমরা বিদেশী;—তোমার বাড়ী কি এই নিকটেই ভাই?"

আগন্তুকের বয়স সতের আঠার, দেহ বলিষ্ঠ, মাথায় ঝাঁক্‌ড়া-ঝাঁক্‌ড়া চুল, পরণে ময়লা ছোট ধুতি এবং কাঁধে একখানি গামছা উত্তরীয়ের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেছে। অমরের কথার উত্তরে সে বলিল—"আজ্ঞে আমাদের ঘর এ গাঁয়ে নয় গো! এ গেরামের ঐ ওনাদের কাঠ কেটে দিয়ে গেছনু তা'রই পয়সা নিতে এসেছিনু—ঘরে যাচ্ছি; কেন মশায়?"

অমর। তুমি জান কি—বল্‌তে পার—এখানে সিতিকণ্ঠ স্মৃতিরত্নের বাড়ী কোন্‌টা?

আগন্তুক। আজ্ঞে এই যে আপনারা তাঁর বাড়ীর সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন—তাঁকে ডেকে দোব?

অমর। বাড়ীতে কেউ নেই ; এঁরা কোথায় গেছেন—সেটা কা'র কাছে গেলে জান্‌তে পারা যায়—বল্‌তে পার, ভাই ?

"বাড়ীতে কেউ নেই ?"—বলিয়া, সে যেন কিছু চিন্তান্বিত হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; কিছুক্ষণ চিন্তার পরে বলিল—"আচ্ছা আসুন দেখি আমার সঙ্গে—ঘোষাল-খুড়োকে জিগেসা ক'রে দেখি ! তিনি বোধ করি জান্‌বেন !"

আগন্তুক অগ্রে চলিল। অমর তাহার পশ্চাতে গমন করিল। অগত্যা ভজহরিকেও সেই ভারি বোঝাটা আবার মাথায় তুলিয়া লইয়া তাহাদের অনুগমন করিতে হইল। আগন্তুকের 'ঘোষাল-খুড়ো'র বাড়ীটা নিতান্ত নিকট নহে। সে তাহাদের গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে বলিতে চলিল। সম্প্রতি পাশাপাশি কয়েকখানি গ্রামে একটা সংক্রামক রোগ আসিয়া ভীষণ মড়কের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই রোগ যাহাকে ধরিতেছে, তাহাকেই লইয়া যাইতেছে ; তাহাতে বহুগোষ্ঠীর বসতি, অনেক বড় বড় বাড়ী একেবারে মনুষ্যশূন্য হইয়া গিয়াছে। যাহাদের কোথাও পলাইবার স্থান আছে, তাহারা পলাইয়াছে ; যাহাদের তাহা নাই, তাহারা মরণের অপেক্ষায় এইস্থানেই পড়িয়া আছে। কেহ মরিলে তাহার আত্মীয়বর্গ আর কাঁদে না—নিত্য নিত্য মরণ দেখিয়া সকলের প্রাণ যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। নিকটের কোন গ্রামেই ভাল একজন ডাক্তার নাই ; যাঁহারা আছেন—তাঁহারাও মরিবার ভয়ে রোগী দেখিতে বাহির হন না ইত্যাদি নানা কথা বলিতে বলিতে আগন্তুক একখানি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল—"ঘোষাল-খুড়ো ঘরে আছ গা?—ও ঘোষাল-খুড়ো !"

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পরে, খর্ব্ব ও স্থূলকায় এক প্রৌঢ় হুঁকা হাতে করিয়া বাহির হইলেন, এবং বিরক্তিব্যঞ্জক রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন—"কে ডাকে—খেপা ?—এত রাত্তিরে ডাকাডাকি কর্‌ছিস্ কেন ?"

তৎপরে কিয়দ্দূরে অবস্থিত অমর ও ভজহরিকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওরা ওখানে কা'রা দাঁড়িয়ে বল্ দেখি ?"

ধ্রুব—ইহার অপভ্রংশে বা ওরফে—'ধেপা' তখন তাহার 'ঘোষাল খুড়ো'র একটু নিকটে ঘেঁষিয়া আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল—"এনাদের তরেই ত তোমাকে ডাক্‌ছি—স্মিরিতিরত্নো ঠাকুর্‌রা কেউ ঘরে নেই কেন বল দেখি—কোথা গেছে বল্‌তে পার ?"

স্নেহ পাপ-শঙ্কী। প্রিয় আত্মীয়জনের অমঙ্গলের আশঙ্কাই মনুষ্যের মনে অগ্রে উদিত হয়। ধ্রুব বলিয়াছে—মড়কে বহুপরিবারপূর্ণ কত গৃহ একবারে মনুষ্যশূন্য হইয়া গিয়াছে। আসিবার সময়ে অমরও স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া আসিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সিতিকণ্ঠের গৃহও হয় ত সেইরূপই হইয়া থাকিবে! বাড়ীতে ত সবে তিনজনমাত্র অধিবাসী—তিনজনেই হয় ত একে একে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে! তবে, 'অনেকে দেশ ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে'—ধ্রুব'র এই কথাটায় অমরের মনে একটু আশা—অস্তমিত সূর্য্যের উচ্চ-তরুশির-সম্পৃক্ত বিলীয়মান রশ্মি-রেখার ম্লান আভার মত একটু ক্ষীণ আশার মিট্‌মিটে আভা তখনও লাগিয়া ছিল। সুতরাং ঘোষালমহাশয় ধ্রুব'র কথার উত্তরে কি বলিবেন, তাহা শুনিবার জন্য সে আশা ও আশঙ্কা-আন্দোলিতচিত্তে উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

ঘোষালমহাশয় ধ্রুবকে কোন কথা না বলিয়া, অমরের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কোথা থেকে আস্‌ছেন ?"

ভজহরি তখন মাথার বোঝাটা নামাইয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং তাহার আর একটি পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার আবশ্যক ছিল না ; সে অগ্রসর হইয়া বলিল—"আমরা কল্‌কেতা থেকে আস্‌ছি—ইনি স্মির্ত্তি-রত্নো মোশয়ের জামোতা—তাঁদের খবর কিছু বল্‌তে পারেন ?"

"খবর আর মাথামুণ্ডু কি বল্‌ব, বাপু—ভাল নয়!"—বলিয়া ঘোষাল-মহাশয় অমরকে বলিলেন—"তোমারই নাম, অমর? আহা! তোমাকে একটিবার দেখ্‌বার জন্যে তোমার শ্বাশুড়ীঠাকুরুণের কি আগ্রহ!—বড়ই দেরীতে এসেছ, বাপু!" তাহার পরে যেরূপে সংবাদ পাইতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল, অমরের মুখে তাহা শুনিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন—"খবরই কি তোমার শ্বশুর দিতে চান? আমি তাঁকে না ব'লেই একখানা পত্র লিখে দিয়েছিনু। এমন প্রতিজ্ঞাও কখন কারো দেখিনি, বাপু! স্ত্রীকে শ্মশানে রেখে এসে যখন নিজে অসুখে পড়্‌লেন, তখনও বার বার আমরা কত বুঝিয়ে বল্‌লুম যে, মেয়েটাকে তা'র শ্বশুরবাড়ীতে পাঠিয়ে দিন—নয় ত খবর দিন যে, তা'রা এসে নিয়ে যাক! কিছুতেই না—'গুষ্টিবর্গে মর্‌ব সেও ভাল—কথার নড়চড় হবে? কি দারুণ পণ!" অমর প্রভৃতি সকলে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি আরও বলিলেন—"যা হবার হয়ে গেছে, এখন তোমাদের আর এখানে একদণ্ডও থাক্‌তে বলি না; তোমরা ইষ্টিশেনে ফিরে যাও—রাত্রিতে গাড়ী না থাকে—সেইখানেই উপোষ ক'রে প'ড়ে থাকগে! এ গ্রামের বাতাস বিষাক্ত—এখানে কিছু খেয়ে বা এক মিনিটও থেকে কাজ নি! আমাদের বড়ই দুর্দ্দিন এসেছে, বাপু! দেশ ত একেবারে উজোড় হ'য়ে গেল! শুধু কি তোমার শ্বশুরের?—এমন কত বাড়ী একবারে বাসিন্দাশূন্য হ'য়ে প'ড়ে আছে! আমি আর বিলম্ব কর্‌তে পার্‌ছি না; আমারও বাড়ীতে তিনটি একসঙ্গে প'ড়েছে—একটি ত এখন-তখন হ'য়ে রয়েছে—" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই বাড়ীর ভিতরে একটা চাপা-কান্নার মৃদু শব্দ শুনা গেল। "আমি চল্‌লাম, বাপু!"—বলিয়াই তিনি ত্বরিতপদে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

যাহারা দাঁড়াইয়া রহিল, তাহারা একবার পরস্পরে মুখচাওা-চাহি করিল মাত্র—কেহ কোন কথা কহিল না; তিন জনেই নীরবে

ফিরিয়া চলিল। ফলের টুকরি ঘোষালমহাশয়ের গৃহবহির্ভাগেই পড়িয়া রহিল।

ফিরিবার সময়ে অমর একবার সিতিকণ্ঠের শূন্যগৃহখানির পানে চাহিয়া দেখিল। কেহ কোন গুপ্তস্থানে মহামূল্য কোন রত্ন রাখিয়া গিয়া বহুদিন পরে আসিয়া যদি দেখিতে পায় যে, তাহার সেই সযত্নরক্ষিত রত্ন দস্যু-কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, তবে সে যেভাবে সেই শূন্য রত্নাধারের পানে চাহিয়া দেখে, অমরও ঠিক সেই ভাবে সেই শূন্যগৃহের পানে দৃষ্টিপাত করিল।

অমর ও ভজহরির নিকট দুঃখিতচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়া, সেই অপরিচিত শ্রমজীবী যুবা ভিন্ন-পথে প্রস্থান করিল। বিষণ্ণ ভজহরি ও মৌন অমর কিছুদূরে আসিয়া শুনিতে পাইল, সেই মারীভয়ভীত, বিষাদ গ্রস্ত, নীরব পল্লীর নৈশ-নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া ধ্রুব গাহিতেছে :—

"অগাধ জলে মীনের আগার, জেলে জাল ঘিরেছে ভুবন-বিস্তার,
যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে।"

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

তারাচাঁদের কু-পড়্‌তা।

সময়টা তারাচাঁদের কিছু মন্দ পড়িয়াছে। অনেক দিন হইতেই তিনি অম্ল, অজীর্ণ, জ্বর, আমাশয় ও মূত্রাশয়ের রোগে কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার সে ভুঁড়ি এখন আর তেমন "কাঁটালের গুঁড়ি"র মত নাই—শুষ্ক হইয়া মৃদঙ্গের খোলের আকারে পরিণত হইয়াছে, হাঁত-পা-গুলিও শুকাইয়া কাঠির মত সরু সরু হইয়াছে, পূর্ব্বের সে হাঁক-ডাক নাই, দৌড়-ধাপও তিনি আর তেমন করিতে পারেন না; গোঁপজোড়াটি কেবল পূর্ব্বাবস্থাতেই আছে—তাহাতেই শুধু তাঁহাকে—'তিনি' বলিয়া চিনিতে পারা যায়। পয়সাখরচের ভয়ে তিনি প্রথমে ডাক্তার বা কবিরাজ ডাকেন নাই, টোট্‌কায় সারিবারই চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু রোগ ক্রমে বাড়িয়া উঠিল দেখিয়া, রাধারাণীর পীড়াপীড়িতে সম্প্রতি একজন অল্পপয়সার কবিরাজ দেখাইতেছেন। কবিরাজের চিকিৎসায় রোগের কিছু উপশম হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার শরীরের অবস্থা এখনও বড়ই শোচনীয়।

অপরাহ্নে রাধারাণী একটা পাথরবাটীতে ওষুধ মাড়িয়া আনিয়া বলিলেন—"নাও—হ'য়েছে, এইবার খেয়ে ফেল! আর পারি না—আমার হাত জ্ব'লে গেল।"

তারাচাঁদ তাঁহার হাত হইতে ঔষধের পাত্রটা লইয়া, বিশেষ করিয়া দেখিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"উঁহুঁ—ঠিক্‌টি এখনো হয় নি—; পার না—বল্‌ছ, আর কি হবে, যা হ'য়েছে তাই খেয়ে ফেলি।"

ঔষধের মোড়া, অনুপানের গুঁড়া ও মধুর শিশি প্রভৃতি তুলিয়া রাখিতে রাখিতে রাধারাণী বলিলেন—"হাতে ফোস্কা উঠে পড়্‌ল, তবু ঠিক্‌টি হ'ল না ? তা' ও বলি—পাথরবাটী আর জাঁতীর বাঁটে আর কত হবে ? ছ'মেসে রোগ ধ'রেছে, তবু ত একটা খল্‌-ডাঁটী কিন্‌বে না !"

"হাাঁ ! দু'দিনের জন্যে আবার কতকগুলো পয়সা নষ্ট করি—চ'লে গেলেই হ'ল"—বলিয়া, ঔষধ-সেবন ও ঔষধপাত্র-লেহনের শেষে মুখ-খানিকে বিকৃত করিয়া তারাচাঁদ বলিলেন—"এঃ ! বেজায় তেতো—বেতর কষা ! দু'খানা সুপুরীর কুঁচো দিতে পার ?"

জাঁতী ও সুপারী লইয়া কাটিতে কাটিতে রাধারাণী বলিলেন—"মুখ বদ্‌লাবার জন্যে কিস্‌মিস্‌ ফিস্‌নিস্‌ কিছু কিনে রাখ্‌লেই ত হয় ।"

"আনা-কম-আধ্‌ট্যাকা সের—তা'র হিসেব রাখ ? তা নয়, তবে আধ্‌পয়সার ছোলা কি মটর কিনে রেখে দু'টো দু'টো ক'রে জলে দিয়ে রাখ্‌লে বরং দিনকতক চলে। দরকার নেই—সুপুরীতেই মুখ বেশ পরিষ্কার হয় ।"—বলিয়া, তারাচাঁদ সুপারী মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন—"খরচের কথা বলো কি ক'রে ? দেখ্‌তে ত পাচ্ছ—আজ প্রায় একটি বচ্ছর একরকম বিছানায় প'ড়ে রয়েছি, এমন কু-পড়্‌তা প'ড়েছে যে,একটা পয়সা ঘরে ঢুক্‌ছে না—শুধু খরচই হচ্ছে ! কলসীর জল গড়াতে গড়াতে আর কত থাকে ? যা হয় এখন উঠে হেঁটে বেড়াতে পার্‌লেও যে এক একবার দোকানটায় গিয়ে বসি—তাও পার্‌ছি না। কারবারটা আধ্‌ নষ্ট হ'য়ে যেতে বসেছে ; সব পর নিয়ে কাজ—কি যে হচ্ছে তা জানি না !"

"যা হবার তাই হচ্ছে, আর কি হবে ! উপযুক্ত ছেলে রয়েছে, তাকে ত তোমার বিশ্বাস হবে না—পর পাঁচজনে লুটে বেঁটে খায়—তোমার সেই ভাল ।"

"উপযুক্ত ছেলে থাক্‌লে কি আর ভাব্‌তুম—তা কোথা? তিন-তিন্‌টে বে' কর্‌লুম তা ছেলের মত একটা ছেলে নেই!"—বলিয়া, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তারাচাঁদ পুনরপি বলিলেন—"অম্‌রাটা থাক্‌লে মানুষের মত হ'ত—হ'য়েছেও না কি শুন্‌তে পাই, তা সে থেকেও নেই।"

রাধারাণী ভ্রূকুঞ্চন করিয়া বলিলেন—"নেই কেন—রয়েছে ত? আন গে না!"

"সে পথে যে নিজেই কাঁটা দিয়েছি; আজ এই ক'বচ্ছর হ'ল গেছে—তা একদিনও তা'র কোন খোঁজ-খবর করেছি কি?"

"কর নি কেন?—কর্‌তে কে মানা করেছেল?—কর্‌লেই অম্‌নি আপনার হ'ত আর কি! তা'র দাদা ট্যাকার কাঁড়ি খরচ ক'রে তাকে মানুষ-মুনুষ ক'রে তোমাকে ফিরিয়ে দেবে! এ ত আর গরু-বাছুর-পোষানি দেওয়া নয়!"

তারাচাঁদ কোন কথা কহিলেন না। রাধারাণী বলিলেন—"ছেলে অম্‌নি মানুষ হয় না! মাণিকের জন্যে কি খরচ করেছ যে, সে মানুষ হবে?—কখন দামী একখানা বই কিনে দাও নি, ভাল একটা ম্যাষ্টার রেখে দাও নি—যা করে গোব্‌রা—তা'তে কি আর নেখাপড়া হয়?"

"মিছে বক্‌ছ কেন?—খরচ ক'রেও ত দেখেছি! লেখাপড়া চুলোয় যাক্‌—এত বড় ছেলের হিতাহিত একটু বিবেচনাও হ'ল না! এদিকে সব জানে—টনিক্‌ ব'লে বোতল বোতল—মরুক গে তাও যা হয় করুক—নিজের আখেরটা একবার ভাব্‌লে না! ঘাড়পর্য্যন্ত টেড়ি কেটে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে—দোকানটায় গিয়ে একবার বস্‌লেও কাজ হয়, তাও পারে না? না হ'ল ও-দিক—না হ'ল এ-দিক! দিনকতক ইস্কুলে গিয়ে শিখে এল শুধু বখামি আর বাবুগিরি!"

"কবে তুমি তাকে দোকানে যেতে ব'লেছিলে সে যায় নি—কখনো বলেছ কি ?"

"বলি কখন—দেখা পেলে ত বল্‌ব ? বল্‌তেই বা হবে কেন, জানে না —দেখ্‌তে পাচ্ছে না, আমি প'ড়ে রইছি ? আর বল্‌লেই কি যাবে নাকি ?

"ব'লেই দেখ না—কেমন না যায় ! ভালমুখে বল্‌লে সে দাঁতে জুতো বইবে—বাঁকামুখের কেউ নয়—ভাল ক'রে ব'লে দেখ দেখি !"

রাত্রিতে মাণিক বাড়ীতে আসিলেই রাধারাণী তাহাকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া ঠিক করিয়া রাখিলেন। সুতরাং পরদিন তারাচাঁদ যখন বলিলেন—"কি রে হোহো টোটো ক'রে বেড়াস্ বৈ ত নয়—দোকানে গিয়ে বস্‌তে পার্‌বি ?"—মাণিক অম্লানবদনে বলিল—"পার্‌ব না বলেছি নাকি ?" সেই দিন হইতেই মাণিক প্রত্যহ যথাসময়ে স্নান-ভোজন করিয়া দোকানে যাইতে আরম্ভ করিল।

দশ পনের দিনের পর একদিন তারাচাঁদ বলিলেন—"কি রে—দোকানের কাজকর্ম্ম কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্—শিখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিস্—না শুধু যাচ্ছিস্ আর আস্‌ছিস্ ?"

মাণিক হাসিয়াই অস্থির! অনেককষ্টে হাস্যের বেগসম্বরণ করিয়া বলিল—"শেখ্‌বার আবার আছে কি ? ভারি ত কাজ—সস্তায় কেনা আর দাম চড়িয়ে বেচা ! শেখ্‌বার মধ্যে মিছেকথাগুলো হুবহু সত্যির মত কইতে পারা আর খদ্দের ঠকান—সে অনেক দিন শেখা হয়েছে। ক্ষেদো-সরকার—যার চোদ্দপুরুষের কেউ কখনো পাঠশালে যায় নি, সে পারে আর আমি পারি না ?"

তারা। পার্‌লেই ভাল ; তুই যদি মন দিয়ে কাজ করিস্ ত যদুকে রাখ্‌ব কেন ? সেই ট্যাকাক'টা তুই নিয়ে যে অনায়াসে এটা-সেটা করতে পারিস্।

মাণিক। শুধু গেলে কি হবে—দোকানে না আছে মালপত্তর, না আছে ট্যাকাকড়ি। কাজের মধ্যে ত দেখ্তে পাই—সমস্ত দিন ব'সে ব'সে শুধু হাইতোলা, মহাজনদের তাগাদা খাওয়া, আর এ-নেই—তা-নেই ব'লে খদ্দের ফেরান। কারবার দস্তুর মত চালাতে হ'লে কিছু পুঁজি বা'র করা দরকার। কবে কে দশ ট্যাকা দেবে, তাই পেলে দোবো—বল্লে কি আর মহাজন শোনে—না মহাজন চটিয়ে কমপুঁজির কারবার চলে? ট্যাকাকড়ি কিছু বা'র করো, ত কাল থেকে দোকানে যাব তা না হ'লে শুধু ব'সে ব'সে ঢুল্তে আর তাগাদা খেতে যাচ্ছি না—তাঁ'রাই যা হয় করুক গে!

"সে কি! এই যে সে-দিন দেখে এলুম, দোকানে প্রায় দু'হাজার ট্যাকার মাল মজুত রয়েছে—এর-ওর-তার কাছে পাওনাও রয়েছে প্রায় দু'তিন হাজার—কিছু নেই কি রকম? যদু কি করে—তাগাদায় বেরোয় না?"

"বেরুলে কি হবে—আমিও ত তা'র সঙ্গে ক'দিন বেরুচ্ছি; ট্যাকা কি কেউ দিতে চায়? এই দিচ্ছি—দোব—হ্যাঁ দিতে হবে বৈ কি—অমুক দিনে এসো, কবে পারব বলে দেব—এই ত? এদিকে মহাজনের লোক এসে দু'বেলা মাথায় করাত দিচ্ছে। তাদেরই বা দোষ কি? চৈত্র মাস—এখন কি আর কেউ ট্যাকা ফেলে রাখ্তে চায়? না, দোকান যদি রাখা মত হয়, ত তা'র মত ব্যাবস্থা কর—আর তুলে দাও ত সে কথা আলাদা!"

"বেশ! ঐ হ'ল গে ভাত-ভিক্ষে,—তুলে দোব? আচ্ছা—তুই রুজু খতেনখানা বগলে ক'রে আনিস্ দেখি! দেখে শুনে যা হয় একটা ব্যাবিস্থা করব এখন। নেহাৎ দরকার বুঝি, ত না হয় ঘর থেকেই এখন কিছু ব'র ক'রে দোব—পরে আদায় হ'লে তখন তুলে নোব;—বুঝ্লি?"

মাণিক সেই দিনই দোকানের খতিয়ান বই আনিয়া দিল; এবং পরঃ

দিন দোকানে যাইবার সময়ে বলিল—"কি হ'ল, কিছু দেবে টেবে, না রোজ যেমন ঘুমুতে যাই তেমনিই যাব?"

তারাচাঁদ শয্যার উপরে উঠিয়া বসিয়া, ধীরে ধীরে কোমর্ হইতে লোহার সিন্দুকের চাবিটা—সেটা বাতের মাদুলির মত সর্ব্বদাই তাঁহার কোমরে একটা মোটাসূতায় বাঁধা থাকে—খুলিতে খুলিতে বলিলেন—"দিচ্ছি আজ কিছু—নিয়ে যা! কিন্তু যোদোকে বল্‌বি—যেন খুব ঘন ঘন তাগাদা ক'রে পাওনাগুলো আদায়-উশুলের চেষ্টা করে—ফেলে রাখ্‌লে চল্‌বে কি ক'রে—ট্যাকার ব্যাজ নেই? আমার পাওনা প'ড়ে থাক্‌বে, আর আমি সিন্দুক থেকে ট্যাকা বা'র ক'রে দিয়ে মহাজনের তাগাদা মেটাব! প'ড়ে আছি দেখে সবাই মজা পেয়েছে আর কি!"—তৎপরে ধীরে ধীরে আসিয়া, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মন্দিরস্বরূপ লোহার সিন্দুকের সম্মুখে ভক্তিভরে—গললগ্নীকৃতবস্ত্রে প্রণাম করিয়া চাবিটি খুলিলেন। আলমারী-সিন্দুকের—লোহময় হইলেও কব্জায় ঝুলান—কপাট খুলিতে তাঁহার ক্লেশ হইল না বটে, কিন্তু সঞ্চিত টাকা হইতে কিছু বাহির করিয়া দিতে হইবে এই চিন্তায় তিনি বিশেষ ক্লিষ্ট হইলেন। কপাটের একটি পাল্লা—হাতটিমাত্র গলিতে পারে এইরূপ একটু ফাঁক করিয়া, ফস্ করিয়া একটা নোটের তাড়া টানিয়া বাহির করিলেন; এবং তৎ-ক্ষণাৎ কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া নোট গণিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্দুকের কপাট সেই যে একটিবারমাত্র ঈষৎ একটু ফাঁক হইয়াছিল, মাণিকের লোলুপ দৃষ্টি তাহার মধ্য দিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিয়া, থাকে থাকে স্তরে স্তরে সাজান টাকা, নোট, গিনি ও বন্ধকী-গহনার স্তূপ প্রভৃতি দেখিয়া লইয়াছিল। তারাচাঁদ যখন টিপিয়া টিপিয়া, জোড় ছাড়াইয়া—এক-খানি নোট যে আর একখানির সঙ্গে জড়াইয়া নাই সে বিষয়ে নিশ্চয় হইয়া—প্রত্যেক নোটখানিকে দুই তিনবার করিয়া গণিতেছিলেন, মাণিক

সেই সময়ে বিস্ময়স্তব্ধদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া, এত টাকা সিন্দুকে আবদ্ধ রাখিয়া তারাচাঁদ কি করিয়া এমন কাঙ্গালের চালে চলিতে পারেন, তাহাই ভাবিতেছিল ; আর বোধ হয়, যক্ষের সঞ্চয়ের মত সেই আবদ্ধ ধনরাশিকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিতেছিল—"থাক্ তোরা আর কিছুকাল এই লৌহ-কারার রুদ্ধবায়ুতে বদ্ধ হ'য়ে—অচিরেই আমি তোদের মুক্তিদান কর্‌ব !" কয়েকখানি নোট কক্ষে চাপিয়া রাখিয়া তারাচাঁদ বাকীগুলিকে পূর্ব্ববৎ ক্ষিপ্রহস্তে সিন্দুকে তুলিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিলেন ; তৎপরে বগলের নোট কয়েকখানিকে পুনর্ব্বার গণিয়া মাণিককে দিয়া বলিলেন—"বেশ ক'রে কোঁচার খুঁটে বাঁধ্—বেঁধে ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে যা !—যেন নবাবী চালে পকেটে রেখে পথে যাস্ নি ! যাকে যা দিতে ব'লে দিচ্ছি—দিগে যা !"

আজ তিনশ, কাল পাঁচশ, তারপর দুইচারি দিন বাদে আবার সাতশ —এইরূপে এক মাসের মধ্যেই প্রায় তিনহাজার টাকা মাণিকের হাতে গিয়া পড়িল। মধ্যে রাধারাণী একদিন তারাচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁগা, মাণিক দোকানের কাজকম্ম কর্‌তে পার্‌ছে ত ?" তারাচাঁদ মাণিকের কর্ম্মানুরাগ ও ব্যবসাদারী কথাবার্ত্তায় কিছু প্রীত হইয়াছিলেন ; বলিলেন—"পার্‌বে না কেন—বোকা নয় ত, দুষ্টুমি ক'রে কিছু করে না বলেই ত রাগ করি। ব্যাব্‌সাবুদ্ধি ওর বেশ আছে—দিনকতক যদি এই রকম মন দিয়ে কাজকর্ম্ম করে ত দেখ্‌বে, ও একজন পাকা ব্যাবসাদার হ'য়ে দাঁড়াবে ! তা হলেই আমি ওর একটা ভালরকম বে' দিয়ে দিতে পার্‌ব। বৌটি এলে তোমারও কাজ ক'মে যাবে, আর মাণিক সঙ্গে থাক্‌লে আমারও কাজ অনেকটা হাল্‌কা হ'য়ে পড়বে।"

তারাচাঁদের কথা শুনিয়া রাধারাণীর আনন্দের সীমা রহিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাণিকের ব্যবসায়-বুদ্ধি।

মাধাইকে তাড়াইয়া তারাচাঁদ দোকানের একজন মুটিয়াকে বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। সে সকালে ও সন্ধ্যায় বাড়ীর এবং মধ্যাহ্নে দোকানের কাজকর্ম্ম করিত। দোকানের কাজের তেমন জোর নাই বলিয়া এখন সে মাসের মধ্যে বেশী দিনই বাড়ীতে থাকে। একদিন অপরাহ্নে তারাচাঁদ তাহাকে একখানা গাড়ী ডাকিয়া আনিতে বলিলেন; এবং বাড়ীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, গাড়ী করিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেলেন।

দুই তিন দণ্ড পরেই পাড়ার লোকে জানিতে পারিল, তারাচাঁদ গাড়ী করিয়া কোথাও গিয়াছিলেন—ফিরিয়া আসিয়াছেন; কারণ, ভাড়া লইয়া গাড়োয়ানের সঙ্গে খুব একটা হাঁকাহাঁকি চলিতেছিল। ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া গাড়োয়ান, ভাড়া যাহা চুক্তি হইয়াছিল তাহারও কিছু বেশী দাবী করিতেছিল; আর গাড়ীর দরজা ভাঙ্গা, গদী ছেঁড়া—ছোবড়া বেরণো, এবং ঘোড়া রোগা, এই তিন বাবতে তারাচাঁদ ধার্য্য ভাড়ারও কিছু কম দিয়াছিলেন। হাঁকাহাঁকি ক্রমে হাতাহাতিতে দাঁড়াইবার উপক্রম হইয়াছিল; পাড়ার পাঁচজন আসিয়া পড়িয়া একটা রফা করিয়া দিল। তারাচাঁদ জেদ বজায় রাখিতে ছাড়িলেন না—উল্লিখিত তিন অজুহাতে তিন আনা পয়সার সুবিধা করিলেন। বুড়া মুসলমান গাড়োয়ানটাও খুব রোখাল, তাহার ছোক্‌রা সহিস্ আবার আরও তেরিয়া; তাহারাও একবারে অমনি ছাড়িল না—কথা শুনিতে পাওয়া যায় এমন দূরে গিয়া, তাহাদের খাঁটি স্বদেশী ও

সরস-ভাষায় তারাচাঁদের তিন পুরুষের সঙ্গে বিবিধ মধুর সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়া তিন আনার শোধ লইল।

গাড়োয়ানের সহিত বাক্-যুদ্ধে অতিমাত্র শ্রান্ত তারাচাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে গৃহে প্রবেশ করিয়াই দাওয়ার উপরে, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। রাধারাণী আসিয়া বলিলেন—"বলি—হ্যাঁগা! এ-দিকে কথা কইতে পার না—চিঁ চিঁ কর—আর মানুষের সঙ্গে গলাবাজির বেলা অসুরের বল পাও কোথা থেকে বল দেখি? ন'ড়ে বস্তে পার না—গাড়ী ক'রে বেরিয়েছেলে কোথা?"

তারাচাঁদ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"গেছনু চুলোয় আর কোথা—সাধে কি বিশ্বাস কর্‌তে চাই নি—তুমিই কেবল ধ'রে বেঁধে এই সর্ব্বনাশটি ঘটালে বই ত নয়?"

রাধারাণী অবাক্! সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ ক্রুদ্ধ স্বামীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমি ধ'রে বেঁধে কি সর্ব্বনাশ ঘটানু বল?" তারাচাঁদ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপন-মনে বকিতে লাগিলেন—"এ্যাঁ! দশ নয়, বিশ নয় যে, যাক্ আর কি হবে; দু'শ নয়, পাঁচশও নয়, পাঁচ-সাত-হাজার! একটা পয়সা আমি দাঁতে দাঁতে দি না, একটা আধ্‌লা পয়সার জন্যেও টানাটানি ক'রে মরি—এই ত এখন পাঁচ জনের সাম্‌নে তিনগণ্ডা পয়সার জন্যে নেড়ে গাড়োয়ানের গাল খেয়ে এনু—আর এতগুলো ট্যাকা বরবাদ ক'রে দিলে! হায় হায় হায়! কর্‌লে কি!"

রাধা। হ্যাঁগা—কে তোমার পাঁচ-সাত-হাজার বরবাদে দিলে খুলে বল না যে বুঝ্‌তে পারি?

তারাচাঁদ চীৎকার করিয়া বলিলেন—"বল্‌ব আর কি মাথা মুণ্ডু—ছাই ভস্ম, তোমার আলালের ঘরের দুলাল—তোমার রত্নগর্ভের মাণিক—আবার কে? সিন্দুক থেকেই ত প্রায় তিন হাজার ট্যাকা গুণে বা'র

ক'রে দিয়েছি, তার ওপর পাওনা আদায় ক'রেছে—সেও প্রায় তিন চার-হাজার হবে, তা'র একটি পয়সা কারুকে ঠেকায় নি; চাকর-বাকরদের মাইনে—দোকানভাড়াপর্য্যন্ত বাকী! সে-সব আমাকে দিতে হবে; তবে ট্যাকাগুলো নিয়ে তার গুষ্টির পিণ্ডী করলে কি?"

এই কথা লইয়া স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কলহের বেশ একপালা আরম্ভ হইল। রাধারাণীও গলা ছাড়িয়া বলিলেন—"আগে থাকতেই এত চেঁচামেচি হা-হুতোশ করছ কেন বল দেখি? কারুকে না দিয়ে থাকে, তা'র কাছেই থাকবে ত;—ট্যাকাগুলো ত আর রসগোল্লা নয় যে, সে টপ্ টপ্ ক'রে গিলে ফেলবে! আর সে ত পালিয়ে যায় নি—বাড়ীতে আসুক—জিগ্গেসাই কর আগে! ম'রতে দোকানে বা'র করবার কথা ব'লেছিনু—এমনসকল নোকের কথায় থাকাও ঝকমারি!"

সুর সপ্তমে তুলিয়া তারাচাঁদ বলিলেন—"পাঁচশ'বার ঝকমারি—থাক কেন? তুমি বলতে ব'লেছেলে ব'লেই ত আমি বললুম—এতদিন বলতে পারতুম না? আসুক না আজ বাড়ীতে—আমি এই ব'সে রইলুম। ট্যাকাকড়ি সব হিসেব ক'রে ফিরিয়ে দেয় ত দিলে—নইলে গলা টিপে আজ বাড়ী থেকে দূর ক'রে দোব—দেখি কি ক'রে বয়াটে বেটার নবাবী চলে!"

"তা দিওনা বাড়ী থেকে দূর ক'রে—দিও—দিও—দিও!—যদি না দাও ত তোমাকে অতি বড় দিব্বি রইল! তা'র সঙ্গে আমিও দূর হ'য়ে যাব। দুষ্টু হ'ক, বয়াটে হ'ক, পেটে ধ'রেছি—ফেলতে ত পারব না; তুমি তোমার সো-পক্ষের বেটাকে এনে সুখেস্বচ্ছন্দে থেকো!"

"বেশ তাই হবে তখন! তোমাদের মা-বেটার জন্যেই ত আমার যথা-সর্ব্বস্ব যেতে ব'সেছে—আবার বেটার হ'য়ে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে আস কি—লজ্জা করে না?"

"আমরা মায়ে-বেটায় তোমার হাতিশালের হাতী—ঘোঁড়াশালের ঘোঁড়া এমন কি খেয়ে ফেলেছি যে, আমাদের জন্যেই তোমার যথাসর্ব্বস্ব যেতে বসেছে? মুখে আগুন—মুখপোড়া যম যেন আমাকে ভুলে গেছে! দু'টোকে খেতে পার্‌লে—আর আমার বেলাই তোমার মন্দাগ্নি হল! আমাকেও খাও যে, তুমিও বাঁচ—আর আমারও হাড়ে বাতাস নাগে!"—বলিয়া রাধারাণী আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে সরিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পালা শেষ হইল।

দাম্পত্য-কলহে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইল—যতটা আড়ম্বর, কাজে ততটা গড়াইল না; রাত্রি নয়টা আন্দাজ সময়ে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। কিন্তু রাত্রি দশটার সময়ে মাণিক বাড়ীতে আসিলে আবার এক পালা আরম্ভ হইল। রাধারাণী মাণিককে আড়ালে ডাকিয়া চুপে চুপে বলিতেছিলেন—"হ্যাঁরে হতভাগা ছেলে! দোকানের ট্যাকা নিয়ে কি নয়-ছয় করেছিস্? সেইথেকে বাড়ীতে হাঁকাহাঁকি—হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ চলেছে; হিসেব ক'রে সব ফেলে দিগে যা! কালথেকে আর তোর দোকানে বেরিয়ে কাজ নি!"—মাণিক হাঁকিয়া উঠিল—"ওঃ ভারি ত পাঁচ সাতহাজার ট্যাকা—তা'র আবার হিসেব! হিসেব ত মুখে মুখে প'ড়ে রয়েছে—নিগ্‌ না! তা'র আবার এত হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ কিসের?"

তারাচাঁদ মাণিকের কথা শুনিতে পাইয়াই বাহির হইয়া বলিলেন—"তুমি নবাবের বেটা—নবাব! তোমার কাছে পাঁচ-সাতহাজার কিছুই নয়; কিন্তু ঐ পাঁচ-সাতহাজার জমাতে আমাকে পাঁচ-সাতবচ্ছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, না খেয়ে না প'রে, মুখে রক্ত তুলে খাট্‌তে হয়েছে! পাঁচ-কড়া কড়ি উপায় ক'রে আন দেখি! ট্যাকাকড়ি সব বুঝিয়ে দিয়ে যা—নইলে আজ অনর্থ ঘটাব বল্‌ছি!"

মাণিক হাসিতে হাসিতে তারাচাঁদের সম্মুখে আসিয়া বলিল—"ঈস্!

মেজাজটা আজ বড় গরম দেখ্‌ছি যে! কি অনর্থটা ঘটাবে—ঘটাওনা দেখি একবার!"

তারাচাঁদ মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—"ভাল চাস্ ত চালাকি রেখে ট্যাকা এনে হাজির কর্!"

মাণিক। যা বল্‌তে হয় ভালমুখে বলনা! অত চেঁচামেচি কর্‌ছ কেন? বদ্দীর বড়ি খেয়ে যে গায়ে খুব জোর হয়েছে দেখ্‌ছি!

রাধা। তাই ত, পাড়ার নোকেই বা মনে কর্‌বে কি—বাড়ীতে যেন ডাকাত প'ড়েছে! দে ত বাবা! কি ট্যাকা নিয়েছিস্ ফেলে—পৃথিবী ঠাণ্ডা হ'ক্!

মাণিক চটিয়া উঠিয়া বলিল—"ট্যাকা কি আমি কাছায় বেধে নিয়ে বেড়াচ্ছি নাকি যে, বল্‌লেই অম্‌নি ঢেলে দোব? হিসেব নিতে বল না!"

রাধা। তাই ভাল, হিসেবই নাওনা কেন—ও ত হিসেব দিতে চাইছে? বল্ ত বাবা! কিসে কি খরচ করেছিস্!

মাণিক। সব কি আর মনে থাকে—খাতা দেখ্‌লেই ত চুকে যাবে; এত তাড়াতাড়িটা প'ড়ে গেছে কিসের? চার হাজার ত এক মটোর-খাতেই গেছে!

রাধারাণী বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে পুত্রের মুখপানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"মটোর খেতে গেছে না কি বল্‌লি?"

মাণিক হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল—"মা, তুমি নেহাৎ মেয়ে-মানুষ! মটোর খেতে নয়—মোটর্ মোটর্—এই বাঙ্গলায় যাকে হাওয়া গাড়ী বলে, তাই খরিদ-খাতে—হিসেবের এ-সব বায়নাক্কা তুমি বুঝ্‌বে না।"

রাধা। তা চালের দোকানে আবার হাওয়া-গাড়ী কেন বল্ দেখি? —গরুর গাড়ী ক'রেই ত চেরকাল চাল আসে যায় দেখি!

মাণিক। তাই যদি বুঝ্‌তে পার্‌বে ত তুমি মেয়েমানুষ কেন!—ব্যাব্‌সার একটা মান-সম্ভ্রম নেই?—আমি কি সেই আট দশট্যাকা-মাইনের সরকারের মত বগলে খাতা নিয়ে, ট্যাঙ্গস্‌ ট্যাঙ্গস্‌ ক'রে হেঁটে ঘর ঘর তাগাদা ক'রে বেড়াব নাকি—না তা'তে কাজ এগোয়? একটা তাগাদায় গেলেই বস্‌—দিন কাবার! তা-ছাড়া—ঘোঁড়া-গাড়ীর খরচ খতিয়ে দেখ্‌লে এতে কত সুবিধে তা জান?

রাধা। তা সে গাড়ী একদিনও ত কৈ বাড়ীতে আনিস্‌ নি?

মাণিক হাসিয়া বলিল—"তা হলেই হয়েছে আর কি!—যে বাড়ীতে খোলার চাল মাথায় ঠেকে মানুষের টেঁড়ি ভেঙ্গে যায়—তা'তে মোটর চেপে এলে লোকে গায়ে ধূলো দেবে যে! সে গাড়ী আফিসে রেখেছি।"

রাধারাণীর বিস্ময় ক্রমেই বাড়িতেছিল। মাণিকের মুখপানে কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন—"আফিস্‌!—সে আবার কি বল্‌? চেরকাল ত দোকানই শুনে আস্‌ছি!"

মাণিক কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল—"তুমি কিছু বোঝ শোঝ না, এ সকল কথায় থাক কেন?—দোকান কি মালের গুদম যার যেথানেই থাক্‌, কল্‌কেতায় সদর-রাস্তার ওপরে একটা আফিস্‌-বাড়ী—খুব ছোট কার-বার হলেও একটা আফিস্‌-ঘরও রাখ্‌তে হয়। মালপত্তর দেওয়া-নেওয়া বা বেচা-কেনা গুদমে কিম্বা দোকানেই হয়; কিন্তু হিসেব-নিকেশ, চিঠিপত্তর, দালাল-টালালদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা—এ-সব সেই আফিসে ব'সে হয়—বুঝ্‌তে পার্‌লে?"

রাধারাণী পুত্রের ব্যবসায়-বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া, অবাক্‌ হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়াছিলেন। তারাচাঁদ স্তব্ধভাবে বসিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে ও মুখের ভাবে শুধু ক্রোধ নহে—'বেটা বলে কি গো!'—এইরূপ একটা বিস্ময়ের ভাবও প্রকাশ

পাইতেছিল। কষ্টার্জ্জিত অর্থের উক্তপ্রকার অপব্যয়ের কথা শুনিতে শুনিতে তিনি ক্রোধে অধীর ও উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন; এবং তড়িদ্বেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া—কুকুরের গলার বকলস্ ধরার মত করিয়া, মাণিকের কড়া ইস্ত্রী-করা জামার কলার ধরিয়া বলিলেন—"হারামজাদা বেটা! বুজ্‌রুকী জুড়েছ বটে? কোন কথা শুন্‌তে চাই না—তুই যেথা থেকে পারিস্, আমার ট্যাকা এনে হাজির কর্!"

তারাচাঁদের যে এতটা সাহস হইবে—একেবারে গায়ে হাত তুলিবেন, মাণিক তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই; সুতরাং সে প্রথমটা যেন থতমত খাইয়া গেল। পরে যখন মনে হইল যে, তারাচাঁদ তাহার টাট্‌কা-ভাঙ্গা জামার কলার মুঠা করিয়া ধরিয়াছেন, সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; চীৎকার করিয়া বলিল—"দেখ মা! দেখ! আমার কলারের দফা রফা ক'রে দিলে! ছেড়ে দিতে বল বল্‌ছি এখনো—নইলে মান থাক্‌বে না কিন্তু হ্যাঁ!"

রাধারাণী অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ গা! কর কি? তুমি ক্ষেপে উঠ্‌লে না কি বল দেখি? এত বড় ছেলের গায়ে হাত তুল্‌তে তোমার একটু নজ্জা কর্‌লে না? যাও—ছাড়!"—বলিয়া তাঁহার হাতটাকে ছাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, তারাচাঁদ মৃতব্যক্তির মুষ্টিগ্রহের মত করিয়া তাহা মুঠাইয়া ধরিয়াছেন। কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া—"যা জান কর তবে"—বলিয়া রাধারাণী সরিয়া দাঁড়াইলেন। তারাচাঁদ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে পর্দ্দায় পর্দ্দায় সুর চড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"যেথা থেকে পারিস্, ট্যাকা এনে হাজির কর্!"—আর মাণিকও সঙ্গে সঙ্গে সুর তুলিয়া বলিতে লাগিল—"ছেড়ে দিতে বল বল্‌ছি এখনো!" কিছুক্ষণ এইপ্রকার চলিবার পরে—"আঃ! কলারটা গেল যে—ছাড় না!"—বলিয়া মাণিক নিজেই

তারাচাঁদের হাত ছাড়াইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। তারাচাঁদ তাহাতে অধিকতর কুপিত হইলেন এবং পায়ের এক পাটী ছেঁড়া চটি খুলিয়া লইয়া,—জামার কলার ত ভাঙ্গিয়াছিলেন, এইবার সেই চটির দ্বারা পটাপট্-শব্দে মাণিকের টেড়ি ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মাণিক জুতা খাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তৎপরে—"আচ্ছা! এর শোধ নিতে পারি ত আমার নাম মাণিক—দেখো তখন! আমাকে জুতো—আচ্ছা!"—বলিয়া বৃষভের মত গর্জ্জন করিতে করিতে রঙ্গস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাঘের ঘরে ঘোগ।

মাণিক সেই উপানৎ-প্রহার-পর্ব্বাধ্যায়ের রাত্রি হইতে বাড়ীতে আসা বন্ধ করিয়াছে। রাধারাণী প্রথম প্রথম দুই চারিদিন পুত্রের জন্য দিনরাত খুব ঘ্যান্‌ঘ্যান্ প্যান্-প্যান্ আরম্ভ করিয়াছিলেন। "আমার ছেলে এনে দেবে ত দাও, নইলে আমিও যেদিকে দু'চোখ যায় চ'লে যাব!"—বলিয়া তিনি নিতাই তারাচাঁদকে ভয় দেখাইতেন। পাঁচদিন সহিয়া সহিয়া তারাচাঁদ একদিন খুব হাঁকিয়া উঠিলেন—"যাবে যাও!—তা'র আবার ডব্-ডবানি দেখাও কি? তিনটে বে' করেছি, না হয় গণ্ডা ভর্ত্তি কর্‌ব। আমি কারুকে চাই না—আমার ট্যাকা আছে।" সেইদিন হইতে রাধারাণী ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছেন। তিনি মুখে আর কিছু বলেন না, ফুকারিয়াও কাঁদেন না; অঞ্চলের নিধি, সাতরাজার ধন, সাগর-সেচা মাণিকের শোকে বুকটা যখন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয়,

তখনই কেবল এক একবার লুকাইয়া লুকাইয়া প্রাণের ভিতরে গুমরিয়া গুমরিয়া রোদন করেন।

মাণিক গৃহত্যাগ করিবার পর তিন সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। রাত্রিতে রাধারাণী ঘরের মেঝেতে স্বতন্ত্রশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা গিয়াছেন। তারাচাঁদের নিদ্রা নাই; টাকার শোক নিদ্রাকে তাঁহার নেত্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। তিনি তক্তপোষের শয্যায় পড়িয়া এ-পাশ-ও-পাশ করিতেছিলেন, আর থাকিয়া থাকিয়া ঝড়ের হুঙ্কারের মত এক একটা দীর্ঘ ও গভীর নিঃশ্বাস ছাড়িতেছিলেন। সহসা মধ্যরাত্রে কক্ষ-ভিত্তির উপরিভাগে কিসের একটা খস্‌খস্-খড়্‌মড়্-শব্দ হইল। টাকা থাকিলে মানুষের বুকে যেমন একটা ভরসা থাকে, মনে তেমনি একটা চোর-ডাকাইতের ভয়ও থাকে। যাহাদের টাকা আছে, দস্যু-তস্করের উপযান-আশঙ্কায় রাত্রিতে তাহাদের সুনিদ্রা হয় না; ঘরে ইঁদুর নড়িলে বা বাহিরে একটা কুটা পড়িলেও তাহাদের বুকের ভিতরে যেন ঢেঁকির পাড় পড়িয়া থাকে। তারাচাঁদেরও বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া পড়িতে লাগিল। একটা কুণো বেরাল মধ্যে মধ্যে ইঁদুরের সন্ধানে আসিয়া কক্ষপ্রাচীরের উপরে নানাপ্রকার উৎপাত করিত। সেইটাই বেড়াইতেছে ভাবিয়া,তিনি গলা-খাঁকারি দিয়া,তক্তপোষ চাপড়াইয়া, "হ্যা-হেট্—দূর দূর" করিয়া তাড়া দিয়া দেখিলেন,শব্দ থামিল না বা কমিল না। চোরের ভয়ে তারাচাঁদ পাকা বাঁশের একগাছা বেশ মোটা লাঠিকে তাঁহার শয্যা-সহায় করিয়াছিলেন। সেই স্থূল বংশদণ্ড বা বংশখণ্ডটাকে ঠক্ ঠক্ করিয়া বারংবার তক্তপোষে ঠুকিয়া দেখিলেন, তাহাতেও কোন ফল হইল না। মাছের হাঁড়ি খাওয়ার মত মদের হাঁড়ি খাওয়াও যদি বেরালের স্বভাব হইত, তাহা হইলেও বা তিনি মনে করিতে পারিতেন যে, কুণোটা আজ নিশ্চয়ই কোন শুঁড়ীর দোকানে ঢুকিয়াছিল—মদের

ভাঁড়ি খাইয়া বেতর মাতাল হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এ কি! আলো জ্বালিবেন বলিয়া তিনি দেশালাইটি হাতে করিয়াছেন, এমন সময়ে ঘরের মেঝেতে ধুপ্ করিয়া যেন কি একটা লাফাইয়া পড়িল; আর সেই সঙ্গেই রাধারাণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"উহু-হু-হু—গেছি-গেছি-গেছি! হাঁটুটা একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে! মাগো! এমন ক'রে মানুষের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে হয় কি গা! মেজেতে শুয়ে আছি—জান, আলোটা জ্বেলে উঠ্তে পার নি!"

তারাচাঁদ ভাবিলেন,পূর্ব্বের শব্দটা তাহা হইলে কুণো বেরালের নহে—আর এখন কোন দুষ্ট লোক ঘরের কানাচ দিয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার হাত হইতে দেশালাইটা পড়িয়া গেল, কাঠিগুলা সব মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িল। তক্তপোষ হইতে নামিয়া পড়িয়া—"কা'কে কি বল্ছ? উঠে পড় শীগ্গির—ঘরে কে ঢুকেছে"!—বলিয়া, তিনি কম্পিত-হস্তে দেশালাইটা আর একটা কাঠি হাতড়াইয়া লইয়া ফস্ করিয়া জ্বালিয়া ফেলিলেন। "এ্যাঁ! ঘরে কে ঢুকেছে কি বল?"—বলিয়া, রাধারাণী ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। ইত্যবসরে ঘরের উপর হইতে যে মেঝেতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, সে আলোকের সাহায্যে দরজার খিল্টা খস্ করিয়া খুলিয়া দিল। দরজা খোলা পাইয়াই প্রায় ছয় সাতজন লোক পিল্ পিল্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহাদের চেহারা ভীষণ—সর্ব্বাঙ্গে কালিঝুলি মাখা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ছোট ছোট ময়লা কাপড় মালকোঁচা করিয়া পরা, হাতে লাঠি, সড়কি ও তরোয়াল! চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই তাহারা আসিয়া রাধারাণী ও তারাচাঁদের বুকের নিকটে বর্যা ধরিয়া বলিল—"চুপ্! চেঁচামেচি কর ত একবারে সাবাড় ক'রে দোব! ভালমানুষের মত সিন্দুকের চাবিটি ফেলে দিয়ে চুপ্চাপ্ ব'সে থাক ত কিছু বল্বনা।"

রাধারাণী ভয়ে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। তারাচাঁদ হাত জোড় করিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যের দোহাই দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকাতদের পায়ে ধরিতেও উদ্যত হইলেন। "বিট্‌লা বামুণের ভণ্ডামি দেখ"—বলিয়া তাহারা হাসিল; এবং কথায় কিছু হইবে না বুঝিয়া, তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়া, তাঁহার কেমির হইতে চাবিকাটিটা খুলিয়া লইল। তারাচাঁদের হাত ও মুখ বদ্ধ—চোখদুইটি খোলা ছিল; নীরবে পড়িয়া থাকিয়া তিনি দেখিলেন, ডাকাতেরা তাঁহার সিন্দুক খুলিল এবং একখানা কাপড়ে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বাঁধিয়া লইয়া পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া পড়িল।

ডাকাতের দল চলিয়া গেলে রাধারাণী মুখ তুলিয়া দেখিলেন, তারাচাঁদ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন—তাঁহার দেহ নড়ন-চড়ন রহিত, নিঃশ্বাস বহিতেছে কি না তাহা বুঝা যায় না। ডাকাতেরা তাঁহাকে কাটিয়া গিয়াছে ভাবিয়া, তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার কান্নার শব্দে পাড়ার লোক কেহই উঁকি দিল না বটে, কিন্তু তাহাতে তারাচাঁদের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল।

প্রভাত হইতে না হইতেই তারাচাঁদের গৃহে বহু লোকের সমাগম হইল। রাত্রিতে যখন রাধারাণী—"ওগো তোমরা এস গো! আমার কি সব্বনাশ হ'ল—দেখ গো!"—বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন, তখন যেন পাড়ায় লোক ছিল না—কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসাও করে নাই যে, তাঁহার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! এখন কিন্তু বাড়ীতে লোক ধরে না! সেইদিনের সংবাদপত্রে—বড় বড় অক্ষরে ছাপা—'রামকৃষ্ণপুরে ভীষণ ডাকাতি' শীর্ষক যে সংবাদ বাহির হইল, তাহাতে প্রকাশ যে, 'রাত্রি বারটার সময়ে পাঁচখানা বড় বড় মোটরে করিয়া পঞ্চাশজন ডাকাত, পিস্তল ও রিভল্‌ভার লইয়া তারাচাঁদবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়। ডাকাতেরা নাকি সকলেই

বেশ পরিচ্ছন্ন ও সম্ভ্রান্তবংশীয়—"স্বদেশী" ডাকাত! তাহারা লোহার সিন্দুক হইতে গহনায় ও নগদে পাঁচ ছয়লক্ষ টাকা লইয়া গিয়াছে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

পুলিস-তদন্ত খুব জোরই চলিতেছিল। কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিস-কর্ম্মচারিগণ খবর পাইয়াই উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং "ডাকাতেরা কত জন আসিয়াছিল, তাহাদের কেমন চেহারা, কত বয়স, কিরূপ পরিচ্ছদ, কিরকম কথাবার্ত্তা, কি কি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া আসিয়াছিল, কি কি লইয়া গিয়াছে"—ইত্যাদি সহস্র জেরায়, কাটা-ঘায়ে নুণ দেওয়ার ভাবে কিছুদিন তারাচাঁদকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফলে যাহা হয়, তাহাই হইল—ডাকাতের বা লুণ্ঠিতদ্রব্যের কোন সন্ধানই হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাগরণ।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে কথিত ঘটনার পর প্রায় দুইমাস চলিয়া গিয়াছে। টাকার শোকে তারাচাঁদ সেই যে শয্যা লইয়াছেন, এখনও তাহা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বের সমস্ত রোগগুলি আবার মাথা তুলিয়াছে। সেগুলির উপরে আর একটা দুরারোগ্য ও দুশ্চিকিৎস্য অথবা চিকিৎসার অসাধ্য, নূতন রোগ উপস্থিত হইয়াছে—চিন্তার বা চিত্তের বিকার! তিনি নিদ্রাবস্থাতেও যেন জাগরিত, আবার জাগ্রদবস্থায় যেন নিদ্রিত! জাগিয়া জাগিয়াই তিনি যেন স্বপ্ন দেখেন, তাঁহার ঘরে ডাকাত পড়িয়াছে; আবার ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও যেন চিন্তা করেন, কি উপায়ে

নষ্টধনের উদ্ধার হইতে পারে—তাহার কোন উপায় আছে কি না। যাঁহারা আকস্মিক কোন গুরুতর দুর্ঘটনায় কখন পতিত না হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। সে অবস্থা কি, তাহা কথায় ঠিক প্রকাশ করা যায় না। তাহা উন্মত্ততা নহে, স্বাভাবিক অবস্থাও নহে; সুষুপ্তি বা স্বপ্ন নহে, জাগরণও নহে; অথচ এই সকলগুলিরই লক্ষণ তাহাতে সুস্পষ্ট। জীবনের সমস্ত আশা, ভরসা, আনন্দ, সুখ, উদ্যম ও উদ্দেশ্য কাড়িয়া লইলে তাহাতে যাহা থাকে, তাঁহারও জীবনে তাহাই আছে। তন্মাত্র লইয়া তাঁহার এইরূপ বাঁচিয়া থাকা—এ যেন উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া বিপথে পর্য্যটন অথবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সমুদ্রে সন্তরণ করার মত—বৃথা। ইহাতে পাইবার কিছুই নাই; আছে শুধু শ্রান্তি আর অবসাদ। তিনি চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিয়া আপনার মনে বহু-বিধ অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া থাকেন; কখন রাধারাণীকে ডাকিয়া বলেন—"দাও ত গা! সিন্দুকটা খুলে পঞ্চাশটে ট্যাকা বা'র ক'রে—অমুক ধার নিতে এসেছে!"—পরক্ষণেই বোধ হয় সমস্ত কথা আমূল তাঁহার মনে পড়িয়া যায়, তিনি শূন্য সিন্দুকের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকেন। কখন বা শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিয়া থাকেন—"পঁচিশ বচ্ছর ধ'রে মুখে রক্ত তুলে খেটে, না খেয়ে না প'রে যা করেছিনু—আমার বুকের রক্ত—আমার যথাসর্ব্বস্ব—সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে!" কখন উন্মাদের মত কট্ মট্ করিয়া শূন্যে চাহিয়া থাকেন, কখন বা স্তিমিতনেত্রে স্থিরভাবে শয্যায় পড়িয়া থাকেন। ঈশ্বরপরায়ণ, অথবা করুণাময় বিধাতার অস্তিত্বে ও নিয়ন্তৃত্বে বিশ্বাসবান্ ব্যক্তি, রোগে ও শোকে, বিপদে ও দুর্দ্দিনে তাঁহাকে ডাকিয়া যে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করে, তারাচাঁদকে তাহার অধিকারী বলিয়াও মনে হয় না। জীবনে কখন তিনি ধর্ম্মচিন্তায় মন দিতে পারেন নাই—টাকাকেই

ঈশ্বর, ধর্ম্ম, ইহকাল ও পরকাল ভাবিয়া আসিয়াছেন। যে-জীবনে ঈশ্বরনির্ভরতা নাই, সে-জীবনের দুঃখ, বিপদ ও দুর্দ্দিন কিরূপ উদ্বেগ ও অশান্তিপ্রদ, তাহা যেন কখন কাহাকেও বুঝিতে না হয়! তারাচাঁদ কিন্তু তাহাই বুঝিতেছিলেন; এবং দুর্ভর জীবনের দুর্ব্বহ ভারে দিনে দিনে অতিমাত্র শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন।

সম্পদে ও বিপদে, দুই প্রকার লোকের দেখা পাওয়া যায়। অন্যের সুখে ও আনন্দে কেহ যথার্থই সুখী ও আনন্দিত হইয়া, তাহাতে যোগদান করিতে উপস্থিত হয়; আবার কেহ বা ঈর্ষাপরতন্ত্র অথবা অসূয়াপরবশ হইয়া দেখিতে আইসে,—লোকটার সুখ-সম্পদ কত, কতদিন চলিবার মত, কতদিনে শেষ হইতে পারে। অন্যের দুঃখে ও বিপদেও তেমনি কেহ প্রকৃতই দুঃখিত ও কাতর হইয়া,সহানুভূতি দেখাইয়া সান্ত্বনা দান করিতে, অথবা সে দুঃখের যদি কোন প্রতিকার থাকে, তাহার উপদেশ করিতে উপস্থিত হয়; আবার কেহ বা পরের দুঃখে অন্তরে অন্তরে খুশী হইয়া, মুখে সহানুভূতি-প্রকাশের ছলে দেখিতে আইসে,—লোকটার বিপদ্ ও দুঃখ কত গভীর—তাহাতে পড়িয়া সে কেমন কষ্ট ভোগ করিতেছে। তারাচাঁদের সম্পন্ন প্রতিবেশী হরিশ চৌধুরী কতকটা সেই প্রকৃতির লোক। তিনি এখন প্রায়ই তারাচাঁদের দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতে আসিয়া থাকেন। মহাজনদের নিকটে তারাচাঁদের অনেক টাকা দেনা দাঁড়াইয়াছে। সেই দেনার দায়ে তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, সে-সকল কতদিনে সুবিধাদরে বিক্রয় হইবে, তাহার সন্ধানটা চৌধুরীমহাশয়ের দরকার ছিল কি?

হরিশ চৌধুরীকে পাড়ার লোক "গেজেট্" বলিয়া থাকে। নিজ গ্রামের ও ভিন্নগ্রামের যত কিছু নূতন খবর সমস্তই তিনি বলিতে পারেন। একদিন তিনি তারাচাঁদকে দেখিতে আসিয়া বলিলেন—"ওহে!

তোমার মাণিক যে শুন্‌তে পাই, ভারি কাপ্তেনি কর্‌ছে! কল্‌কেতায় মস্ত বাড়ী ভাড়া নিয়েছে! বাড়ীর দেউড়ীতে দরোয়ান, বারাণ্ডায় রঙ্গীন কাপড়ে ঘেরা সারবন্দি-ঝোলান খাঁচায় আর দাঁড়ে শ্যামা, ময়না, চন্দনা, কাকাতুয়া! বাড়ীতে পাঁচটা বেরাল, সাতটা বিলেতী কুকুর, মস্ত একখানা মোটর! আর হীরে, চুনি, পান্না আদি ক'রে বিস্তর মোসাহেবও জুটেছে —হরদম মজা ওড়াচ্ছে!—ব্যাপারখানা কি বল দেখি—এত টাকা পেলে কোথায় হে?"

তারাচাঁদ কোন কথা কহিলেন না। চৌধুরীমহাশয় পুনরপি বলিলেন—"দোকান থেকে যা ভেঙ্গেছে বা তোমার কাছ থেকে যা নিয়ে গেছে, সে আর কত—তা'তে এতদিন ধ'রে এতশত হয় কি? আমার ত ভাই, মনে হয়, তোমার ঘরে এই যে ডাকাতি—এর ভেতরে তোমার মাণিকচাঁদ আছেই আছে; তোমার ঘরের ঢেঁকিই কুমীর হ'য়ে এই কাণ্ডটা ক'রেছে! অপরে এত সন্ধানই বা কি ক'রে পাবে?—আর চারদিকে এই গিস্‌গিসে লোকের বস্তি—তা'র মাঝখানে এত ভরসাই বা তাদের কি ক'রে হবে? আমার বোধ হয়, মাণিককে পুলিসে ধরিয়ে দিতে পার্‌লে তোমার গয়নাগুলোর কতকটা কিনারা হয়—নগদ টাকাকড়ির আর কোন আশা নেই।"

তারাচাঁদ সে-কথায় কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া, আশপাশ পাঁচটা কথা কহিয়া, চৌধুরীমহাশয় সেদিন উঠিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পরে রাধারাণী আসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ গা! ও-বাড়ীর উনি যা বল্‌ছিলেন—শুন্‌লে?"

"শুনেছি"—বলিয়া তারাচাঁদ একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

রাধা। উনি যা বল্‌লেন—আমারও তাই মনে নেয়। জুতো মেরে যেদিন তাকে তাড়িয়ে দাও, সেদিন সে কি ব'লে তোমাকে শাসিয়ে

গেছ্‌ল—মনে নেই? পাঁচটা বদ্‌ ছোঁড়ার কুমতলবে তোমাকে জব্দ কর্‌বার জন্যে হয় ত সেই এ-কাজ ক'রে থাক্‌বে!—ঘটে ত তা'র বুদ্ধি শুদ্ধি কিছু নেই!

তারাচাঁদ উদাসীনভাবে—"তা হবে!"—বলিয়া আবার একটা দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রাধা। "তা হবে"—কেন—তাই নিশ্চয়। আমার বেশ মনে পড়্‌ছে, কালিজুলি-মাখা সেই মুখগুলোর মধ্যে একখানা মুখ ঠিক মাণিকের মুখের মত দেখেছিনু! তাদের অস্তর-সস্তরগুলো সব বাঁ্যাথারির না হ'য়ে যায় না; সেগুলোকে যখন মেজেতে ফ্যালে, তখন শব্দ হ'য়েছিল ঠিক সেইরকমের—আমি শুনেছি। ভয়ে যেন কেমন ভেল্কির মত নেগে গেল, আর তুমিও যেন কেমন হ'য়ে পড়্‌লে—তা না হ'লে ঠিক্‌ ধরা যেত! সে ত যা' হবার হ'য়ে গেছে, এখন আমি বলি কি—উনি রাজ্যির এত খবর রাখেন—মাণিকের ঠিকেনাটা জেনে বল্‌তে পারেন না?

তারাচাঁদ চক্ষু মুদিয়া শুনিতেছিলেন; সেই ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

রাধা। তা হ'লে একদিন একটা মেয়েনোক সঙ্গে নিয়ে, একখানা গাড়ী ক'রে গিয়ে দেখি, যদি গায়ে হাত বুলিয়ে—বাপু-বাছা ক'রে, ঘর-পোড়ার কাঠের মত কিছুও আদায় কর্‌তে পারি। ট্যাকাকড়ি না হ'ক—বন্ধকী গয়না দু'পাঁচখানাও যদি আমার গায়ের ব'লে, টেনে আন্‌তে পারি, ত দেখি না বেয়ে চেয়ে?

তারাচাঁদ কট্‌ মট্‌ করিয়া চাহিয়া, ক্রোধে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন—"সে রাস্‌কেল্‌কে আবার—বাপু-বাছা! বাপু-বাছার কর্ম্ম নয়, রাধারাণী! আমার ওঠ্‌বার শক্তি থাক্‌ত—পুলিস্‌ সঙ্গে নিয়ে গিয়ে এক-বারে পাজি বেটার গলা টিপে ধর্‌তে প্যার্‌তুম্‌, ত দেখ্‌তুম—আদায় হ'ত

কি না! ভগবান্ যে সবদিকেই মেরেছেন, তা'র কি হবে!"—বলিয়া ব্যর্থ ক্রোধের উত্তেজনায় অতিমাত্র মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদে চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করিয়া, নিশ্চলাঙ্গে উত্তানভাবে শয়ান রহিলেন। তাঁহার নিমীলিত নয়নের প্রান্তদেশ হইতে বালুকাছিদ্র-মৃৎকুম্ভের অন্তঃসলিল-ক্ষরণের ন্যায় ধীরে ধীরে অশ্রু চুয়াইয়া পড়িতে লাগিল।

চৌধুরীমহাশয় মাণিকের ঠিকানাটা সত্যই জানিতেন না, অথবা জানিয়াও পুলিস-ফ্যাসাদের আশঙ্কায় বলিয়া দিলেন না—তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু তারাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"মাণিকের ঠিকানাটা আমি ঠিক জানি না; তবে শুনছি নাকি সে আর কল্‌কেতায় নেই—কোথায় স'রে প'ড়েছে।" চোরকে চুরি করিতে শিখাইয়া দিয়া গৃহস্থকেও সতর্ক করিয়া দেয়, সংসারে এমন লোকও অনেক আছে। চৌধুরীমহাশয়ও কি তাহাই করিয়াছিলেন?

দুঃখ, বিপদ, শোক ও নৈরাশ্য মানুষকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলে। যাহাদের হৃদয় দুঃখের অয়োঘনে তাড়িত ও চূর্ণ হইয়া, দুরবস্থার গালাই-পাত্রে পড়িয়া, দুর্দ্দিন ও দুরদৃষ্টের তাপেও দ্রবীভূত হয় না—অবস্থাবিপর্য্যয়ের সঙ্গে যাহারা চরিত্রের দূষিতভাব হারাইয়া সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়া উঠে না, তাহাদিগকে বিধাতা কি ধাতুতে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা ঠিক বলা না যাইলেও, তাহারা যে সাধারণ মানুষের উপাদানে গঠিত নহে, তাহা অসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে। অবস্থার পরিবর্ত্তনে তারাচাঁদের মনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি না, তাহা হরিশ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁহার একদিন যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা হইতেই অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। দুঃখে যদি কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করে, তবে তাহার নিকটে মানুষ অকপটে হৃদয়ের কবাট উন্মুক্ত করিয়া দেয়। সুতরাং চৌধুরীমহাশয়ের মনে যাহাই থাকুক, তারাচাঁদ তাঁহার নিকটে

মনোভাব গোপন করেন নাই। সেদিনের কথাবার্ত্তা এইরূপ :—
"পাওনাদারগুলো তোমাকে বড়ই বিব্রত ক'রে তুলেছে, তারাচাঁদ!—
ব্যাটাদের জব্দ ক'রে দিতে পার?"

"আমি কি ক'রে তাদের জব্দ কর্‌ব, হরিশ্‌দা'!—তা'রা যে পাবে—
তা ত আর মিছে নয়?"

"পাবে না—কে বল্‌চে? পাবে ব'লে কি মানুষের সময়-অসময়, সুখ-অসুখ বুঝ্‌তে হবে না?—তুমি একটু সেরে উঠ্‌লেই ত আবার সব হবে; ছু'দিন চুপ ক'রে থাক্‌তে নেই? তাই বল্‌ছি—এক কাজ কর! অস্থাবর তেমন আর কি আছে—স্থাবর সম্পত্তি যা কিছু আছে সব বেনামী ক'রে ফেলে, ফতুর হ'য়ে গেছি—ব'লে, একটা দরখাস্ত রুজু ক'রে দাও! মরুক বেটারা ফ্যা ফ্যা ক'রে—যেমনকে তেমন!"

"না—হরিশ্‌-দা'! ফাঁকির মতলবে আমি আর নেই। মানুষকে ফাঁকি দেওয়া খুব সহজ; কিন্তু মানুষের ওপরে যদি কেউ থাকেন, ত তাঁকে ফাঁকি দেওয়া তত সহজ নয়! তাঁর বুদ্ধির কাছে মানুষের পাটোয়ারী বুদ্ধি টেকে কি? এখানে তা'রা আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না বটে; কিন্তু এখানের পরে যদি আর কোনখান থাকে, ত সেখানে গিয়ে আমাকে ছাড়্‌বে কি? পাওনা ট্যাকা সুদে-আসলে ভারি ক'রে, সেই ওজনে তা'রা আমার বুকের মাংস কেটে ভাগ ক'রে নেবে! ট্যাকাকড়ি থাকে না, হরিশ্‌দা'! উড়ে যায়, পুড়ে যায়, জমিয়ে রাখ্‌লেও চোরে-ডাকাতে কেড়ে নিয়ে যায়! একদিন এমন একটা সময় এসেছিল যে, মাটি-মুটো ধ'রেছি, সোণা-মুটো হ'য়েছে! ট্যাকাও কিছু ক'রেছিনু। সে-ট্যাকা আমার আজ কোথায় দাদা? কত কষ্ট ক'রে জমিয়েছিনু—তাও ত জান? ক্ষিদেতে নাড়ী জ্ব'লে গেছে, তবু একটা পয়সার মুড়ি কিনে কখন খাইনি—তিন আঙ্গুলের ডগে যেক'টা ওঠে—

ভত-ক'টা চাল মুখে দিয়ে ঢক্ ঢক্ ক'রে, টাট্‌কা-ধরা টেঁসো জল খেয়ে পেটের জ্বালা নিবারণ করেছি। দুপুর-বেলা তাগাদায় বেরিয়ে, তপ্ত পাথুরে পথে চ'লে পায়ে ফোস্কা বেঁধে উঠেছে; তবু ছিঁড়ে যাবে ব'লে চটিজুতো অব্‌ধি পায়ে দিনি! এতদিন ধ'রে—এত কষ্ট ক'রে—যা কিছু ক'রেছিনু, এক নিমেষে সব উড়ে গেল! ভিটে মাটি যা আছে—সব বেচে দেনা দোব; শেষে মহাজনদের পায়ে-হাতে ধ'রে সময় নোব। যতদিন বাঁচ্‌ব—যা কিছু উপায় কর্‌ব—একবেলা আধপেটা খাবার মত কিছু রেখে, বাকী সব দেনায় দোব। এককড়া কড়িও কারুকে ফাঁকি দোব না ভাই!"

"ভিটে বেচে আর কত হবে, তারাচাঁদ?—এই ত গলির ভেতর পাঁচকাঠা জমি—আর এই ভাঙ্গা খোলার পুরোণো ঘর, এতে আর কত হবে? তবে তোমাকে বলা রইল ভাই—যদি ছেড়েই দাও, যেন জান্‌তে পারি—অপরে ফাঁকি দিয়ে নিতে না পারে! তা'র দরকার হবে না, তুমি সেরেসুরে উঠ্‌লেই আবার সবই হবে। তা-ছাড়া—তোমার অমর বেঁচে থাক্! সে মানুষের মত হ'য়ে উঠ্‌ছে, তোমার ভাবনা কি? অমরের দাদামশায় মনে কর্‌লেও তোমার দেনা পরিষ্কার ক'রে দিতে পারেন!"

"উপার্জ্জন আর বেশী হবার আশা নেই, হরিশ্‌দা'!"—বলিয়া তারাচাঁদ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাহার পরে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"ভাল সময় মানুষের জীবনে একবার আসে; সেই সময়ে যে যা কিছু ক'রে নিতে পারে। আমার সে সময় এসে চ'লে গেছে। অমরের দাদামশায়ের কাছে আমার আর হাত পাত্‌বার জো নেই। আমি নিজের দোষেই সে পথ বন্ধ করেছি। অমরের কথা বল্‌ছ?—তা'র আশাই বা আমি কি ক'রে কর্‌তে পারি? আমি ত তা'র জন্যে কিছুই করিনি! ছেলে

ব'লে কখন তাকে একদিনও একটু আদর-যত্ন করিনি, কখন একটা ভাল কথা পর্য্যন্ত বলিনি; শত্রুর মত শুধু পীড়নই করেছি। জানি না, কে আমার চোখে কি মোহের কাজল পরিয়ে দিয়ে, তাকে আমার চক্ষুশূল ক'রে দিয়েছিল! মাসে মাসে এই হুস্‌মোন্‌টাকে ভাল ভাল জামা, কাপড়, জুতো কিনে দিয়েছি; এর ফেলে-দেওয়া, ছেঁড়া কাপড়-গুলি প'রে, খালি পায়ে আতুড় গায়ে—অনাথ ভিক্ষুকের ছেলের মত সে পড়্‌তে গেছে! এর জন্যে ইস্কুলে দুধ, জলখাবার পাঠাবার ব্যাবস্থা ক'রেছি; তা'র জন্যে ত কৈ কোন দিন একমুঠো মুড়ি কি চোঁয়া চাল-ভাজা পাঠাবার কথাও আমার মনে হয় নি? তা'র যদিও সেসব কথা মনে না থাকে, আমার মনে জ্বল্ জ্বল্ করছে; আমি কি ক'রে—কোন্ মুখে—এখন দুঃসময় হ'য়েছে বলে, তা'র কাছে বাপের দাবী নিয়ে হাজির হব?—"

তারাচাঁদকে নীরবে অশ্রুমার্জ্জন করিতে দেখিয়া চৌধুরী-মহাশয় যেন একট বিস্ময়ান্বিত হইয়াই সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপেক্ষিতার স্মৃতি।

কলিকাতার পথে বার মাসই আঠার পর্ব্ব। এখানে কে একজন মানুষ গাড়ী চাপাপড়িয়াছে। ওখানে মণ্ডলাকার জনতার মধ্যে কোনও যাদুকর ভোজবাজী দেখাইতেছে। সেখানে একটু প'ড়ো জমির উপরে খাটান তাঁবুর সম্মুখে অদ্ভুত মুখস-পরা মানুষ ইংরাজী বাজনার তালে তালে তাণ্ডবনৃত্য করিয়া অত্যদ্ভুত দৃশ্যের বিজ্ঞাপন দিতেছে। কোথাও বা ভদ্রবেশী পকেট-মারা ভিড়ের সুযোগে কাহারও পকেটে হাত গলাইবার চেষ্টায় ধরা পড়িয়া পথের লোকের অযাচিত চড়, চাপড়, ছাতি, লাথি ও কিলের শিলাবৃষ্টি নীরবে সহ্য করিতেছে। এসকলের দিকে অমর ফিরিয়া চাহে না ; কলেজের ছুটি হইলেই কাহারও সহিত না মিশিয়া, কোন দিকে না তাকাইয়া সে একবারে বাসায় চলিয়া আইসে।

বি, এ, পাশ করিয়া অমর মেডিকেল-কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। এবার সে যেন পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর অভিনিবেশ-সহকারে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়াছে ; কাহারও সঙ্গে বড় বেশী কথা-বার্ত্তা কহে না—সর্ব্বদাই বই লইয়া থাকে। পূর্ব্ব হইতেই অধ্যয়ন-কক্ষে তাহার শয়নের ব্যবস্থা ছিল ; সম্প্রতি ভোজনের ব্যবস্থাও সেই ঘরে হইয়াছে। রাত্রিতে রামকুমার সেই ঘরে খাবার

রাখিয়া যায়,অমর ইচ্ছামতসময়ে আহার করে। মঙ্গলা কিন্তু পরদিন প্রভাতে উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন করিতে আসিয়া প্রায়ই দেখিতে পায়, খাবার যেমন ঢাকা ছিল ঠিক তেমনি পড়িয়া আছে—অমর তাহাতে হাতও দেয় নাই। শয়নের বিষয়েও সেই ভাব; পালঙ্কের শয্যা অস্পৃষ্ট পড়িয়া থাকে, আর অমর একখানা মোটা বই মাথায় দিয়া পড়িবার আসনেই শয়ন করে।

সীতানাথ অমরের সঙ্গে পূর্ব্বের মতই হাস্য-পরিহাস করেন; সেও ঠিক পূর্ব্বেরই মত—তাঁহার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—তৎকৃত পরিহাস-উক্তির প্রত্যুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং সিতিকণ্ঠ প্রভৃতির মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া আসিবার পর হইতে অমরের প্রকৃতিতে যে একটা গম্ভীরভাব আসিয়া পড়িয়াছিল, সেটাকে তিনি বয়সের গাম্ভীর্য্য বলিয়াই উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার হাসিটা যে এখন আর ঠিক পূর্ব্বের মত —তেমন উজ্জ্বল, অপরিমিত, দুধের ফেণা উথলিয়া পড়ার মত—শুভ্র ও অবিরল নাই, সেটা যে এখন খুবই বিরল ও পরিমিত, আর তুষারসঙ্ঘাতে প্রতিবিম্বিত মৃদুকৌমুদীর মত অনুজ্জ্বল-শুভ্র ও ম্লানভাবে পরিণত হইয়াছে, ইহাও বয়োধর্ম্ম বলিয়া তিনি একবারে উপেক্ষা করিতে পারেন না। তবে ঘনিষ্ঠতাকেই তিনি মমতা-বন্ধনের মূলসূত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং পদ্মার প্রতি অমরের প্রণয়ভাবটা প্রগাঢ় হইবার অবসর পায় নাই বলিয়াই তাঁহার ধারণা। কিন্তু ঘনিষ্ঠতার অভাবে প্রেম দৃঢ় না হইলেও, উদ্বাহ-সম্বন্ধ-সংস্থাপনের দিন হইতেই পতিপত্নীর মধ্যে যে একটা মধুর প্রীতিভাব ঐশ্বরিক নিয়মে, অভাবনীয় উপায়ে সংঘটিত হইয়া থাকে, এই সত্যটাকেও তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না। অতএব পদ্মার অকালমৃত্যু অমরকে বিশেষ শোকাকুল করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া মনে না করিলেও, তাহা যে তাহার অন্তরে অঙ্কপাতও করে নাই, এমনটাও তিনি মনে করেন না।

"শীঘ্রই আবার অমরের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে,"—সীতানাথের অন্তরের এই কথাটা যেন নিভৃতপ্রদেশে বিকশিত পুষ্পের হৃদয়গত সৌরভের মত বাতাসে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যহ দুইবেলা বহু লোক তাঁহার সহিত দেখা করিয়া, অমরের বিবাহ দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া থাকে। তিনি কিন্তু কাহারও সঙ্গেই বাঁধাবাঁধি-রকমের কোন কথা কহেন না; "হাঁ—বিয়ে ত দিতেই হবে—তবে এই সেদিন একটা দুর্ঘটনা হ'য়ে গেছে—দশদিন যাক—তা'র মনটা বুঝি"—এইরূপ ভাসা-ভাসা কথায় সকলকেই বিমুখ করিয়া থাকেন; অথচ অমরের মন বুঝিবার জন্যও কোন দিন কোন চেষ্টা করেন না।

অমরের মন বুঝিতে চেষ্টা করিবেন কি, সীতানাথ নিজের মনটাকেই তখনও বেশ বুঝিতে পারেন নাই। পদ্মাকে তিনি একবারও দেখেন নাই বা তাহার প্রকৃতিরও কোন পরিচয় পান নাই; তথাপি অন্যের মুখে তাহার অসাধারণ রূপ ও গুণের প্রশংসা শুনিয়া, এবং তিনি যেমনটি চাহেন—যেমনটি ভালবাসেন, যত্ন না করিয়াও পদ্মাতে ঠিক তেমনটিই পাইয়াছিলেন বলিয়া, অন্য সকলের অপেক্ষা তাহার প্রতি যেন কিছু অধিক স্নেহবান্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুসংবাদে শুধু শোক নহে, তাহাকে যথোচিত আদর-যত্ন করিতে পান নাই বলিয়া তাঁহার মনে ভারি একটা ক্ষোভ, অনুতাপ ও আক্ষেপও উপস্থিত হইয়াছিল। সিতিকণ্ঠ প্রভৃতির মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া আসিয়া, ভজহরি সীতানাথকে গোটাকতক বড় কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিল। সে বলিয়াছিল—"শুনে এনু, যাদের পালাবার ঠাঁই ছেল, তারা সবাই পালিয়ে বেঁচে গেছে; বৌঠাকৃরুণের কি তেমন ঠাঁই ছেল না, কত্তাবাবু?—তাঁর ত এখানে থাকবারই কথা; আপনিই ত

কেবল তাঁকে সেখানে ফেলে রেখে বাঁচ্‌তে দিলেন না।” ভজহরি এই কথা বলিবার পূর্ব্বেই সীতানাথের মনে এই ভাবের কথা উদিত হইয়াছিল। সুতরাং ক্ষুব্ধ ভজহরির উক্ত আক্ষেপ-উক্তিগুলি যেন আত্মবিবেকের ভর্ৎসনার ন্যায় তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিয়াছিল। এখনও সেই কথাগুলি অলাত-শল্যের ন্যায় তাঁহার মর্ম্মকে বিদ্ধ, ব্যথিত ও দগ্ধ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে একটা গভীর বেদনার তরঙ্গ তুলিয়া দেয়। ব্যথিত ও সন্তপ্তচিত্তে তিনি সময়ে সময়ে চিন্তা করিয়া থাকেন,—মানুষ কি সাবধান হইয়া নিয়তির নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করিতে পারে? সাবধান হইয়া কে কবে অবশ্যম্ভাবী ঘটনার প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছে? “সাবধানের বিনাশ নাই”—একথা সত্য নহে; বিনাশ যাহার বিহিত হইয়াছে, সে সাবধান হইতেই পারে না—হইবার চেষ্টাও তাহার ব্যর্থ হইয়া থাকে! বিপদের আশঙ্কায় সতত সতর্ক থাকিয়াও মানুষ আসন্ন বিপত্তিকালেই অসতর্ক হইয়া পড়ে। নিয়তিনির্দ্ধারিত ঘটনার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে মানুষের বুদ্ধিও যেন মলিন হইয়া থাকে! সোণার হরিণ স্বভাবে সম্ভব নহে—জানিয়াও শ্রীরামচন্দ্র দুর্নিয়তির বশে রাক্ষসীমায়াপ্রসূত হৈম মৃগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।—এইপ্রকার যুক্তিতর্কে মনকে প্রবোধ দিয়া সীতানাথ যেমন একটু শান্তি লাভ করেন, অমনি শত দিক্ হইতে শত সংশয় মাথা তুলিয়া তাঁহার অচিরলব্ধ শান্তিটুকু ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত হয়। তাঁহার মনে হয়—তৈলপূর্ণ দীপ যেমন বায়ুপ্রবাহশূন্য দেশে অথবা আবরণের মধ্যে রক্ষিত না হইলে ঝটিকাদি দ্বারা নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে, মানুষও ত তেমনি সংক্রামক রোগের সান্নিধ্যপরিহারাদি সাবধানতা এবং রোগে ঔষধাদি প্রয়োগ-রূপ প্রতিকার-বিধানের অভাবে আয়ুসত্ত্বেও মরিতে পারে! ক্ষোভ ও অনুতাপ সময়ে সময়ে তাঁহার জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি ও দৈবনির্ভরতাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। তিনি উদাসমনে, সাশ্রুনয়নে

নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিয়া থাকেন—"হায়! আমার কত স্নেহের, কত সাধের, কত আদরের অমরের-বধূ, কত রূপের ও কত গুণের হ'য়েছিল, তা একবার চোখে দেখেও এলাম না!"

দৈববিশ্বাস ও তদনুকূল যুক্তির সাহায্যে পুরুষকারের অসারতা ও ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও, পদ্মাকে পিতৃগৃহে ফেলিয়া রাখিয়া তাহার তত্ত্বাবধানে যথোচিত যত্নের শৈথিল্য প্রযুক্ত তিনি যে প্রকারান্তরে তাহার অকালমৃত্যুর নিমিত্ত হইয়াছেন, এই ধারণাটাকে সীতানাথ যেন মন হইতে দূর করিতে পারেন না। তিনি চিন্তা করিয়া থাকেন,—অমর অচিরেই পদ্মার শোক ভুলিতে পারিবে—শীঘ্র না পারে কিছুকাল পরেও তাহা পারিবে, সময় তাহার শোকসন্তপ্তহৃদয়ে বিস্মৃতির শীতল প্রলেপ ঢালিয়া দিয়া চিত্তে শান্তি আনিয়া দিবে; কিন্তু পদ্মার অভাবনীয় এইপ্রকার আকালিক মৃত্যুর নিমিত্তস্বরূপ হওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে এই যে ক্ষোভ ও পরিতাপ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা কি তিনি আর জীবনে কখন ভুলিতে পারিবেন? তরুণ বয়সের শোকদুঃখ নবনিদাঘের ঝটিকাবৃষ্টিবৎ দুর্ব্বার ও অসহ্যবেগেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সে ঝটিকা-উত্থাপিত ধূলিরাশি মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে। সে বৃষ্টির বেগও খুবই প্রবল—অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাতে জলের স্রোত বহিয়া যায়; কিন্তু তাহাতে মাটির ভিতরটা বেশী আর্দ্র হয় না। প্রবৃদ্ধ প্রাবৃটের অশ্রান্ত ক্ষীণধারা-বর্ষণে কিন্তু তাহাই হইয়া থাকে। তাহাতে জলের স্রোত না বহিলেও—ধরণীর নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হইয়া উঠে। বার্দ্ধক্যের অনুদ্দাম শোকদুঃখও এই শেষবিধ। বৃষ্টিবারি অনুদ্ভিন্ন মুকুলে দাঁড়াইতে পায় না—তাহার গা বহিয়া ঝরিয়া পড়ে। শোকদুঃখও সেইরূপ তরুণ হৃদয়ে স্থায়ী হইতে পায় না। পরিণত

বয়সের মনস্তাপ কিন্তু সেরূপ নহে; সে যেন পর্য্যুষিত পুষ্পের অন্তর্দ্দল-গত বৃষ্টিবিন্দু! তাহা ফুলের হৃদয়ে জাঁকিয়া বসে, এবং তাহার দল-গুলিকে ভিজাইয়া, পচাইয়া, ফুলটিকে সঙ্গে লইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়ে!

পদ্মার শোক অমরকে কতটা আকুল করিয়াছিল, অথবা করিয়াছিল কি না, সে-কথা সে কাহারও নিকটে প্রকাশ করে নাই। বৈজ্ঞানিক 'র‍্যান্‌টগেন্' কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত 'এক্‌স্ রেজ্'এর সাহায্যে মানুষের দেহান্তর্গত পদার্থ-সকল প্রত্যক্ষ করিবার সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু মানুষের মনের ভিতরে কি ভাব লুকান আছে, তাহা দেখিবার বা বুঝিবার জন্য কোন যন্ত্র আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং কাহারও মনের কথা অসন্দিগ্ধরূপে জানিবার কোন উপায় নাই। যোগবলে নাকি তাহা জানিতে পারা যায়! সে যোগবলও এখন মানুষের অনধিগম্য। যোগাচার কোথায়—কোন্ দুরারোহ উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে বা হিমানীদুর্গম নিভৃত গিরিকন্দরে প্রচ্ছন্ন আছে, কে তাহার সংবাদ রাখে? এখন যাহার দ্বারা মানুষ কাহারও মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করিয়া থাকে,তাহার নাম—অনুমান। অনুমানে যতটুকু বুঝা যায়, তাহাতে পদ্মার শোকটা অমরের হৃদয়ে বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। তাহার পরিবর্দ্ধিত অধ্যয়নানুরাগ, নির্জ্জন-প্রিয়তা, স্বল্পভাষিতা ও গম্ভীরতা প্রভৃতিও যেন এই অনুমানের পক্ষই সমর্থন করিয়া থাকে। অনেক নিদ্রাহীন রজনী, নির্জ্জনকক্ষে নীরবে নিঃসৃত অশ্রুর নীর-সেক-চিহ্নিত উপাধানও এই অনুমানের পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতে পারে। তবে অতীত কয়েক মাস তাহার শোকসন্তপ্তহৃদয়ে কতখানি বিস্মৃতির প্রলেপ ঢালিয়া দিয়াছে, এবং তাহাতে তাহার শোকের তীব্রতা কি পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে, অনুমান তাহা বলিতে পারে না। সীতানাথ কিন্তু সময়াত্যয়ে অমরের শোক অপনীত হইবার প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শৈলেনের ঘটকালি।

মধ্যাহ্নে সীতানাথ নিজ কক্ষে শয়ন করিয়া একখানা বই খুলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে শৈলেন উপস্থিত হইল। শৈলেনও ব্যারিষ্টার হওয়ার মতলব ছাড়িয়া অমরের সঙ্গে মেডিকেল কলেজেই ভর্ত্তি হইয়াছে। সে-সময়ে তাহার আসিবার কারণ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে সীতানাথের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিল—"যা হবার তা ত হ'য়ে গেছে, তা'র পরের কথা কি বলুন দেখি, দাদামশায়!—অমরের বিয়ে দেবার কি কর্‌ছেন—ঠিক্ ঠাক্ কোথাও কিছু ক'রেছেন?"

সীতানাথ বইখানি ধীরে ধীরে রাখিয়া দিয়া একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"তা হ'লে আর তুমি জান্‌তে পার্‌তে না?"

শৈলেন একটু হাসিয়া বলিল—"গত-বারে কিছু জান্‌তে পারিনি কিনা—তাই জিগেসা কর্‌ছি।"

সীতানাথ বিষণ্ণভাবে বলিলেন—"না ঠিক্ ঠাক্ কোথাও কিছু এখনও করিনি—কর্‌বার সময় হ'য়েছে ব'লেও মনে হয়নি; তুমি যে আজ এমন হঠাৎ এ-কথাটা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলে?"

"বাবা একটি সম্বন্ধ একরকম স্থির করেছেন; তাই মা আমাকে আপনার মত জান্‌তে পাঠিয়ে দিলেন।"

সীতানাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বেশ!—মেয়েটিকে তোমার বাপ দেখেছেন?"

"মেয়েটি একবারে পরী—আর বেশ বড় সড়। শুধু বাবা কেন,

আমরা সবাই দেখেছি—অমরও দেখেছে; এই যে এই নিকটেই তাদের বাড়ী—"

"মেয়ের মা-বাপ আছেন ?"

"মা নেই, বাপ আছেন। তিনি বেশ বড়মানুষ; আর তাঁর এই একটিমাত্র মেয়ে—ছেলে টেলে নেই—খরচপত্র তিনি দস্তুরমতই কর্‌বেন। আজ তিনবছর ধ'রে বোধ হয় পাঁচশ' পাত্র দেখেছেন, একটিও তাঁর মনে ধরে নি; শেষে বাবার মুখে অমরের কথা শুনে, তাকে জামাই করবার জন্যে তাঁর ভারি ঝোঁক হয়েছে। তাঁর সঙ্গে বাবার অনেক দিনের বন্ধুত্ব।"

"তোমার বাপের সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব র'য়েছে—বল্‌ছ, লোক তিনি বোধ হচ্ছে খুব ভালই হবেন! তা বেশ, আমার অমত নেই; কিন্তু অমরের মত কি সেটা জেনেছ ?"

"সে-ভার আমার রইল;—আপনি তা হ'লে একদিন মেয়েটিকে দেখ্‌বেন চলুন!"

"তোমরা সবাই যখন দেখেছ—বল্‌ছ, তখন আবার নূতন ক'রে একদিন সেজেগুজে আমার দেখ্‌তে যাবার কি বিশেষ দরকার হচ্ছে ? সেই পাকা-দেখার দিনে তখন দেখা যাবে। অমরের যদি অমত না হয়, তা হ'লে তোমার বাপকে কথা-বার্ত্তা স্থির ক'রে ফেল্‌তে বল্‌তে পার।"

"আমরা হাজার দেখি তবু আপনার একবার দেখা দরকার। বিশেষতঃ পাত্র খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে মেয়েটি একটু বেশী বড় হয়ে প'ড়েছে—এমন কি সেই জন্যে দু'-একটা সম্বন্ধ ভেঙ্গেও গেছে।"

"তা হ'ক, অমরের চেয়ে বয়সে বড় না হ'লেই হ'ল"—বলিয়া সীতানাথ হাস্য করিলেন; তৎপরে একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন—

"কুলীনের ঘরে মেয়ে বড় হয়ে থাকা—একটা অসাধারণ কিছু নয়, শৈলেন! এঁরই না হয় পয়সা আছে; তা না হ'লে ত পয়সার অভাবেই এখন—কুলীনও নেই আর শ্রোত্রিয়ও নেই—সবারই ঘরে তাই থাক্‌ছে! সেটা আমি কিছু মন্দ বলি না; ছেলেই কি আর মেয়েই কি—একটু বড় হ'য়ে বিবাহিত হওয়াই ভাল।"

সীতানাথের সহিত এই সম্বন্ধে আরও দুইচারিটা কথা কহিয়া, শৈলেন অমরের কক্ষে উপস্থিত হইল।

অমর বসিয়া পড়িতেছিল। শৈলেন আসিয়াই বইখানাকে বন্ধ করিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। অমর মৃদু হাসিয়া বলিল—"ব্যাপার কি বল্‌দেখি—এমন দুপুরবেলাই বেরিয়ে প'ড়েছিস্ যে বড়?"

"তোর বিয়ের ঘটকালি কর্‌তে এসেছি।"

অমরের ম্লান হাসিটুকুও নিবিয়া গেল, মুখখানি গম্ভীর হইল। সে আর একখানা বই টানিয়া লইয়া খুলিতে যাইতেছিল; শৈলেন সে-খানাও কাড়িয়া লইয়া, গম্ভীরভাবে বলিল—"ঠাট্টা-তামাসার কথা নয়, অমর! যা বল্‌ছি তা মন দিয়ে শোন্! দাদামশায়ের নিতান্ত ইচ্ছে—তোকে সংসারী দেখে যাবেন। বয়েস্‌ও তাঁর ঢের হয়েছে। তিনি আর কতদিন বাঁচ্‌বার আশা কর্‌তে পারেন? পাছে তুই কথা না রাখিস্, তাই তিনি নিজে তোকে এ-সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি। মা বার-বার বলাতে বাবা তোর বিয়ের একটি সম্বন্ধ স্থির ক'রেছেন। দাদামশায়ের ভারি ইচ্ছে—এই মেয়েটির সঙ্গে তোর বিয়ে দেন। তোর ইচ্ছেটা কি, তা বেশ পরিষ্কার ক'রে বল্ দেখি?"

অমর কোন কথা কহিল না; ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিল। শৈলেন আবার বলিল—"বেশ বিবেচনা ক'রে দেখ্, বিয়ে তোকে দু'মাস হ'ক আর ছ'মাসই হ'ক পরে কর্‌তেই

হবে। এখন যদি অমত করিস্, তা হ'লে মা, বাবা, দাদামশায়—এঁরা সকলেই ভারি দুঃখিত হবেন। বাবা শুধু দুঃখ নয়—একটু অপ-মানও বোধ ক'রবেন; কারণ, তুই অমত করবি না ভেবেই তিনি এ-কথাটা একটু পাকাপাকি ক'রেই ক'য়েছেন;—তবে তোর মত না জেনে সেটা করা যে তাঁর ভাল হয় নি তা ঠিকই—"

অমর যেন একটু বিরক্ত হইয়া, শৈলেনের কথায় বাধা দিয়া বলিল—"মিছে এত বাজে বক্‌ছিস্ কেন বল্‌দেখি?"

"আমার কথার যা হয় একটা জবাব পেলেই চুপ করি"—বলিয়া শৈলেন নীরব হইল। অমর গম্ভীরভাবে বলিল—"তুই ভারি নির্ব্বোধ, শৈলেন! দাদামশায়ের ইচ্ছের কথা যখন ব'লেছিস্, তখন আর তোর এত কথা বল্‌বার কোন দরকারই ছিল না।"

শৈলেন সহর্ষভাবে বলিল—"তবে তাঁকে বল্‌তে পারি যে, তোর মত আছে?"

"সেকথা তুই আমাকে জিগেসা না ক'রেও তাঁকে বল্‌তে পার্‌তিস্; দাদামশায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মতামত ব'লে একটা কিছু দাঁড়াতে পারে না।"

কৃতকার্য্যতার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হাসিতে হাসিতে—"কা'র সঙ্গে তা জানিস্?—সেকথা তবু এখনও তোকে বলিনি!"—বলিয়া, শৈলেন অমরের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

অমর সেকথা শুনিবার জন্য বিন্দুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করিল না; কৌতূহলেরও কোন লক্ষণ তাহার মুখের ভাবে প্রকাশ পাইল না। সে বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শৈলেন হাসিতে হাসিতে বলিল—"বল্‌ব তবে কা'র সঙ্গে? সেই!—রূপ দেখে যার ফুলবাগানে

—মনের কূল হারিয়ে ফেলেছিলি!—বুঝ্‌তে পেরেছিস্ ত?—পছন্দ নয়—সেকথা বল্‌বার জোটি নেই!"

অমর বিষণ্ণমুখে বলিল—"কর্ত্তব্যের পালনে পছন্দ-অপছন্দের কি আছে, শৈলেন?"—বলিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

ভবিতব্যের লীলা প্রকৃতই অদ্ভুত! অমরের সঙ্গে বিবাহ হইবে বলিয়াই-যেন এতদিন প্রভাবতীর বিবাহ হয় নাই! বড়মানুষের কত সুন্দর, সচ্চরিত্র, অকৃতদার, এম্ এ, বি এল্—পাশ করা ছেলে মনোরঞ্জন-বাবুর মনোমত হয় নাই, কিন্তু অমরকে তাঁহার পছন্দ হইল। আর সীতা-নাথেরও একপ্রকার দৃঢ় সঙ্কল্পই ছিল যে, তিনি বড়লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিবেন না—আপনার সমান ঘরেই অমরের বিবাহ দিবেন; তাঁহার সে সঙ্কল্পও কার্য্যে পরিণত হইল না। শুভদিনের শুভলগ্নে মনোরঞ্জনবাবুর কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গেই অমরের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল।

অমরের বিবাহটা এবারে প্রথমবারের মত নিতান্তই ভজহরি-কথিত "কাগে-বগে টের না পাওয়া'র মত হইল না। সীতানাথের আত্মীয়স্বজন যে যেখানে ছিল, সকলে আসিয়া তাঁহার কলিকাতার বাসাবাড়ী গুল্‌জার করিয়া তুলিল। তাঁহার পল্লীনিবাস হইতে গোবর্দ্ধন ও মাধাই প্রভৃতিও উপস্থিত হইল। এ আনন্দপর্ব্বে যোগদান করিতে পারিল না কেবল ভজহরি; সে ইহার দুইমাসমাত্র পূর্ব্বে, "দুঃখত্রয়া-ভিঘাত"এর উপরে মৎস্য-মাংসের মহার্ঘতাপূর্ণ এবং কাঁকড়া, পিয়াঁজ ও হংসাণ্ড প্রভৃতি পবিত্র স্বাদুভক্ষ্যের প্রতি বিদ্বেষপরতন্ত্র এই পাপ সংসার ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়া, তুলসীর কণ্ঠী ও শিখামাত্র মানুষকে যে পুণ্য-ধামের অধিকারী করিতে পারে, সেই স্থানে চলিয়া গিয়াছে। আর তারাচাঁদ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া সীতানাথ তাঁহাদিগকে দেখিতে পান নাই; শুনিয়া আসিয়াছেন যে, দেনার জ্বালায়

বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া, তারাচাঁদ সস্ত্রীক দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন ও পুরাতন।

সীতানাথ ঠেকিয়া শিখিয়াছেন। এবার তিনি আর অমরের অধ্যয়ন-শেষের প্রতীক্ষায় নবোঢ়াকে একাদিক্রমে তাহার পিত্রালয়ে ফেলিয়া রাখেন না,দুই চারিদিনের জন্য হইলেও মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তাহাকে বাসাবাড়ীতেই লইয়া আসেন।

বিবাহের পর বৎসর চলিয়া গেল। প্রভা তিন চারিবার আসা-যাওয়া করিল। তাহার পরে গৌরীঠাকুরাণী একদিন সীতানাথকে বলিলেন—"এ কি রকম, সীতেনাথ! নাত্‌বউএর যে কিছুতেই মন ওঠে না—কিছুই মনে ধরে না! সবেতেই খালি নাক তোলে—নাকটা টিকল হ'লে না জানি আরও কি কর্‌ত!" মঙ্গলাও বলিয়া থাকে —"ঢের ঢের বড়মানুষের মেয়ে দেখেছি—এমনটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নেই! এ কি গা! এত বড় মাগী কাপড়খানা আল্‌না থেকে টেনে নিয়ে পর্‌বে—তা পারে না! তাও হাতে হাতে এগিয়ে দিতে হবে? খেয়ে উঠে আঁচা-বেন—তাও একজন হাতে জল ঢেলে দেবে, খাইয়ে দিলেই যেন ভাল হয়! ছি! শুধুই কটা চামড়াখানা—কোন গুণ নেই! থাক্‌বার ভেতর আছে শুধু দেমাকটুকু—গরবে যেন মাটিতে পা পড়ে না!"

প্রভার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে সীতানাথ অসন্তুষ্ট হন—বলিতে আসিলে তাহাতে কাণ দেন না; সকল কথাই—"ছেলেমানুষ" —বলিয়া, হাসিয়া উড়াইয়া দেন। মঙ্গলার তাহা গায়ে সহে না। সে সীতা-

নাথের মুখের উপরেই বলিয়া থাকে—"কিসের ছেলেমানুষ গা ? বে'র বয়েসে বে' হ'লে তিন চারছেলের মা হ'ত—কচি খুকী !" সীতানাথও ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, পদ্মার মৃত্যুতে যাহা হারাইয়াছেন, তাহা প্রভার দ্বারা পূর্ণ হইবার নহে। প্রভা সত্য সত্যই মঙ্গলা যাহা বলিয়া থাকে—"পিতলের কাটারি,"—কাজে কিছুই নহে—"উপরহী ঝক মক শাম !"

অমর যদি ভালবাসিয়া থাকে, তাহা হইলে আর সকলে যাহাই বলুক তাহাতে প্রভার কিছুই ক্ষতি নাই। কিন্তু অমর কি তাহাকে ভালবাসিয়াছে ? না বাসিবার কোন কারণ নাই। এক অন্তরায়, পদ্মার স্মৃতি। বহু দিন হইল, পদ্মা তাহার জনকজননীর সহিত কাল-স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে ! তাহাদের উপরে বিস্মৃতির যেন একটা যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে—তাহাদের নাম পর্য্যন্ত আর কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না ! সকলেই যাহা ভুলিয়া গিয়াছে, অমর কি আজিও তাহা ভুলিতে পারে নাই ? অমরের স্মৃতি হইতে একবারে বিলুপ্ত না হইলেও পদ্মার কথা যে পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। ছোট ছেলেরা যেমন নূতন একটা খেলনা পাইলেই পুরাণটাকে ফেলিয়া দেয়, মানুষের মনও সেইরূপ নূতন একটা কিছু পাইলেই পুরাতনটা ভুলিয়া যায়। নূতনের একটা আকর্ষণও আছে। সুন্দরেরও একটা আকর্ষণ আছে। নূতনটা যদি আবার সুন্দর হয়, তবে তাহার আকর্ষণ দ্বিগুণ হইয়া থাকে। প্রভা শুধু নূতন নহে—সুন্দরী।

প্রভা সুন্দরী। পদ্মাও অসুন্দরী ছিল না। উভয়ের মধ্যে কাহার রূপ অধিক, বিশেষ করিয়া তাহা বলা হয় নাই। পূর্ব্বে সামান্য রকমে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রভাকেই অধিক সুন্দরী বুঝাইবার কথা। প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়ের মধ্যে অধিক সুন্দরী কে, অথবা অমর কাহাকে

অধিক রূপবতী মনে করিয়া থাকে, তাহা ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। সৌন্দর্য্যের সর্ব্বজনানুমত কোন লক্ষণ আছে বলিয়া মনে হয় না। মানুষের রুচি অনেক পরিমাণে সৌন্দর্য্যের জ্ঞানে সহায়তা করে। শুধু ব্যক্তিভেদে নহে, দেশভেদেও মানুষের রুচি ভিন্ন হইয়া থাকে। দেশভেদে সৌন্দর্য্যের আদর্শও বিভিন্ন। চীনদেশে ভাঁটার মত গোল গোল আর কুঁচ্‌এর মত ছোট ছোট চোখ, এবং পা'দুইখানি ছাগলের ক্ষুরের মত না হইলে নাকি রমণীরা সুন্দরী বলিয়া বিবেচিত হন না! অন্যান্য দেশে কিন্তু গোল চোখের আদর নাই। সুন্দরীদের চোখ গোল বাধাইবার জড় হইলেও মন ভুলাইবার জন্য আকারে মোটেই গোল হইবে না, বেশ টানা টানা, ফালা ফালা, পটল চেরার মত—আকর্ণবিশ্রান্ত হওয়া চাই। আফ্রিকায় সুন্দরীদের গায়ের চামড়া পাথুরে কয়লার মত চক্‌চকে কাল, নাক থেব্‌ড়া, আর ঠোঁট-দুইখানি—বর্ণে নহে গঠনে—তেলাকুচার মত পুরু পুরু হওয়া দরকার। বিলাতী বিবিদের মধ্যে যাঁহার চোখ বিড়ালের মত যত কটা কটা, আর গলা সারসের মত যতই সরু ও লম্বা হইবে, তিনি নাকি ততই বেশী সুন্দরী! আমাদের দেশেও গলার সৌন্দর্য্যবর্ণনায় 'মরাল-গ্রীবা' উপমেয় হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহার লম্বাইএর পরিমাণ বোধ হয় দেড় হাত নহে? আমরা কম্বুগ্রীবাই বেশী পছন্দ করি—আমাদের বৈষ্ণব-কবিরাও বোধ হয় তাহাই করিতেন—"কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে" ইত্যাদিই তাহার প্রমাণ। কোনও দেশে আবার নাকি সুন্দর দেখাইবে বলিয়া ছেলেবেলা হইতেই বাড় বাঁধিয়া মাথাটাকে চেপ্‌টা করিয়া তুলিতে হয়, কোনও দেশে আবার নাকটাকে কচিবেলাতেই থেঁত করিয়া থেব্‌ড়া করিতে হয়! আমাদের দেশেও উন্নতনাসিকা রমণী-সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ-বিধায়ক বলিয়া

বিবেচিত হয় না। বিচক্ষণা মহিলারা স্ত্রীলোকের টিকল নাকটা আদৌ পছন্দ করেন না; তাঁহাদের মতে—"নাক মাঠা-মাঠা চোখ ভাসা, তবে জানবে মুখ খাসা।" এ-ত গেল গঠনের কথা; ইহার উপরে আবার রংএর ব্যাপার আছে। গ্রীণ্‌ল্যাণ্ডের সুন্দরীরা নাকি মুখখানিকে নীল ও হরিদ্রারাগে রঞ্জিত করিয়া থাকেন! জাপানী মহিলারা, সুন্দর দেখাইবে বলিয়া দাঁতগুলিকে গিল্টি করাইয়া থাকেন! আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে আবার দাঁতগুলিকে রং দিয়া রক্তবর্ণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। গুজ্‌রাটী মহিলারা নাকি কৃষ্ণবর্ণে দন্তের স্বাভাবিক শুভ্রতাকে ঢাকিয়া না দিলে লোকের কাছে দাঁত বাহির করিতে পারেন না! আমরা কিন্তু দশনরাজির মৌক্তিক শুভ্রলাবণ্যেরই পক্ষপাতী। আমাদের দেশেও পূর্ব্বে স্বভাবলব্ধ কুন্দেন্দু-তুষারশুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তিকে মিশির সাহায্যে আতা-বিচির মত কাল করার অত্যাচারটা বিদ্যমান ছিল; যে কারণেই হউক এখন সেটা একটু কম পড়িয়াছে। এ-সব ত গেল জাতি বা দেশগত রুচির কথা। ব্যক্তিগত রুচিতেও অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন রকমের রূপ আদৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ চাহেন বর্ণের গৌরতা,—মুখ-চোখ-নাক যেমনই হউক, চামড়াখানা ধপ্‌ধপে হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। তাঁহাদের কথা —"সব দোষ হরে গোরা"। কেহ কেহ আবার গড়ন পিটন, মুখ-চোখ ভাল হইলে, বর্ণটা গৌর বা শ্যাম যাহাই হউক, তাহা লইয়া মারামারি করেন না। অতএব রুচি অনুসারে কেহ বলিবেন, প্রভাই অধিক সুন্দরী; আবার কেহ বা পদ্মাকেই অধিক রূপবতী বলিবেন। ফলতঃ প্রভা ও পদ্মা দুই জনেই সুন্দরী; তবে দুইজনের সৌন্দর্য্যটা একই রকমের নহে। প্রভার মুখচোখ ও গঠন পদ্মার মত নিখুঁত নহে, আর পদ্মার রংটাও প্রভার মত স্ফুট বা উজ্জ্বল গৌর ছিল না—উজ্জ্বলশ্যাম ও গৌরের মাঝামাঝিই ছিল।

প্রভার রূপের একটা দীপ্তি আছে ; সেটা বিদ্যুতের প্রভার মত অত্যুজ্জ্বল —নয়নপ্রদাহী। পদ্মার রূপেরও একটা চটক ছিল ; সেটা কৌমুদীর মত মৃদু—নেত্রস্নিগ্ধকর। প্রভার রূপে যেন একটা উন্মাদনী শক্তি আছে। পদ্মার রূপে তাহা ছিল না—তাহার রূপ মনকে মত্ত না করিয়া মুগ্ধ করিবার মত ছিল। অমর কিরকমের রূপ ভালবাসে, সে কাহার রূপের অধিক পক্ষপাতী—প্রভার অথবা পদ্মার, তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করে নাই। শৈলেন তাহা জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহলী। তাহার ঘটকালিতে যে বিবাহ ঘটিয়াছে, তাহার ফলে অমর সুখী হইল কি না, তাহা জানিবার আগ্রহটা তাহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সে আজ দুই বৎসর ধরিয়া অমরের মনের কথা জানিবার চেষ্টা করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

মনের গতি বিচিত্র। এক সময়ে কেহ সাধিলেও যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় না, সময়ান্তরে আবার তাহাই সাধিয়া বলিবার জন্য একটা আগ্রহ উপস্থিত হয়। অমরের মনের সেইরূপ অবস্থায় একদিন শৈলেন তাহাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল। সেই প্রসঙ্গে দুই জনের যে দীর্ঘ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"তুই কি বল্‌তে চাস্, অমর! সে প্রভার চেয়েও বেশী সুন্দরী ছিল ?"

"সেকথা কি ক'রে বল্‌ব, শৈলেন ?—লোকে হয় ত প্রভাকেই অধিক সুন্দরী বল্‌বে। পদ্মা যে খুব একটা ডাকের সুন্দরী ছিল, তা নয়। তবে তা'র মুখ-চোখের গড়নে আর চাহনির ভাবে এমন একটা সৌন্দর্য্য আর মাধুর্য্য ছিল, যা পৃথিবীর ব'লে আমার মনে হয় না। মুখ-চোখ-নাক-রং আর গড়ন-পিটন যার ভাল, লোকে তাকেই সুন্দর বলে; কিন্তু আমার ধারণা, সে সকল ভাল না হ'লেও মানুষ সুন্দর হ'তে পারে।

আমার মনে হয়, যা'র হৃদয় সুন্দর, সেই যথার্থ সুন্দর। মানুষের বাহ্ আকারে তাহার অন্তরের বা প্রকৃতির একটা প্রতিবিম্ব পড়ে। প্রকৃতির ভালমন্দ অনুসারে কুৎসিত চেহারাও মনোহর হয়, আবার সুন্দরকেও কুৎসিত দেখায়। প্রকৃতি যা'র সুন্দর নয়, ছবির মত চেহারা হ'লেও আমি তাকে সুন্দর বলি না। প্রভার অন্তরটা ভাল নয়; তা'র রূপ আমার চোখে যেন চিত্রিত সৌন্দর্য্যের মত প্রাণহীন—অসার! পদ্মার সঙ্গে যেদিন আমার দৃষ্টির মিলন ঘটে, সেদিন—বেশ মনে পড়ে— আমার প্রাণের ভিতরে যেন বসন্তের বাতাস বয়েছিল! এখনও তা'র সেই মুখ-খানি—সেই লজ্জামাখা দু'টি চোখ মনে হ'লে যেন কোথা থেকে পদ্ম-সরোবরের উপর দিয়ে প্রভাতের মৃদু সমীরহিল্লোল বয়ে এসে আমার হৃদয়ে একটা স্নিগ্ধতা ঢেলে দেয়! প্রথম দেখাতেই মনে হয়েছিল, যেন তা'র সঙ্গে আমার কত কালের—কত যুগ-যুগান্তরের ভালবাসাবাসি! প্রভার সঙ্গে এতদিন বাস ক'রেও ত তা মনে হয় না! পদ্মা যে সুন্দরী ছিল, সেটা যেন সে মোটেই জান্‌ত না। প্রভার সে জ্ঞানটা যেন বড় বেশী—আর তাতেই যেন সে বড়ই গর্ব্বান্বিতা। শুভদৃষ্টির সময়ে পদ্মার চোখ-দু'টি নিমেষের তরে একটিবার চেয়ে যেন কত কথাই বলেছিল—যেন আরও কত কথা বল্‌বার ইচ্ছে ছিল—লজ্জাতে আর তাড়াতাড়িতে সব ব'লে উঠ্‌তে পারেনি। তবু যতটুকু যা বলেছিল, আর তা'র অর্থ আমি যতটুকু যা বুঝেছিলাম, তার মর্ম্ম এই যে—আমি তোমার যোগ্য নই—তুমি কি দয়া ক'রে আমাকে তোমার জীবনের সঙ্গিনী করবে? আর শুভদৃষ্টির ক্ষণে প্রভার তীব্র দৃষ্টি যেন বলেছিল—"হরি হরি! এত খুঁজে খুঁজে শেষে এই হ'ল!"

"কল্পনার দৌড়টা দেখ্‌ছি তোর বেজায়, অমর! পদ্মাকে যখন দেখিনি, তখন একথা নিয়ে আর বেশী কিছু বল্‌তে চাই না; তবে যেমনই থাক্,

সে যখন নেই—তা'কে আর পাবার আশা পর্য্যন্ত নেই—তখন আর তা'র কথা মনে জাগিয়ে রেখে লাভ কি ? এখন যে উপস্থিত হয়েছে, তা'কে নিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করাটাই ভাল নয় কি ?"

"চেষ্টা ক'রে যদি সুখী হওয়া যেত, তা হ'লে না হয় তাই কর্‌তাম, শৈলেন ! কিন্তু তা ত হবার নয়, ভাই ! সুখের আশা এ-জীবনে আর নেই ; সে আশা পদ্মার সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। এখন কোনরকমে দিন কাটান। তবে তোরা ধ'রে বেঁধে বিয়েটা দিয়েছিস্, আর দাদামশায়েরও বড় ইচ্ছে, কাজেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাকে প্রণয়ী স্বামীর অভিনয়টা করতেই হবে—মনের ভাব চেপে রেখেও মুখে বল্‌তে হবে—"ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ !"

"আচ্ছা—বেঁচে থাকি ত দেখ্‌ব তখন—"দেহি পদপল্লবমুদারম্" পর্য্যন্ত গড়ায় কি না ! না, হাসি-তামাসার কথা নয়, অমর ! যে চ'লে গেছে তা'র কথা আর কেন ?—ভুলে যাবার চেষ্টা কর্ ! সে ত ছেলে-খেলার মত—স্বপ্নের মত হয়েছিল ; সেই মত ভেঙ্গেও গেছে ! সুখের হ'লেও যে স্বপ্ন অনেকদিন পূর্ব্বে ভেঙ্গে গেছে, তা'র স্মৃতি নিয়ে জীবন-টাকে আর কেন যে বৃথা বিষাদময় ক'রে রেখেছিস্, তা বুঝ্‌তে পারি না !"

"তা'কে মনের বা'র ক'রে দেওয়া যে একবারেই অসম্ভব, শৈলেন ! মানুষের মন স্মৃতিছাড়া থাক্‌তে পারে কি ? তা'র স্মৃতি আমার মনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত হ'য়ে গেছে যে,মন থেকে আর তা ছাড়ান যায় না। যতদিন জীবন থাক্‌বে, মন থাক্‌বে, মনে পূর্ব্বানুভূত-বিষয়ের স্মৃতি ও চিন্তার শক্তি থাক্‌বে, ততদিন তা'কে ভুল্‌তে পারব না। তুই বিশ্বাস কর্‌বি কি না—জানি না, আমি তা'কে একটু ভালবেসেছিলাম। তা'র সম্বন্ধে আগা-গোড়া সমস্ত ঘটনাই একটা স্বপ্নের মত বটে, তবে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে

যায়নি। এ-জীবনে তা'র কোন সার্থকতা না থাকতে পারে, কিন্তু এ-জীবন ক'দিনের জন্যে, শৈলেন? জীবনের পরে মৃত্যু আছে। মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়—মানুষের সমস্ত আশার, আকাঙ্ক্ষার ও ভালবাসার নির্ব্বিকল্প সমাধি নয়; মৃত্যু আর একটা নূতন জীবনের আরম্ভ। এ-জীবনের শেষে যে নূতন জীবন আসছে, সে-জীবনেও কি এই স্বপ্নের সার্থকতা বা সফলতা খুঁজে নেবার অবসর পাব না? সেকথা যাক্—তুই স্বপ্ন বল্‌তে মনে পড়ে গেল;—সেদিন আমি পদ্মাকে স্বপ্নে দেখেছি। যৌবন তা'র অবয়বে যেন একটা পূর্ণতা এনে দিয়েছে! অবয়বের পূর্ণতার সঙ্গে তা'র রূপও যেন শতগুণ বেড়ে গেছে! আমি দেখে তাকে প্রথমটা চিন্‌তেই পারিনি। সে এসে হেসে হেসে আমার কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলছে—"ছ'দিন না দেখেই একেবারে ভুলে গেছ? চিন্‌তেই পারলে না আমাকে? এই তোমাদের ভালবাসা? আমরা কিন্তু হাজার বচ্ছর না দেখ্‌লেও মনের মানুষ চিনে নিতে পারি। তুমি ত খোঁজও কর নি, দেখ—তবু আমি খুঁজে খুঁজে এসে তোমার কাছে হাজির হয়েছি।"—তাকে ধর্‌ব মনে ক'রে যেমন আমি উঠ্‌তে যাব, অমনি ঘুমটা ভেঙ্গে গেল! এত দিনের পর এ স্বপ্নটা এভাবে কেন দেখ্‌লাম বল্‌তে পারিস্?"

"কি ক'রে বল্‌ব—স্বপ্নবিজ্ঞানের আমি কিছু বুঝিশুঝি না, ভাই! আর তোর মত দিনরাত কাল্‌তো ভাবনা ভেবে ভেবে আমার মাথাও এমন গরম হয়ে ওঠে নি যে, ভেবেচিন্তেও এর কোনরকম একটা অর্থ ঘটাবার চেষ্টা কর্‌ব। বরাবর সবারই মুখে শুনে আস্‌ছি যে, স্বপ্ন ঘুমের ঘোরে অবসন্ন মনের অলীক কল্পনামাত্র;—জাগরণের চিন্তাই নিদ্রায় স্বপ্ন হয়ে দাড়ায়। স্বপ্নের আগা নেই, গোড়া নেই, আর কোন মানেও নেই। তাই লোক স্বপ্নের সঙ্গে যত অসম্ভব আর অসম্বদ্ধ

ভাবনার তুলনা দেয়। দেখ্‌তেও পাই, স্বপ্নের কিছুই ফলে না; ভোজবাজির মত তা'র সবই ভুয়ো! কতবার স্বপ্নে কত টাকা পেয়েছি—দশটা গাঁট দিয়ে কাপড়ে বেঁধে রেখেছি; জেগে দেখেছি, টাকাও নেই—গাঁটও নেই! কতবার যেন অনেকদূর শূন্য থেকে মাটিতে প'ড়ে গেছি; কিন্তু কখন হাত-পা'ও ভাঙ্গেনি, আর গায়ে ব্যাথাও লাগেনি! গল্পের মত স্বপ্নেরও গরু গাছে ওঠে—কুমীর ওড়ে। স্বপ্ন কল্পনার জগা-খিচুড়ি।"

"না শৈলেন! স্বপ্ন সবই নিদ্রাশিথিল চিত্তের অলীক বা অমূলক কল্পনা নয়। স্বপ্ন কখন অদৃষ্ট, অজ্ঞাত ও অননুভূত অথবা বিস্মৃত, ভূতপূর্ব্ব বিষয়ের চিত্রশালা, কখন পরোক্ষে বর্ত্তমান ঘটনাপুঞ্জের প্রতিবিম্ব, কখন অবশ্যম্ভাবী অনাগত ঘটনার অগ্রদূত। স্বপ্ন অনেক সময়ে অনেক অদেখা, অজানা, অভাবা বিষয়কে অভাবনীয় উপায়ে নিদ্রিতের অনুভূতিগোচর করে। স্বপ্নরহস্য অজ্ঞেয় হ'লেও স্বপ্নের ব্যাপারটাকে একেবারেই অমূলক ব'লে মনে হয় না। আমার বোধ হয়, ঘুমন্ত অবস্থায় সময়ে সময়ে মানুষের দেহগত স্থূল আর সূক্ষ্মের সংযোগের মধ্যেই এমন একটা বিশ্লেষ ঘটে, যা'তে, জড়ের সংসর্গবশতঃ চিন্ময় আত্মার যে একটা আত্মবিস্মৃতি বা মোহ আছে, সেটা সেই সময়ের জন্যে একবার ভেঙ্গে যায়। তখন চর্ম্মচক্ষু নিমীলিত; কিন্তু যোগবলে মানুষ যে জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করে—শুনা যায়, ভিতরে সেইরূপ কিছু একটা দৃষ্টি উন্মীলিত হয়। দেশ ও কালের দূরত্ব, আবরণ বা ব্যবধান প্রভৃতি কিছুই সে দৃষ্টির প্রতিবন্ধক হয় না। অতীত, অনাগত ও পরোক্ষ-বর্ত্তমানের অনেক ব্যাপার—যা একদিন হ'য়ে গেছে, অচিরেই যা ঘট্‌বে, দূরে বা নিকটে কোথাও যা হচ্ছে—সে সব প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু সেই যে সংযোগ বা বিশ্লেষ, যার ফলে এই সকল ঘটে—সেটা বেশীক্ষণ থাকে না, শীঘ্রই

ভেঙ্গে যায়। তখন সেই কতক দেখা আর কতক অ-দেখা, অসম্পূর্ণ-রূপে অনুভূত বিষয়গুলো মিশিয়ে গিয়ে, তুই যে খিচুড়ির কথা বল্‌ছিস্ তাই হয়ে দাঁড়ায়। আমার বিশ্বাস যে, আমাকে বড় কাতর দেখে পদ্মা স্বপ্নে আমাকে আশ্বাস দিতে এসেছিল। সে যে আমাকে ভুলে যায় নি, আমি দেখ্‌তে না পেলেও, বা দেখ্‌তে পেয়েও বায়ুস্বরূপ সূক্ষ্ম-মূর্ত্তিতে তা'কে চিন্‌তে না পার্‌লেও, সে যে আমার কাছে কাছেই রয়েছে, শীঘ্রই যে আবার আমি তা'র সঙ্গে মিলিত হব, সেই কথাটা আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেল!"

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সীতানাথের পল্লী-নিবাস।

বর্দ্ধমান জেলার একখানি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে সীতানাথের নিবাস। সেখানে তাহার পৈতৃক বাটী ও ভূমিসম্পত্তি ছোটখাট একটা জমীদারের মত। তিনমহলা কোঠাবাড়ীর সদর-মহলে পূজার দালান, আটচালা, ভিয়ান ঘর ও বৈঠকখানা; অন্দরে চকমিলন কক্ষশ্রেণীর মধ্যে সমচতুষ্কোণ বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। অতিরিক্ত একটা মহলে সারি সারি গোয়াল-ঘর, ধানের মরাই আর খড়ের পালুই। সদরে ও অন্দরে মৎস্যপূর্ণ তিন চারিটি পুষ্করিণী। বাড়ীর দক্ষিণাংশে সদরপুষ্করিণীর উভয়পার্শ্বেই আম, জাম, কাঁটাল ও নারিকেল প্রভৃতির বাগান। শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপিত দেবদারু, ঝাউ ও শিশু প্রভৃতি উচ্চবৃক্ষের উন্নতশির উদ্যানের বহিঃসীমা সূচিত করিয়া থাকে। মাঠে শালিজমীর পরিমাণও অল্প নহে।

সদরে স্বতন্ত্র একটি দেবালয় আছে। তাহার সম্মুখে শাদা পাথরে বাধান একটি তুলসীমঞ্চ। দেবগৃহের তিনদিকে অশোক, চম্পক, কদম্ব, কাঞ্চন, বকুল ও পলাশ প্রভৃতি বড় বড় ফুলগাছ। পুষ্পভারাবনত, প্রচুর পল্লববিশিষ্ট এইসকল ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষরাজি, স্থাপত্য-নৈপুণ্যপূর্ণ দেবায়তনকে নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন করিয়া, তাহার নির্জ্জনতা, পবিত্রতা ও রমণীয়তা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। দেবালয়ের অভ্যন্তরে শ্বেত প্রস্তরের সিংহাসন; তাহার উপরে পাষাণগঠিত গরুড়ের পৃষ্ঠে প্রস্তরময় শ্বেত পদ্মাসনে

সন্নিবিষ্ট, কনককুণ্ডলবান্, রত্নকিরীট ও মুক্তাহার-ভূষিত, মর্ম্মরময়বপু, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু-বিগ্রহ।

মানুষ সকল বিষয়ে সমান ভাগ্যবান্ হয় না। বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ ও ধনসম্পত্তি সব দিয়াও বিধাতা একটা বিষয়ে সীতানাথের বড় অভাব রাখিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র নাই—সংসারে আপনার জনও তেমন কেহ ছিল না। পিতৃমাতৃবিয়োগের অনতিদীর্ঘকাল পরেই একটি-মাত্র শিশুকন্যাকে লইয়া তিনি বিপত্নীক হইয়াছিলেন। প্রথম-যৌবনেই গৃহশূন্য হইয়াও তিনি আর দ্বিতীয়-দার-সংগ্রহের ইচ্ছা করেন নাই। পত্নীর বিয়োগে শুধু মন নহে—তাঁহার গৃহও বড়ই শূন্য হইয়া পড়িল, বিষয়সম্পত্তি বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। প্রবল একটা বৈরাগ্য আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। জনৈক প্রতিবেশীর উপরে শিশুকন্যার পালনের ভার অর্পণ করিয়া তিনি দেশ-ভ্রমণে বাহির হইলেন, এবং বহুদিন ধরিয়া বহুদেশ ও বহুতর তীর্থ পরি-ভ্রমণ করিলেন। তীর্থপর্য্যটন হৃদয়ে শান্তি বিতরণ করিতে পারিল না —শ্রান্তি ও অবসাদ আনিয়া দিল। নৈষ্কর্ম্মই অশান্তির মূল বুঝিয়া তিনি কোনপ্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন। দূর বিদেশে সর... একটা কণ্ট্রাক্ট-কাজের যোগাড় হইল। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, কাজের নেশায় ও দায়িত্বের চিন্তায় সেই দিনরাত মন-হুহু-করার ভাবটা অনেকপরিমাণে কমিয়া গেল। গৃহ যাহার আকর্ষণশূন্য, বিদেশ তাহার নিকটে বর্জ্জনীয় বলিয়া বোধ হয় না। তিনি সেই কর্ম্ম লইয়া বিদেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কন্যাটির জন্য মনটা বড় চঞ্চল হইলে কখন দুই তিনদিনের জন্য একবার দেশে আসিতেন। কন্যাটি ক্রমে বিবাহের বয়স প্রাপ্ত হইল। যাঁহাদের উপরে তাহার পালনের ভার অর্পিত ছিল, তাঁহারাই তাহার

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। সীতানাথ সংবাদ পাইয়া প্রয়োজনীয় খরচপত্রের জন্য টাকা পাঠাইয়া দিলেন, এবং কন্যাকে সম্প্রদান করিবার জন্য বিবাহের পূর্ব্বদিনে মাত্র দেশে আসিলেন। বলা বাহুল্য যে, তারাচাঁদকে কন্যার বরভাবে উপস্থিত দেখিয়া সীতানাথ সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তখন আর পরের নির্ব্বাচনে দোষারোপ করা বৃথা! বিধি-নির্ব্বন্ধ অপরিহার্য্য বুঝিয়া তিনি ক্ষুব্ধ মনকে প্রবোধিত করিলেন। কন্যাকে তাহার স্বামিগৃহে পাঠাইয়া, তিনি আবার বিদেশে ফিরিয়া গেলেন। সংসার-বন্ধন আপনা হইতেই ছিন্ন হইয়াছিল; কিন্তু মমতা-বন্ধন হইতে তিনি হৃদয়কে মুক্ত করিতে পারেন নাই। দূর বিদেশ হইতেও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তারাচাঁদের গৃহে আসিতে হইত।

বহুদিন বিদেশে অতিবাহিত করিয়া সীতানাথ বৃদ্ধবয়সে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। পুরাতন গৃহ দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত থাকিলে তাহার যে দুর্দ্দশা ঘটে, তাঁহার গৃহেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। ঝটিকাসমানীত ধূলা ও আবর্জ্জনাস্তূপ ছাদের জলনির্গমের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। নিকাশের পথ না পাইয়া, বৃষ্টির জল ছাদ ভেদ করিয়া ঘরের ভিতরে চুয়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। গৃহভিত্তিতে বৃক্ষলতা জন্মিয়া গাঁথনির বাঁধন শিথিল করিয়া দিয়াছিল। গৃহ স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। উদ্যান অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। গৃহসন্নিহিত বনরাজি অগ্রসর হইয়া পুরোপকণ্ঠজাত জঙ্গলের সহিত মিলিত হইয়াছিল। পুকুরগুলিও সব মজিয়া গিয়াছিল।

দেশে ফিরিয়াই সীতানাথ গৃহাদির জীর্ণসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘর-বাড়ী মেরামত করাইয়া, যেখানে তাঁহার যত দূর-আত্মীয় ছিল, তাহাদের সন্ধান করিতে লাগিলেন; এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা বড়ই দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় তাহাদিগকে আনিয়া নিজের শূন্য গৃহ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি পুরাতনের অনেক পরি-

বর্ত্তন করিলেন, ভিতরবাড়ীর ঘর কমাইয়া দিয়া সদরের ঘর অনেক বাড়াইয়া তুলিলেন। সদর পুষ্করিণীটিকে বড় একটি দীঘির মত করিয়া কাটাইয়া তাহাতে নূতন একটি ঘাট বাঁধাইলেন। বাড়ী হইতে দীঘির ঘাটে যাইবার পথের দুইপার্শ্বে নানাজাতীয় ফুলের বাগান করিলেন। দীর্ঘিকাখননে উত্থিত যাবতীয় মৃত্তিকা দীঘির দক্ষিণ তীরে স্তূপাকারে রক্ষিত হইয়া যেন একটি মাটির পাহাড়ে পরিণত হইয়াছিল। সীতানাথ তাহাতে নানান্ জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করাইয়া তাহার সমতল-শিখর-দেশের মধ্যস্থানে তরুরাজিবেষ্টিত একখানি সুন্দর কুটির নির্ম্মাণ করাইলেন। কুটিরের সম্মুখে ঘন-দূর্ব্বাদলাবৃত ছায়াময় চত্বর। তাহার উপরে বসিয়া সম্মুখের দিগন্ত-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। কুটিরের ভিতরে একধারে একখানি সঙ্কীর্ণ তক্তপোষ—তাহাতে কম্বলময় একটি সামান্য শয্যা। অন্যদিকে ছোট ছোট দুইটি আলমারী—তাহাতে স্তরে স্তরে সাজান প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যাবতীয় উৎকৃষ্ট কাব্য, দর্শন, ইতিহাস ও জীবন-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ। কুটিরখানি দীঘির ঘাট হইতে দেখা যায় না। নিম্নের সমতলভূমি হইতে একটি সঙ্কীর্ণ পথ ঘন তৃণরাজির মধ্য দিয়া সরীসৃপগতিতে পাহাড়ের উপরে উঠিয়াছে, এইমাত্র লক্ষ্য হইয়া থাকে।

সীতানাথ যেসময়ে এইসকল পুরাতনের সংস্কার এবং নূতনের সৃষ্টি লইয়া বিব্রত, সেই সময়ে মাধাইদাস আসিয়া তাঁহাকে অমরের দুর্দ্দশার সংবাদ জানাইয়া গিয়াছিল। দারান্তর-পরিগ্রহ করিয়া যে পিতা প্রথম-পক্ষের সন্তানের প্রতি বীতস্নেহ হইয়াছে, তাহার নিকট হইতে সেই সন্তানের উদ্ধারসাধন যে দুষ্কর হইবে না, সীতানাথ তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেই ভাবিয়াই তিনি অগ্রেই কলিকাতায় একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়া সেখানিকে স্বচ্ছন্দবাসের উপযোগী করিয়া, তৎপরে অমরকে আনিবার জন্য রামকৃষ্ণপুরে গমন করেন।

অমরকে কলিকাতায় রাখিয়া, সীতানাথ মধ্যে মধ্যে দেশে আসিয়া তাঁহার সঙ্কল্পিত ও আরব্ধ কার্য্যসকল সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু-বিগ্রহের সেবার ভাল বন্দোবস্ত ছিল না; তিনি তাহা করিলেন—মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ভোগের ব্যবস্থা করিলেন। গৃহের সকলেই প্রসাদভোজী। গ্রামেরও অনেক লোক আসিয়া প্রত্যহ প্রসাদ ভোজন করিয়া থাকে। এ-সকল ছাড়া মধ্যাহ্নে যাহারা উপস্থিত হইবে, তাহারা কেহ যাহাতে অভুক্ত ফিরিয়া না যায়, তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিলেন। আরও কতকগুলি কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে-কথা স্থানান্তরে কথিত হইবে।

সীতানাথের প্রকাণ্ড গৃহ তাঁহার আত্মীয়বর্গে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পুরুষ-আত্মীয়েরা প্রায় সকলেই স্থবির—তাঁহাদের মধ্যে আবার দুই তিনজন অন্ধ ও খঞ্জও ছিলেন। পুরুষেরা সকলেই বহির্বাটীতে অবস্থান করেন। অন্তঃপুরবাসিনী সকলেই পতিপুত্রবিহীনা; কেবল একটিমাত্র অল্পবয়স্কা সধবা ছিল, তাহার নাম—মায়াবতী। বালক বালিকাও অনেকগুলি; তাহাদের কাহারও মাতাপিতা নাই। গোবর্দ্ধন ও মাধাইকে আনিয়া সীতানাথ, তাঁহার এই পল্লীগৃহে রাখিয়া গিয়াছেন।

এই বৃহৎ সংসারের তত্ত্বাবধানের ভার সম্প্রতি দুইজনের উপরে ন্যস্ত আছে। অন্তঃপুরসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ভার মায়াবতীর উপরে; আর বাহিরের সমস্ত কার্য্যের ভার গোবর্দ্ধনের উপরে। মাধাই ও আরও তিন চারিজন লোক এই বিষয়ে গোবর্দ্ধনের সহকারী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুগল আগন্তুক।

সীতানাথ প্রথমে অমরকে তারাচাঁদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা জানিতে দেন নাই। অমর একদিন খবরের কাগজে—"সুরামত্ত যুবকের ছুরিকাঘাতে বারযুবতীর জীবনসংশয়"-শীর্ষক সংবাদে মাণিকের নাম দেখিয়া, সীতানাথকে তাহা দেখাইলে, সেইদিন তিনি তাহার নিকটে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তারাচাঁদের দুরবস্থার কথা শুনিয়া সীতানাথ যে নিশ্চিন্ত ছিলেন না—তাঁহার অবসর-কাল যে তারাচাঁদের অনুসন্ধানেই অতিবাহিত হইয়া থাকে, অমর তাহা জানিত না। পক্ষান্তরে তারাচাঁদের দুর্দ্দশার কথা শুনিবার পর হইতেই যে অমরের মনে একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, সীতানাথও তাহা জানিতেন না। অমরকে একদিন বিষণ্ণমুখে অশ্রু-ভারাক্রান্তনেত্রে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাকে আজ এমন বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন, অমর? চোখদু'টি ছল্‌ছল্‌ কর্‌ছে! কেন ভাই—কোন অসুখ বিসুখ করে নি ত?"

"মনটার বেশ সুখ নেই, দাদামশায়! বাবার জন্যে মন বড়ই আকুল হয়ে উঠেছে।"

সীতানাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমাদের বাপ্‌বেটার ভাব কিছু বুঝ্‌তে পারি নে ভাই! এগারো বারো বছর হ'তে গেল তুমি বাপকে ছেড়ে আমার কাছে এসেছ; এই ক'বছরের মধ্যে একদিনও ত সে কাক-মুখেও তোমার খবর নেয়নি! তা'র জন্যে তোমারও মন কেমন করেছে ব'লে কখন বুঝ্‌তে পারিনি। এতদিনের পর আজ তোমার পিতৃভক্তি এমন উথ্‌লে উঠ্‌ল কেন বল দেখি?"

"আমার জন্যে বাবার মন কেমন কর্‌তে না পারে, দাদামশায়! তাঁর মাণিক ছিল। আমারও মন সত্যই এতদিন তাঁর জন্যে এমন চঞ্চল হয়নি। যতদিন জান্‌তাম, তাঁর যথেষ্ট টাকাকড়ি আছে—তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন, ততদিন তাঁর খোঁজখবর না করায় আমি পিতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটি কর্‌ছি বলে মনে হয়নি। এখন কিন্তু তাই মনে হচ্ছে। আপনি যদি কিছু না মনে করেন, ত একবার আমি তাঁর সন্ধান ক'রে দেখি। তিনি কোথায়, কি ভাবে, কতদুঃখে দিন কাটাচ্ছেন, তা না জেনে আপনার আশ্রয়ের এইসব সুখভোগ যেন আমার বিষবৎ বোধ হচ্ছে; পড়াশুনাও আর ভাল লাগ্‌ছে না, দাদামশায়! জীবনটাই যেন বৃথা ব'লে মনে হচ্ছে।"—বলিতে বলিতেই অমরের চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

সীতানাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"অমর! তোমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে যে টাকা খরচ করেছি, আজ বুঝ্‌লেম, আমার সেগুলি বৃথা নষ্ট হয়নি। পিতার আচরণ যেমনই হ'ক, পুত্রের নিকটে তিনি স্বর্গ, ধর্ম্ম, তপঃ, এবং সর্ব্বদেবতার শ্রেষ্ঠ। যে পুত্র পিতার দুঃখে উদাসীন, সে মনুষ্যকুলের কলঙ্ক—জনসমাজের হেয়; যে তা'কে লালন পালন করেছে, তা'র চরিত্রেও একটা কলঙ্কের ছাপ পড়ে। তারা-চাঁদের সন্ধানে তোমাকে যেতে হবে কেন? আমি সেবিষয়ে নিশ্চেষ্ট আছি—মনে ক'রো না! এতদিন যে তা'র কোন সন্ধান কর্‌তে পারি নি—তা'র কারণ, আমার চেষ্টার শৈথিল্য নয়। মানুষ উন্নত অবস্থা থেকে নেমে পড়্‌লে আপনার অস্তিত্বটাকে ঢেকে রাখ্‌বারই চেষ্টা করে—আত্মীয়-স্বজনের সান্নিধ্য পরিহার করে, এমন কি পরিচিত লোককে পর্য্যন্ত মুখ দেখাতে চায় না। আমি হয় ত কোন দিন খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে তা'র কাছে গিয়ে প'ড়েছি, কিন্তু আমি তা'কে দেখ্‌তে পাবার আগেই হয় ত

সে আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে লুকিয়ে প'ড়েছে। যাই হ'ক, শীঘ্রই আমি তা'র সন্ধান কর্‌ব। তুমি যেমন পড়াশুনা কর্‌ছ ক'রে যাও!"

সেই দিন হইতে সীতানাথ অন্য সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া দৃঢ়নির্ব্বন্ধ-সহকারে তারাচাঁদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।

* * * * *

তারাচাঁদ দূরে কোথাও গমন করেন নাই, কলিকাতার সন্নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। স্থাবর ও অস্থাবর যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়াও তিনি সকল পাওনাদারের দাবী চুকাইতে পারেন নাই; বিক্রয়লব্ধ অর্থে কতকগুলি খুচরা দেনা পরিষ্কার করিয়া, একজন বড় মহাজনের নিকটে দাসখত লিখিয়া দিয়াছিলেন, এবং সস্ত্রীক তাহার গৃহে দাসত্ব স্বীকার করিয়া অতি দুঃখে জীবন যাপন করিতেছিলেন। রাধারাণী পাচিকার কার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন, আর তারাচাঁদ কর্ম্মচারীর দলভুক্ত হইয়াছিলেন। চুক্তি হইয়াছিল যে, সমস্ত দেনা যতদিন শোধ না হইবে, ততদিন তাঁহাদিগকে সেইভাবেই থাকিতে হইবে। উভয়ের খাওয়া-পরার খরচ বাদে মাহিনার হিসাবে যাহা পাওনা হইবে, তাহাই দেনায় কাটান্ পড়িবে। এইরূপে কতদিনে তাঁহার দেনা পরিশোধ হইত—এ-জীবনে হইত কি না, তাহা বলা যায় না। সীতানাথ অনুসন্ধান করিয়া, তারাচাঁদের দেয় টাকা সমস্ত চুকাইয়া দিয়া তাঁহাকে ও রাধারাণীকে প্রথমে কলিকাতার বাসাবাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। এখন আবার তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমেই তিনি উভয়কে তাঁহার পল্লীগৃহে লইয়া আসিলেন।

তারাচাঁদের আগমনে সীতানাথের আত্মীয়গণের মধ্যে ভারি একটা আন্দোলনের—কাণাকাণি, ফিস্‌ফিসানি ও গুজ্‌গুজানির, হুলস্থূল পড়িয়া

গেল ;—"এরা আবার কা'রা এল হে! সস্ত্রীক!—কর্ত্তার দান-সাগরে দম্পতিবরণ হ'তে এল নাকি?"—"লোকটার কি দুশ্‌মন চেহারা—যেন হোঁদলকুৎকুৎ!"—"সত্যি, এমন বিট্‌কেল বিদ্‌কুটে বিতিকিচ্ছি চেহারা বড় একখানা দেখা যায় না! আপাদ-মস্তক শুধু পেট!"—"ভোগের অর্দ্ধেকটি ত তা হ'লে এই তিলভাণ্ডেশ্বরের গহ্বরেই যাবে! মাগীটা কিরকম—ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী না মন্দোদরী কেউ দেখেছ?" এইরূপ সংশয় ও বিদ্বেষমূলক সমালোচনাই বহুল। তবে তাঁহাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ দুই প্রকৃতিরই লোক ছিলেন। "যে আসে আসুক না! ভোগের চাল বাড়াতে হয়—যিনি এনেছেন, তিনি তা'র ব্যাবস্থা করবেন, তোমাদের মাথাব্যাথা কেন?"—"তাই ত, তোমরা আগে এসে ব'সেছ ব'লে, সে গাছতলায় আর কারুকে এসে বস্‌তে নেই?"—এমন কথাও কেহ কেহ বলিলেন। যাঁহারা তারাচাঁদের আকৃতির প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাঁহারা আপনাদের অসমীক্ষ্যকারিতার জন্য কিছু শঙ্কিত হইলেন এবং ভবিষ্যতের জন্যও বিশেষ সাবধান হইয়া গেলেন।

গোবর্দ্ধন ও মাধাইএর উপরে তারাচাঁদের স্বচ্ছন্দবিধানের ভার অর্পণ করিয়া, সীতানাথ রাধারাণীকে সঙ্গে লইয়া অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিনীরা কর্ম্মহীন নিদাঘ-অপরাহ্নের দীর্ঘতা অপনয়ন করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারে ব্যাপৃতা ছিলেন। কোথাও তাস ও 'দশপঁচিশ'-খেলা চলিতেছিল—কেহ কেহ তাহাই দেখিতেছিলেন। কোথাও কোন প্রাচীনা বসিয়া,—কোথায় কোন্ চাল্‌তাগাছে ভূত আছে, কোন্ চাঁপাগাছে ব্রহ্মদৈত্য ফুল তুলিতে আসেন, কোন্ গভীর জলাশয়ে চড়ক-গাছ 'জীবদান' অর্থাৎ জীবনী-শক্তি পাইয়া সন্তরণকারীর পা ধরিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিয়া থাকে, এবং কোন নির্জ্জন জলাশয়-

তীরে যক্ষের টাকাভরা জালা চলিয়া বেড়ায়—সেই সকল লোমহর্ষণ, অলৌকিক বিষয়ের গল্প করিতেছিলেন ; আর তাঁহার শ্রোত্রীবর্গ বিস্ময়ে ও ভয়ে কাষ্ঠবৎ হইয়া তাহা শুনিতেছিলেন। কোথাও বা কোন বিদুষী কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন। যাঁহারা শুনিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছিলেন, আর যাঁহারা জাগিয়াছিলেন, তাঁহারাও—প্রকৃতি অনুসারে ভক্তি, বিস্ময় ও বিষাদে বিভোর হইয়া, কেহ রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি,কেহ ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম, কেহ সীতার দুঃখ ও বিপদ, কেহ জটায়ুর মহাপ্রাণতা এবং হনুমানের শক্তির কথা ভাবিয়া নিদ্রার আবেশে ঢুলিতেছিলেন ; কেহ বা—দশগ্রীব দশটা মুণ্ড লইয়া কি করিয়া নিদ্রা যাইতেন—সেই চিন্তায় আকুল হইয়াছিলেন। এমন সময়ে সীতানাথ আসিয়া ডাকিলেন—"মায়া !"

সীতানাথের কথা শেষ হইতে না হইতেই, নিকটের কক্ষ হইতে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা একটি সুন্দরী যুবতী বাহির হইল এবং অরবিন্দ-সুন্দর আস্যে মৃদু ও মধুর হাস্য করিয়া,—"কখন্ এসেছেন, দাদামশায় ?—এবারে যে এত"—বলিয়া আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, রাধারাণীর পানে চাহিয়াই নীরব হইল। এই যুবতীই পূর্ব্বকথিতা মায়াবতী।

মায়াবতীর বয়স আঠার উনিশের বেশী হইবে না। বয়সে পুরবাসিনী-সকলের ছোট হইলেও বুদ্ধি-বিবেচনা ও কর্ম্মনৈপুণ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া এই বৃহৎ সংসারের গৃহিণীপনার ভার তাহারই উপরে ন্যস্ত ছিল। সুতরাং তাহার অন্যান্য পুরাঙ্গনাগণের ক্রীড়া-কৌতুকাদিতে যোগদান করিবার অবসর ছিল না। সে গাছকোমর বাঁধিয়া ভাণ্ডারে জিনিষপত্র সব গুছাইতেছিল—ডাল,মসলা প্রভৃতি কুলায় ঝাড়াইয়া-পাছ্ড়াইয়া, বাছাইয়া রাখাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। সীতানাথের আহ্বান শুনিতে পাইয়াই শশব্যস্তে কটিদেশবদ্ধ অঞ্চল মুক্ত করিয়া, অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া আসিয়া তাঁহাকে

প্রণাম করিল। পুরবাসিনীগণও স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং নবাগতা রাধারাণীর পানে কৌতূহলাবিষ্টদৃষ্টিতে চাহিয়া, দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

সীতানাথ উপস্থিত সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া মায়াবতীকে বলিলেন—"দেখ, মায়া! এটি আমার মেয়ে—আমার অমরের মা; বাপের বাড়ী বেড়াতে এসেছে—দেখো যেন এর কোনরকম কষ্ট বা অসুবিধে না হয়!"

মায়া চকিতে একবার রাধারাণীর পানে চাহিয়া, প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল; এবং সীতানাথের কথার উত্তরে কোন কথা না কহিয়াই ত্বরিতপদে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। নিমেষের মধ্যেই সে একটা জলপূর্ণ ঘটী লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং জলটুকু রাধারাণীর পায়ে ঢালিয়া দিয়া নিজের আঁচলে তাঁহার পা'দুইখানি মুছাইতে মুছাইতে সহাস্যমুখে বলিল—"আমরা এইবার বাঁচ্‌লুম, মা! আমাদের আর কোন কিছু ভাব্‌তে চেন্তাতে হবে না।"—বলিয়াই সে পুনর্ব্বার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল।

রাধারাণী দেখিলেন, মেয়েটি শুধু সুন্দরী নহে—তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন লক্ষ্মী মাখান—কথাগুলিও যেন মধুমাখা! তিনি তাহার পরিচয় জানিবার ইচ্ছায় সীতানাথের মুখপানে চাহিলেন।

সীতানাথ রাধারাণীর অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন—"এটি আমার এক আত্মীয়ের মেয়ে। মেয়েটি রূপেগুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, কিন্তু ওর ভাগ্যটা বড় ভাল নয়! মা-বাপ নেই, স্বামী—থাকা না থাকায় সমান—খোঁজ খবর নেয় না ব'লে ওর মাসী আমার কাছে এনে রেখে গেছে।"

মায়া একখানা আসন আনিয়া, রাধারাণীর নিকটে পাতিয়া দিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিল। সীতানাথ বাহিরে চলিয়া গেলেন।

রাধারাণী যে একটা নূতন দেশে, অজানা বাড়ীতে, অচেনা লোকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, মায়ার আদর-অভ্যর্থনায় ও কথা-বার্ত্তায় অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহা ভুলিয়া গেলেন।

গোবর্দ্ধন ও মাধাইকে দেখিয়া তারাচাঁদ কিন্তু বড়ই অস্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। তাহারা তাঁহার পূর্ব্বকৃত আচরণ মনে রাখিয়াছে কি না, তাহাদের কথাবার্ত্তায় বা ব্যবহারে তিনি সেরূপ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। যাহা হউক, ক্রমশঃ তিনি কতকটা স্বচ্ছন্দ লাভ করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে কেমন একটা সঙ্কোচের ভাব জাগিয়া রহিল।

কর্ম্মহীন জীবনের একঘেয়েভাবে তারাচাঁদ দিনে দিনে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। একদিন তিনি সীতানাথকে একান্তে পাইয়া বলিলেন—"দেখুন, কাজকর্ম্ম কিছু না ক'রে এই রকম ব'সে ব'সে খাওয়া আর ঘুমোনা—এ আমায় ভাল লাগ্‌ছে না; আমাকে একটা কোন-রকম কাজকর্ম্মের যোগাড় ক'রে দিন!"

সীতানাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু ও মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন—"যোগাড় ক'রে দিতে হবে কেন, তারাচাঁদ! কাজ ত বিস্তর রয়েছে—তুমি একটা কিছুর ভার নিলেই পার!"

"আপনি যে কাজের ভার নিতে বল্‌ছেন, সেকাজ আমি ভাল বুঝি শুঝি না; আমি পয়সা উপায়ের পথ চিনি, ট্যাকা জমাতে জানি;—খরচের কাজে পটু নই।"

"তুমি কি করতে চাও—বল!"

"আমার জন্যে ত আপনি অনেকগুলি ট্যাকা"—বলিয়া তারাচাঁদ যাহা বলিতে যাইতেছিলেন, সীতানাথ তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন—"সেকথা কেন আর মনে কর, তারা! তুমি ত আমার পর নও! মধ্যে দিন-

কতক যে তোমার কোন খোঁজ-খবর রাখিনি, তা'র কারণ—বল্‌তে আর দোষ কি আছে—অমরকে পাঠিয়ে দিয়ে তা'র আর কোন্ খবর না নেওয়ায় তোমার উপরে আমার একটু রাগ হয়েছিল বাপু! দরকার না থাক্‌লেও ছেলের খোঁজ নেওয়াটা বাপের কর্ত্তব্য ত? কর্ত্তব্যের পালনে যে অবহেলা করে, আমি তা'কে ভালবাস্‌তে পারি না। পরের ত্রুটি ও দোষ যেমন সহজে উপেক্ষা বা মার্জ্জনা করা যায়, আপনার বা আপনার জনের বিষয়ে তা পারা যায় কি?"

"পর ভাবেন—তা বল্‌ছি না; আমি বল্‌ছি, আপনি আমার জন্যে অনর্থক যে ট্যাকা—"

এবারেও সীতানাথ তারাচাঁদের কথায় বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"অনর্থক বল্‌ছ কেন—টাকা না পেলে কি মহাজন তোমাকে ছেড়ে দিত?"

"তা দিত না বটে; কিন্তু সেই ট্যাকাগুলো থাক্‌লে অনেক ভাল কাজে—অনেক অনাথ-গরিবের সাহায্যে খরচ হ'তে পার্‌ত!"

সীতানাথ একটু হাসিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"অনাথ বা দরিদ্রের সাহায্য করাই কি শুধু ভাল কাজ তারাচাঁদ, আর বিপন্ন আত্মীয়ের সাহায্য করাটা মানুষের কাজের মধ্যেই নয়? সংসারে দুঃখ অনন্ত—অভাব অপূরণীয়। একটা মানুষের ক্ষুদ্রশক্তি কোন্‌টার কতটুকু পূরণ কর্‌তে পারে?—মরুভূমিতে ছোট এক ঘটী জল ছড়িয়ে দিলে তা'র তাপ দূর হয় না; কিন্তু সেই এক ঘটী জলে একজন পিপাসিতেরও যদি তৃষ্ণা দূর কর্‌তে পারা যায়—তাই করাই ভাল নয় কি? আগে ঘর, তারপরে বা'র; ঘরের লোক দুঃখ পাচ্ছে—আত্মীয়স্বজন, প্রতিবাসী ও গ্রামবাসী অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, সে-সব না দেখে, কাশীতে একটা শিবস্থাপনা কর্‌তে যাওয়া—পুণ্যকাজ ব'লে আমার মনে

হয় না; তারাচাঁদ! সে যাই হ'ক, তুমি কি করতে চাও আমাকে বল দেখি?"

"আমাকে যদি আর কিছু ট্যাকা দেন,ত নিকটেই এইখানে ধানচালের একটা কারবার ফেঁদে বসি। আমি ঠাঁই দেখে রেখেছি। তবে আপনার এ-ট্যাকাটা আমি খুব অল্পদিনের মধ্যেই তুলে দোব। শুধু ব'সে থাকি কেন—যা আসে। আমার দেনাও এখনো কিছু আছে—মাধাইএর কিছু ধারি।"

সীতানাথ সম্মত হইলেন। তারাচাঁদ শুভদিন দেখিয়া নূতন স্থানে নবোদ্যমে পুনর্ব্বার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অনির্ব্বৃতা।

সীতানাথের সংসারে যাহারা বাস করিয়া থাকে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে—কোন আত্মীয় সম্বন্ধ না থাকিলেও—অসদ্ভাব ছিল না। সংসারে কাহাকেও কোন কিছুর অভাব বুঝিতে হয় না; অভাব হইবার পূর্ব্বেই সকল বস্তু সমাহৃত হইয়া থাকে। কে আনে, কোথা হইতে আসে, কেহ তাহা বুঝিতেই পারে না—যেন ভূতের সংসার! কোন বিষয়েই কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলতাও দৃষ্ট হয় না। কাজের এমন একটা বাঁধা নিয়ম আছে, যাহাতে সব কাজই যেন কলে সমাধা হইয়া থাকে! সীতানাথকে কিছুই দেখিতে হয় না; তিনি মাসে মাসে গোবর্দ্ধন ও মায়াবতীর হস্তে সংসার-খরচের হিসাবে কিছু কিছু টাকা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, ব্যবস্থা যাহা করিবার তাহা তাঁহারাই করিয়া থাকে। ইহাতে কাহারও ঈর্ষা বা

অসন্তোষ নাই; কারণ, কাহাকেও কোনপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কেবল রাধারাণী এই বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট নহেন। মায়াবতী কোথাকার কে? সে কেন সবার উপরে কর্ত্রীত্ব করিবে? বয়সে সে সবার অপেক্ষা অনেক ছোট—রাধারাণীর কন্যার যোগ্য বয়স্কা। তাহার কর্ত্রীত্বাধীনে তাঁহাকে থাকিতে হইবে? এই প্রকার আরও অনেক কারণে রাধারাণীর মনে মায়ার প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষভাবটা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। রূপ ও গুণ অনেকের থাকে; কিন্তু অল্প বয়সে মায়ার মত এমন বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি কাহারও বড় একটা দেখা যায় না। তাহার নিকটে আপন-পর-ভেদ বা ছোট-বড়-বিচার নাই; সকলেরই প্রতি তাহার তুল্য দৃষ্টি, সমান যত্ন—সমান ভালবাসা! মায়ার শরীরটা যেন সাধারণ মানুষের রক্ত-মাংসে গড়া নয়! তাহার আলস্য নাই, শ্রান্তি নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই। বিগ্রহের ভোগ হইয়া যতক্ষণ সকলের—দাসীচাকরদের পর্য্যন্ত—ভোজন শেষ না হয়, ততক্ষণ সে জল পর্য্যন্ত পান করে না। রাত্রিতে সকলের শেষে শয়ন করিয়া, প্রত্যূষে সকলের অগ্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া থাকে। অরুণোদয়ে স্নান, প্রভাতে শিবপূজা, পূজা-শেষে ভাণ্ডারে গিয়া জিনিষপত্র বাহির করিয়া দেওয়া ও বিগ্রহের ভোগ-রন্ধনের ব্যবস্থা করা—এইগুলি তাহার দিবসের প্রথম ও প্রধান কার্য্য। তাহার পরে ইহার জলখাবার, উহার জল, তাহার পাণ, যে অসুস্থ তাহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা, সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও একবার সময় করিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসা, তাহার গায়ে ও পায়ে হাত বুলাইয়া দেওয়া, গল্প করিয়া তাহাকে রোগের যন্ত্রণা ভুলাইতে চেষ্টা করা, দিবসের কার্য্য শেষ হইলেই রাত্রির জন্য উদ্যোগ, রাত্রির কার্য্যশেষে পরদিনের জন্য যথাসম্ভব আয়োজন—এ-সকল মায়াবতীর নিত্যকর্ম্ম। শক্তিও তাহার অসাধারণ। দেবতার

ভোগের জন্য প্রত্যহ মধ্যাহ্নে পনর সের—কখন তাহারও অধিক চাউলের অন্ন ও তদুপযুক্ত ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে হয়। পুরবাসিনী বিধবা রমণীরাই সেকার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুস্থতা বা আলস্যে মায়াবতী ভয় পায় না; কোমরে আঁচল বাঁধিয়া সে একাই হেঁসেলে প্রবেশ করে, এবং পঞ্চাশ-ষাট-জনের ভোগ্য অন্নব্যঞ্জন অল্প সময়ের মধ্যে অক্লেশে রাঁধিয়া ফেলে। অন্যদিন অপেক্ষা সে-দিন সকাল সকাল দেবতার ভোগ হইয়া যায়—প্রসাদের স্বাদ অমৃততুল্য হইয়া থাকে! তাহার হৃদয়খানিও যেন সাধারণ উপাদানে গঠিত নহে! তাহাতে ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা, লালসা, ক্রোধ, বিরক্তি, নীচতা প্রভৃতি প্রবেশ করিতে পায় না। বুঝিবার ভুলে কেহ যদি কখন তাহার উপরে রাগ বা অভিমান করে, রুষ্ট হইয়া পাঁচটা কটু কথা বলে, মায়াবতী তাহাতে রাগ করে না—তাহার মুখ একটু অপ্রসন্নও হয় না! নিজের নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা না করিয়া, সে নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া লয়, এবং ক্ষমা চাহিয়া পরের অসন্তোষ দূর করিতে যত্ন করিয়া থাকে। যাহার এত গুণ, তাহাকে কে না ভালবাসিবে? শুধু ভালবাসা নহে—সকলেই তাহাকে যেন কেমন একটু ভয়ও করিয়া থাকে! সীতানাথ মায়াকে বিধিপ্রেরিতা ও তাঁহার গৃহে তাহার অবস্থানকে দৈবানুগ্রহ-জনিত ভাবিয়া সুখী ও কৃতার্থ; তাহার উপরে সংসারের ভার অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। যাহার নিজের কোন গুণ নাই, সে অন্যের গুণের অসূয়া করে—গুণের মধ্যেও খুঁত খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে। রাধারাণীও তাহাই করিয়া থাকেন। কিন্তু মায়ার প্রতি বিদ্বেষভাবটা তিনি মুখে প্রকাশ করিতে পারেন না। কাহার নিকটে প্রকাশ করিবেন? বাড়ীর সকলেই যে মায়ার প্রতি সন্তুষ্ট—তাহার প্রতি অনুরক্ত! মায়ার এই সর্ব্বজনপ্রিয়তাই রাধারাণীর স্বচ্ছন্দবাসের অন্তরায় হইয়াছিল।

তারাচাঁদের ব্যবসায়বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার ব্যবসায় লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি সংসারের কোন কথাতে থাকেন না, মধ্যাহ্নে একবার আসিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়া যান; রাত্রিতে সবদিন আসিতেও পারেন না—দোকানেই শয়ন করিয়া থাকেন। রাধারাণী একদিন তাঁহাকে বলিলেন—"হ্যাঁগা! চেরদিনই কি আমাকে এইরকম পরের ঘরে, পরের দোরে, পরের হাত-তোলায় থাক্‌তে হবে?"—"কি কর্‌বে—কোথায় যাবে?"—"কেন, তোমার ব্যাব্‌সায় ত বেশ নাভ হচ্ছে শুনতে পাই—কোথাও একটু কুঁড়ে কাঁড়া বাঁধ না! আমি আর এমন ক'রে থাক্‌তে পার্‌ব না।"—তারাচাঁদ মুখ অন্ধকার করিয়া বলিলেন—"পরের বাড়ীতে রাঁধুনীগিরি ক'রে থাক্‌তে পেরেছেলে, আর এখানে মানের ভাত তোমাকে তেতো লাগ্‌ল? তোমার যেথা ইচ্ছে থাক গে—আমি আর কোথাও যাচ্ছি না।"

তারাচাঁদের দিক্ দিয়া কোন সুবিধা হইবার নহে বুঝিয়া রাধারাণী একদিন গোবর্দ্ধনকে বলিলেন—"হ্যাঁরে! চেরকাল্‌টাই কি এম্‌নি ক'রে ভেসে ভেসে বেড়াবি—বে-থা ক'রে থিতি-বিতি হবি না?"—"রক্ষে কর, দিদি! বলে—আপনি শুতে ঠাঁই পায় না আবার শঙ্করাকে ডাকে!"—"কেন, চাক্‌রি বাক্‌রি কর্‌ছিস্, এতদিন ধ'রে এত ট্যাকা তোর হাত দিয়ে খরচ হচ্ছে—কিছু কি আর রাখিস্ নি? বাপের ভিটেটা উদ্ধার কর্‌বি চল্!—আমি গিয়ে তোর ঘরসংসার পেতে থেতিয়ে গুছিয়ে দোবো এখন—আমার আর এখানে থাক্‌তে মন নেই।"—"পয়সাকড়ি হাত দিয়ে খরচ হয় ব'লেই যে তা ভেঙ্গে কিছু কর্‌তে হবে, তেমন মতিগতি যেন ভগবান্ কখন না দেন, দিদি! এখানে আমরা চাক্‌রি কর্‌ছি, তা মনে করি না—নিজের বাড়ীতে যেমন কাজকর্ম্ম কর্‌তে হয়, তেমনি করি। কর্ত্তামশায়ও আমাদের পর ভাবেন না। আমরা এখানে

বেশ সুখেস্বচ্ছন্দে আছি। বাপের ভিটেতে গিয়ে থাক্‌বার ইচ্ছে হয়ে থাকে—তোমাকে রেখে আসিগে চল! আমি এ আশ্রয় ছেড়ে, প্রাণ থাক্‌তে আর কোথাও যাচ্ছি না!"

রাধারাণী দেখিলেন—কোন দিক্‌ দিয়াই কোনরূপ সুবিধা হইবার নহে। অগত্যা তিনিও কাদায় গুন্‌ ফেলিয়া দিন কাটানর ভাবে এই গৃহে অবস্থান করিতেই বাধ্য হইলেন। তবে মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, থাকিতেই যখন হইল, তখন থাকার মতই থাকিতে হইবে; যেমন করিয়াই হউক গৃহিণীপনাটা মায়ার হাত হইতে কাড়িয়া লইতে হইবে। দেখা যাউক—কে হারে আর কে জিতে।

কিছুদিন পরেই অমর ডাক্তারি পাশ করিল। সীতানাথ কলিকাতার বাসাবাড়ী ছাড়িয়া দিয়া অমর প্রভৃতিকে তাঁহার পল্লীনিবাসে লইয়া আসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রহস্যভেদ।

অমর মাতামহের পল্লীগৃহে আসিয়া একদিন অপরাহ্ণে গোবর্দ্ধনের সঙ্গে গ্রাম দেখিতে বাহির হইল। সে যে এখানে এই প্রথম আসিয়াছে, তাহা বোধহয় বলিতে হইবে না। সুতরাং এ-গৃহের সমস্তই তাহার নিকটে বিস্ময়কর—সমস্তই যেন একটা রহস্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। সে পূর্ব্বাবধি শুনিয়া আসিতেছিল, সীতানাথের আপনার জন কেহ নাই; কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিল, তাঁহার প্রকাণ্ড গৃহে লোক ধরে না, এবং তাহারা সকলেই তাঁহার আত্মীয়স্বজন। বেড়াইতে বাহির হইয়া অমর

গোবর্দ্ধনকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল। গোবর্দ্ধন হাসিতে হাসিতে বলিল —"দু'দিন থাক্‌লেই সব বুঝ্‌তে পার্‌বে! এঁরা সব—এই আমার মত আত্মীয় আর কি—খাবার কুটুম্।"

বাড়ী হইতে একটু দূরে আসিয়াই খুব বড় একখানা কোঠাবাড়ী দেখিয়া অমর জিজ্ঞাসা করিল—"এ বাড়ীটা কা'র মামাবাবু?"

"দেখ্‌বে?—এস! এটিকে আমরা 'সাধারণ-মহল' বলি; এখানে সাধারণের দরকারী কতকগুলি জিনিষ আছে।"—বলিতে বলিতে গোবর্দ্ধন অমরকে সঙ্গে লইয়া সেই বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইল। বাড়ীখানিতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা একটি বিদ্যালয় আছে,তাহাতে কাহাকেও মাহিনা দিয়া পড়িতে হয় না। একটি চতুষ্পাঠী আছে, তাহাতে তিন চারিজন বেতন-ভোগী অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন; ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও দর্শন পড়িতেছে এমন অনেকগুলি ছাত্র আছে। বিদেশী ছাত্র ও শিক্ষকগণের থাকিবার উত্তম বন্দোবস্ত আছে। রোগে যাহারা ডাক্তার ডাকিতে বা ঔষধ কিনিতে পারে না, তাহাদের চিকিৎসার জন্য একটি দাতব্য ঔষধালয় আছে; তাহাতে একজন ভাল ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। লোকের অবস্থা অনুসারে শুশ্রূষার ও পথ্য-বিতরণেরও ব্যবস্থা আছে। পুস্তকালয় ও ডাকঘর প্রভৃতি অন্যান্য ব্যাপারও আছে।

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, অমর বাহিরে আসিয়া বলিল—"যা দেখে এলাম, তা ত সামান্য নয়, মামাবাবু! এ-সকলের খরচ কোথা থেকে আসে?"

গোবর্দ্ধন একটু হাসিয়া বলিল—"তোমার দাদামশায় দেন—আর কোথা থেকে আস্‌বে? তিনি নিজে এইগুলির তত্ত্বাবধারণ করেন।"

সীতানাথের নিজ গ্রামে এবং দুই একখানি পার্শ্বগ্রামেও ভ্রমণ করিয়া অমর দেখিল, সর্ব্বত্রই তাঁহার কীর্ত্তি—এখানে পথ, ওখানে পুষ্করিণী,

সেখানে শান-বাঁধান ঘাট, প্রত্যেক গ্রামে উপায়াক্ষম, অসহায়, দরিদ্র গৃহস্থের জন্য বারমাস অন্নবস্ত্র, রোগে ঔষধ ও পথ্য, দায়ে অর্থবিতরণের ব্যবস্থা, সমস্তই সীতানাথ করিয়া থাকেন। সে অঞ্চলটাই যেন সীতানাথময়! পাশাপাশি গ্রামগুলি যেন একটি বৃহৎ পরিবার, আর সীতানাথ যেন তাহার কর্ত্তা!

সন্ধ্যার পরে বিষ্ণু-বিগ্রহের আরতি শেষ হইলে অমর একাকী আসিয়া দীঘির ঘাটে বসিল। দীঘির জলে চাঁদের আলো পড়িয়াছে। মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছে। বায়ুর হিল্লোলে বিবিধ ফুলের সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে। অমর অনেকক্ষণ সেইস্থানে বসিয়া সান্ধ্য প্রকৃতির সৌম্য সুষমা সন্দর্শন করিল,—সীতানাথের এবং আপনার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

দীর্ঘিকার দক্ষিণতীরস্থ পাহাড়ের উপরে যে কুটিরের উল্লেখ হইয়াছে, সেটি সীতানাথের বিশ্রাম-কুটির; তাহাতে তিনি একাকী বিশ্রাম করেন। প্রভাতেই স্নান-আহ্নিক সারিয়া তিনি সেই বিশ্রাম-কুটির হইতে নামিয়া আসেন; সন্ধ্যার পরেই আবার তাহাতে ফিরিয়া যান। প্রভাতে বা সন্ধ্যার সময়ে বিশেষ প্রয়োজনেও কেহ সে কুটিরে গমন করে না। সে-বিষয়ে সীতানাথের কোন আদেশ না থাকিলেও, সকলের প্রতি গোবর্দ্ধনের সেইরূপ আদেশ ছিল। গোবর্দ্ধন অমরকেও সেই আদেশ জানাইতে ভুলিয়া যায় নাই; তাহাতেই অমর দীঘির ঘাটে বসিয়া সীতানাথের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাত্রি হইল, তথাপি তিনি নামিয়া আসিলেন না দেখিয়া, অমর ধীরে ধীরে কুটির অভিমুখে চলিল।

সীতানাথ একাকী এতক্ষণ ধরিয়া কি করিতেছেন, তাহা দেখিবার ইচ্ছায় অমর ধীরে ধীরে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে কুটিরে আসিয়া দেখিল, তিনি

দূর্ব্বাদলাবৃত কুটির-প্রাঙ্গণে আস্তৃত মৃগচর্ম্মের উপরে সরলভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার বিশাল ও উন্নত দেহ স্থির, করদ্বয় যোগমুদ্রাবদ্ধ, নেত্রযুগল ধ্যান-স্তিমিত। তরু-পল্লবের অবকাশ দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া তাঁহার প্রশান্ত-সুন্দর মুখের উপরে পতিত হইয়াছিল। দেখিলে মনে হয়, যেন তাঁহার মুখে একটা স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে! অমর সেই অবৃষ্টিসংরম্ভ-অম্বুবাহের ন্যায়, অনুত্তরঙ্গ গভীর-হ্রদের ন্যায় আর অন্তঃ-সঞ্চারী প্রাণবায়ুর নিরোধ বশতঃ নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপের ন্যায় স্থির, গম্ভীর, জ্যোতিঃপুঞ্জ মূর্ত্তির পানে সবিস্ময়ে ও সভয়ে চাহিয়া স্থিরভাবে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ভাবিল যে, সে গোবর্দ্ধনের নিষেধ না মানিয়া সে-সময়ে সেখানে আসিয়া ভাল করে নাই। তখন ফিরিয়া আসিতেও তাহার ভয় হইল—পাছে পায়ের শব্দে তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়। সে নীরবে দাঁড়াইয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; জোরে নিঃশ্বাসটি ফেলিতেও তাহার ভয় হইতেছিল।

অমর সম্মুখের জ্যোৎস্না-ধবলিত, দিগন্ত-প্রসারী প্রান্তরের বক্ষে চাহিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সে মনে করিতে পারে না;—তাহার মন তখন চিন্তার স্রোতে অনেকদূর ভাসিয়া গিয়াছিল,—সহসা সীতানাথের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল—"দাঁড়িয়ে কে—অমর?"

অমর অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়া বলিল—"এ-সময়ে আপনার বিশ্রাম-কুটিরের নির্জ্জনতা ভেঙ্গে দিতে এসেছি. ব'লে রাগ করেননি ত, দাদা-মশায়?"

সীতানাথ রাগের ভাণ করিয়া বলিলেন—"রাগ করবারই যে কথা; এ তোমার বড় অন্যায় অত্যাচার! তোমাদের ঘর-বাড়ী রয়েছে, বৈঠকখানা রয়েছে, ব'সো-দাঁড়াওগে; বুড়োর এই কুঁড়েতে কেন বল ত?"—তারপর একটু হাসিয়া স্নেহপূর্ণ মধুরকণ্ঠে বলিলেন—"তোমার যখন ইচ্ছে এখানে

আস্‌তে পার, অমর! কিন্তু এমন সময়ে আলো না নিয়ে এখানে এসো না, ভাই! এ তোমার কল্‌কেতা নয়—এখানে সাপের ভয় আছে। এস—আমার কাছে ব'স।"

অমর দূরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া নিকটে আসিয়া বসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাদের এ মেঠো দেশ, এখানে কিছুই নেই ভাই!—মন টিক্‌বে ত?"

অমর। আপনি যদি এখানে না থাক্‌তেন, ত টিক্‌ত না, দাদামশায়! মামাবাবুর সঙ্গে আজ আপনার দেশটা ঘুরে দেখে এসেছি; আপনার লুকানো ব্যাপার সব জেনে ফেলেছি—আর ঢেকে রাখ্‌তে পার্‌ছেন না!

সীতা। কি জেনে ফেলেছ—আমি তোমার কাছে কি ঢেকে রেখেছিলেম, অমর?

অমর। এখানে আপনার এত কাণ্ড—তা ত কই একটি দিনের জন্তেও কখন বলেননি, দাদামশায়! আপনি যে এই কুঁড়েতে ব'সে জীবনের এতগুলি ভাল কাজ এমন নিঃশব্দে, সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরে ক'রে এসেছেন—ক্ষুদ্রতার আবরণে এতগুলি মহৎ ব্যাপারকে ঢেকে রেখেছেন, তা ত কখন ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে দেননি! প্রথমে কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি; আজ আপনার রহস্তের ঝাঁপি খোলা পেয়েছি, আপনার আত্মীয়দের পরিচয় পেয়েছি; বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আপনার এই পল্লী-গৃহখানি অনাথ-আশ্রম বা সেবাশ্রমের একটা রকম-ভেদ, অসহায় দরিদ্রমাত্রই আপনার আত্মীয়। আপনার 'সাধারণ-মহল'—দাতব্য-চিকিৎসালয়, অবৈতনিক বিস্তালয়, চতুষ্পাঠী ও ছাত্রাবাস প্রভৃতির সমবায়-মন্দির। আর এই নির্জ্জন, নিভৃত কুটিরখানি আপনার যোগাশ্রম। দেবসেবার অছিলায় আপনি অতিথি-সেবার অনুষ্ঠান করেন।

সীতানাথ একটু হাসিয়া বলিলেন—"ছোট জিনিষকে বড় একটা নাম

দিয়ে বল্‌লে শুন্‌তে ভাল হয় বটে, কিন্তু তা'তে জিনিষের মূল্য কিছুই বাড়ে না, অমর! তুমি নূতন এসেছ, তাই এ জিনিষগুলোকে ঐরকম ভাবে দেখেছ; দিনকতক থাক্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, এখানে এগুলি না থাক্‌লে চলেই না। প্রত্যেক পল্লীবাসীরই যা কর্ত্তব্য, আমি শুধু তাই কর্‌তে চেষ্টা করি—তা'র বেশী এতটুকুও নয়। সহরে বা গণ্ডগ্রামে রাজার অনুগ্রহে বা বড়লোকের বদান্যতায় নিঃস্ব-সাধারণের উপকারের জন্যে যে-সকল ব্যবস্থা দেখা যায়, পল্লীগ্রামে তা'র কিছুই থাকে না—থাকা সম্ভবও নয়। সুতরাং পল্লীবাসীদেরই কর্ত্তব্য—সকলে মিলেমিশে অথবা তা যদি না সম্ভব হয়, ত একা একাই যা'র যতটুকু সাধ্য, দরিদ্র-সাধারণের উপকার কর্‌তে চেষ্টা করা। প্রত্যেক পল্লীগ্রামেই—সামান্যভাবে হ'লেও, এইরকমের কিছু কিছু থাকা নিতান্ত দরকার। তুমি আমার জীবনের সব কথাই জান—দু'চারটে কথা শুধু দরকার হয়নি ব'লে তোমাকে বলিনি; কথা উঠ্‌ল ত বলি—"

অমর কৌতূহলপূর্ণদৃষ্টিতে সীতানাথের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিল; তিনি বলিতে লাগিলেন—"সংসারকে আমি যতটা ভালবেসেছিলাম—এখনও বাসি,—সংসার তা'র সিকি ভালবাসাও আমাকে দেয়নি। সংসার আর-সকলকে যে-বয়সে তা'র মন-ভুলান জিনিষগুলি দিয়ে আপনার বুকে রাখ্‌তে যত্ন করে, ঠিক সেই বয়সে আমার সব কেড়ে নিয়ে আমাকে সন্ন্যাসের পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। তোমার চেয়েও যখন আমি পাঁচ ছ'বছরের ছোট, তখনই আমার সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন হয়েছিল; ছিলমাত্র একটি সূক্ষ্মসূত্রের বন্ধন—একটি শিশুকন্যা। সেটি বড় হবে, তা'র গর্ভে তোমার জন্ম হবে, বিদেশ থেকে ফিরে এসে আবার আমাকে এই খেলাঘর বাঁধ্‌তে হবে, তা তখন জান্‌তেম না! বিদেশে-বিদেশেই ঘুরে বেড়াতাম। দেশের আর

কন্যার মায়ায় মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লে, মাঝে মাঝে এক একবার এসে দেখে যেতাম। গ্রামের দুরবস্থা দেখে মনের মধ্যে বড় কষ্ট হ'ত। যে-গ্রামে জীবন আরম্ভ করা যায়, সেটা ক্ষুদ্র হ'ক আর যাই হ'ক, তা'র সঙ্গে সুখময় শৈশব আর বাল্যের মধুর স্মৃতি এমন অপরিহার্য্য-রকমে জড়িত থাকে যে, তা থেকে যত দূরেই থাক—তা'র কথা মনে হবেই, তা'র উন্নতি বা অবনতিতে হৃদয়ে একটা আনন্দ বা বিষাদ উপস্থিত হবেই। আমি এখানে এসে দেখ্‌তাম যে, আমার ছেলেবেলার সেই সুন্দরী, ছায়াময়ী, শান্তিময়ী পল্লীখানি দিনে দিনে শ্রীহীনা হয়ে পড়্‌ছে, যাঁরা আমাকে ভালবাস্‌তেন বা আমি যাঁদিকে ভালবাস্‌তেম, তাঁরা সকলে একে একে শ্মশানের পথ দিয়ে লোকান্তরে চ'লে গেছেন! যারা আছে, তাদের মধ্যে অধিক লোকই নিঃস্ব। যাদের পয়সা আছে, তা'রা গ্রামের উন্নতি-অবনতিতে উদাসীন, গ্রামবাসীদের দুঃখে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। গ্রাম উচ্ছন্নে যাচ্ছে, তা'রা সহরে গিয়ে বাস ক'রে, হাওয়াগাড়ী চ'ড়ে, থিয়েটার-সার্কাস দেখে আর 'আইস্‌-ক্রীম্‌' খেয়ে অর্থের সার্থকতা সাধন কর্‌ছে! পাশাপাশি পাঁচখানা গ্রামের মধ্যে কোথাও একটা পাঠশালা নেই! যাদের শিক্ষার উপরে গ্রামের ভবিষ্যৎ উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে, তা'রা লেখাপড়া শেখ্‌বার উপায় না থাকায় যাত্রা ক'রে আর হনুমান্‌ তাড়িয়ে হো হো ক'রে ঘুরে বেড়ায়। ভাল একটা পুষ্করিণী নেই। গ্রীষ্মকালে অগভীর ক্ষুদ্র জলাশয়গুলি সব শুকিয়ে যায়। লোকে তা'রই ঘোলা—কাদাগোলা, অস্বাস্থ্যকর জল স্নান-পানের জন্যে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়! বারমাসই নানারকমের রোগ। বারমাসই ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর মত হাঁ ক'রে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়, সুবিধা পেলেই একে-তাকে মুখে ক'রে নিয়ে যায়; যাকে ফেলে যায়, তা'রও রক্ত শুষে খেয়ে হাড়গুলিকে

পর্য্যন্ত চিবিয়ে কাজের বা'র্ ক'রে রেখে যায়। কোথাও একটা ডাক্তার নেই, রোগে কেউ একবিন্দু ওষুধ পায় না! কৃষিই সাধারণের উপজীব্য; অথচ রোগে, শোকে আর অভাবে দুর্ব্বল হয়ে পড়ায় চাষবাসের কাজও কেউ ভাল ক'রে কর্‌তে পারে না। ফলে, দেশব্যাপী দরিদ্রতা, ঘরে ঘরে অন্নকষ্ট আর হাহাকার! এইসব দেখেশুনে মনে বড়ই কষ্ট হ'ত! বিদেশে থেকে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ক'রে, প্রকৃতির নির্জ্জন নেপথ্যদেশে বন্যবৃত্তি লয়ে বাস ক'রে, ভগবানের চিন্তায় জীবন যাপন কর্‌বার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তাম, মন স্থির হ'ত না—দেশের জন্যে, আমার দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্যে মনটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ত—কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ত। ভাব্‌তাম আমার কর্ম্মের শেষ হয়নি—ভগবান্ আমাকে দিয়ে বোধ হয় আরও কিছু করিয়ে নিতে চান! তা না হ'লে, লোকে যে নিঃসঙ্গ-অবস্থা পাবার কামনা করে, আমি না চেয়েও তা পেয়েছিলেম—সন্ন্যাসের মুক্তপথ সমস্তবাধাশূন্য হয়ে আমাকে আহ্বান করেছিল, আমি সে আহ্বান অগ্রাহ্য ক'রে আবার সংসারে ফিরে আস্‌ব কেন? আমার জন্যে কাঁদ্‌বার লোক কেউ ছিল না বটে; কিন্তু যাদের জন্যে কাঁদ্‌তে হয়, তেমন লোক আমার অনেক ছিল। আমার গ্রামবাসী ও প্রতিবেশী সকলে দুঃখ পাচ্ছে, আর আমি কি ক'রে নিশ্চিন্তমনে নিজের সুখের জন্যে নিঃশ্রেয়সের পথ সন্ধান ক'রে বেড়াই? হিসাব ক'রে দেখ্‌লাম, আমার যে সম্পত্তি আছে, তা'র আয়টা শুধু যদি আমি আমার গ্রামের উপরে চারিয়ে দি, তা'তে সকল লোকের সব অভাব সম্পূর্ণ দূর হয় না। আরও কিছু অর্থের দরকার। যদি গ্রামের নামে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে বদান্য বড়লোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াই, তা'তে কার্য্যসিদ্ধি হবার আশা অতি অল্প। যে-কাজে নাম নেই, সে-কাজে বড় কা'রও মন দেখা যায় না। যে-দানের কথা খবরের কাগজে উঠ্‌বে না, তেমন দান বড় কেউ কর্‌তে চায় না। ভাব্‌লাম, তাঁদেরই দ্বা-

দরকার কি ? আমি নিজেও ত কর্ম্মক্ষম ; যে-কাজ ক'রেই হ'ক কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টা ক'রে দেখি। ভগবান্ সৎকার্য্যের সহায়। এমন একটা কাজ পেলাম, যা'তে বেশ দশটাকা উপার্জ্জন হ'তে লাগ্‌ল। কিছু টাকা সঞ্চয় ক'রে দেশে ফিরে এলাম। তা'র পরের কথা সমস্তই তুমি জান। বেশী কিছু কর্‌তে পারি নি, ভাই! সামান্যভাবেই যা হয় কিছু কিছু আরম্ভ করেছি। তবে আমি যতদিন আছি, যতদিন আমার শেষ পয়সাটি থাক্‌বে, এক বিঘাও জমী বা বাস্তুভিটা থাক্‌বে, ততদিন এ-কাজ-গুলি আমি বন্ধ হ'তে দেব না। আমার মৃত্যুর পরে কি ঘট্‌বে, তা আমি দেখ্‌তে থাক্‌ব না। তোমাকে মানুষ ক'রেছি ; আমার প্রিয়কার্য্য কিছু যদি তোমার ইচ্ছা হয়, ত আমার আরব্ধ কার্য্যগুলি যা'তে কিছু দিনও চলে, তা'র চেষ্টা ক'রো! কোন কাজই একজনের চেষ্টায় স্থায়ীভাবে চলে না—যা'র দ্বারা আরম্ভ, তা'র সঙ্গেই শেষ হ'য়ে যায়। টাকা রেখে গেলেও উপযুক্ত লোকের অভাবে কাজ অচল হ'য়ে পড়ে। লোকের সমবেত চেষ্টার ফলে যা হয়, তাই স্থায়ী হবার আশা করা যায়। সে চেষ্টাও একটু আধটু ক'রে দেখেছি—সহায়তা দূরে থাক্, কা'রও সহানুভূতিও পাইনি। তাই সে-চেষ্টা ত্যাগ ক'রে নিজের সাধ্যে যতটুকু যা হয়ে উঠে, তাই কর্‌তেই চেষ্টা করি।"

ইহার পরদিনে অমর শৈলেনকে পত্র লিখিল :—"শৈলেন, অশ্রুর বিনিময়ে অশ্রু উপহার লইয়া যেদিন তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া আসি, সেদিন মনে হয় নাই যে, দাদামহাশয়ের দেশে আমার মন টিকিবে। এখন দেখিতেছি তাহার বিপরীত! তোমরা ছাড়া কলি-কাতার আর কিছুই এখন চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হয় না। এই বিরল-বসতি পল্লীর ঘনচ্ছায়া, বিমল বায়ু ও নিবিড় শান্তি ছাড়িয়া,আর তোমাদের সেই ধূলা ও ধূমে পূর্ণ ঘন বাতাস,নিরন্তর জনকোলাহল আর গাড়ী-ঘোড়ার

ঘড় ঘড় শব্দে ভরা, ঘনবিন্যস্ত অট্টালিকার গোলকধাঁধার ভিতরে আর প্রবেশ করিতেই ইচ্ছা হয় না। আমি যাহা যাহা ভালবাসি, তাহার সমস্তই এখানে পাইয়াছি। প্রভাতে স্বর্ণরবি-রশ্মি-সমুজ্জ্বল, শিশির-ধৌত তরুশ্রেণী। মধ্যাহ্নে বিবিধ, সুকণ্ঠ বনবিহঙ্গের মধুর কূজনে মুখরিত নিবিড় ছায়া। সায়াহ্নে দিগন্ত-প্রসারী প্রান্তরের বিস্তৃত বক্ষে স্নিগ্ধবায়ু-তরঙ্গিত, শ্যাম শস্যক্ষেত্র। তাহার উপরে প্রসন্ন দেবতার নিয়ত-কল্যাণবর্ষী অনুগ্রহের মত দাদামহাশয়ের স্নেহ-যত্ন ত আছেই। আমি ফুল আর বই ভালবাসি বলিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই দুইটা বড় বড় মালঞ্চের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, এবং পৃথিবীর যাবতীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া একটা লাইব্রেরী করিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীর নিকটেই শান-বাঁধান-ঘাটযুক্ত একটি দীঘি আছে; আর সেই দীঘির পাড়ে নানাজাতীয় বৃক্ষে পরিপূর্ণ, কৃত্রিম মাটির পাহাড়ের উপরে একখানি কুটির আছে। ভারতের অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক মনোহর, কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি; কিন্তু এত সামান্যের উপরে এমন অসামান্য মনোজ্ঞতার সৃষ্টি, কৃত্রিমের সঙ্গে নৈসর্গিকের এমন সুন্দর সমাবেশ, আর কুত্রাপি দেখি নাই। তৃণাচ্ছাদিত ও তরুচ্ছায়াময় এই মাটির পাহাড়টি বড়ই মনোরম। ইহার সমতল শিখরদেশে পুষ্পিতকুঞ্জমধ্যে নিভৃত কুটিরখানি রমণীয় বলিলে, তাহার রমণীয়তার একাংশও বলা হয় না। কুটিরখানি যেন সৌন্দর্য্য, শান্তি ও পবিত্রতার প্রসবাগার—তাহাদের চিরবিশ্রাম-নিকেতন! "স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর" এই দীঘির কথা আর কি বলিব, সত্যই যেন ইহার "নাহি তল নাহি তীর মৃত্যুসম নীল নীর স্থির!" ইহার জল তোমাদের কলের জলের অপেক্ষাও স্বচ্ছ ও শীতল। সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া যখন এই অগাধ নীলজলরাশিকে কাল করিয়া তুলে, নীর-সঞ্চারী মৎস্যগুলি সব ঘুমাইয়া পড়ে, তীরতরুশাখার কলনাদী পক্ষিকুলও নীরবে অবস্থান

করে, তখন ইহার জলে পা ডুবাইতেও যেন ভয় হয়। কিন্তু যখন ইহার উপরে চাঁদের আলো পড়ে, তখন আবার এই ভীষণ-গম্ভীরভাব একটা স্নিগ্ধ-রমণীয়তায় পরিণত হয়। রবিকরসম্পর্কে আর ইহার অধৃষ্যভাব থাকে না, তখন ইহা বালকেরও অধিগম্য হইয়া থাকে। ইহার স্বচ্ছজলে স্নান করিলে মনের মলিনতা পর্য্যন্ত যেন ধৌত হইয়া যায়! এখানে দাদামহাশয়ের আরও অনেক ব্যাপার আছে। একদিনের জন্যও একবার এখানে আসিতে পারিলে বুঝিতে পারিবে—তুমি যাঁহাকে "গ্র্যাণ্ড্ ওল্ড্ ম্যান্" বলিয়া থাক, তিনি প্রকৃতই তাহাই কি না। আর একটা কথা বলিয়াই আজ পত্র শেষ করিব। আমি [illegible] একটা চাকরি পাইয়াছি। দাদামহাশয়ের একটি ছোটখাট দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে। নামডাকে বড় না হইলেও কাজে-কর্ত্তব্যে নিতান্ত ছোট নহে—বহুদূর হইতে বহুসংখ্যক রোগী প্রত্যহ উপস্থিত হয়। ডাক্তারও একজন নিযুক্ত আছেন, আমি তাঁহার উপরের পদ পাইয়াছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নূতন গৃহে নবাগতা।

অমর প্রভৃতি আসিবার দশ পনর দিন পরেই সীতানাথ প্রভাবতীকে আনিলেন। প্রভা আসিলে, রাধারাণী খুব উৎসাহের সহিত তাহাকে পাল্কী হইতে তুলিয়া আনিলেন এবং সকলকে বউ দেখাইয়া ও বধূকে গৃহের সকল স্থান দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন—সকলের পরিচয় বলিয়া দিতে লাগিলেন। পুরবাসিনীদের মধ্যে আনন্দ-কৌতুকের একটা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। প্রভার রূপ দেখিয়া সকলেই বলিল—"দিব্যি

বউ—খুব রং, খুব রূপ।" প্রশংসার প্রথম উচ্ছ্বাসটা একটু কমিয়া পড়িলে রূপের সমালোচনা আরম্ভ হইল। কেহ বলিলেন, 'কি এমন সুন্দরী? রংটাই খালি চড়া—গড়ন পেটন তেমন নয়।" কেহ বলিলেন, "মুখখানা যেন কেমন কেমন—নয় ভাই?" কেহ বলিলেন, "নাকটা বড্ড বড়।" কেহ বলিলেন, "দাঁতগুলি একটু উঁচু উঁচু।" কেহ বলিলেন, "কপালখানা যেন চড়ার মত।" কেহ বলিলেন, "গালদু'খানি যেন একটু ভারি ভারি।" কেহ বলিলেন, "চাউনিটা একটু খর"। এইরূপে প্রতিপন্ন হইল যে, রং ছাড়া প্রভার আর কিছুই প্রশংসার যোগ্য নহে।

প্রভা যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, মায়াবতী তখন রন্ধনশালায় ভারি ব্যস্ত ছিল। বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে, তখনও দেবতার ভোগ হয় নাই। মায়া ইহাকে বলিতেছিল—"দেখো তখন এর পরে—প্রভা ত আর আজই কোথাও চ'লে যাচ্ছে না।" উহাকে বলিতেছিল—"তুমি আগে ভোগ বেড়ে ফেল! বেলা ঢের হ'য়েছে—ছেলে বুড়ো সব ছট্ ফট্ করছে, এখন কি দাঁড়াবার সময়?" নিজেও কোমরে আঁচল বাঁধিয়া থালা-বাসন গুছাইয়া দিতেছিল। সেই সময়ে রাধারাণী প্রভাকে সেই স্থানে লইয়া আসিলেন। মায়া কাজের মধ্যেই একবার একটু থামিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল—"এস দিদি! তোমার ঘর-সংসার সব দেখে শুনে নাও, ভাই,—আমরা ছাড়ান পাই!" প্রভা ভ্রূযুগ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া রাধারাণীর মুখপানে চাহিল। তিনি তাহাকে টানিয়া লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে কাজ সারিয়া মায়া প্রভার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিল। প্রভাবতী উপরের কক্ষে বসিয়া, দুইটা বড় বড় লোহার কাঠি ও সূতার তাল লইয়া কি বুনিতেছিল, মায়াকে দেখিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল—কোন কথা কহিল না। অনভ্যর্থিতা হইয়াও মায়া প্রভার নিকটে বসিয়া

বলিল,—"কাজের ভিড়ে তখন ভাল ক'রে কথা কইতে পারিনি, দিদি!—আস্‌তে তোমার কষ্ট হয়েছে,—একটু শুয়েছিলে ত?"—প্রভা নীরব। মায়া আবার বলিল—"খেতেও অনেক বেলা হ'য়েছিল—আর মাছ-টাছও তেমন ছেল না—খাওয়াও বোধ হয় আজ ভাল হয় নি?" প্রভা কোন কথা কহিল না। "টিপখানি উঠে প'ড়েছে যে!"—বলিয়া মায়া প্রভার কপালের টিপখানি বসাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে হাতটি তুলিতেছিল, প্রভা তাহাকে সে অবসর না দিয়া নিজেই তাহা টিপিয়া বসাইয়া দিল; তাহার পরে হাকিম যেভাবে আসামীকে জিজ্ঞাসা করেন, সেইভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমারই নাম মায়া?"—"হ্যাঁ দিদি।"—"কতদিন এ-বাড়ীতে আছ?"—"তা প্রায় তিন চার বছর হবে"—"বরাবর থাক্‌বে ত?"—"ইচ্ছে ত তাই—তারপর অন্নজলের বরাত!"—"তা ভাল ক'রে কাজকম্ম কর্‌তে পার্‌লেই থাক্‌বে—রূপ দেখে ত আর কেউ লোক রাখ্‌বে না।"—মায়া নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তা বই কি, দিদি।" - "সব রকম রাঁধ্‌তে জান?"—"মেয়েমানুষ,রাঁধ্‌তে জানি না—কি ক'রে বল্‌ব? জানি অমনি কত মত।"—"তোমার সোয়ামী আছে, তবে পরের বাড়ীতে রাঁধ্‌তে বেরিয়েছ কেন?"—"সে অনেক কথা ভাই—বল্‌ব তখন একদিন"—বলিয়া মায়া আবার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। "আচ্ছা এখন কাজকম্ম করগে যাও—দরকার হ'লে ডেকে পাঠাব তখন"—বলিয়া প্রভা সূচি-কার্যে মনোনিবেশ করিল। মায়া কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল।

মায়ার ফিরিয়া আসিবার পথে মঙ্গলা দাঁড়াইয়া ছিল! সে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন দেখে শুনে এলে, দিদিমণি?" মঙ্গলার মুখপানে চাহিয়া, একটু হাসিয়া মায়া বলিল—"কেন—বেশ ত!" বৃদ্ধা ঠোঁট টিপিয়া হাসিয়া

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"র'সো, এই ত কলির সন্ধ্যে, দিদ্বিমণি! ভিটেতে সবে মাত্তর্ এই পা দিয়েছেন বই ত নয়, দু'দিন যেতে দাও—কতরকম দেখ্‌বে তখন!" মায়া সে কথার কোন উত্তর করিল না—নিজের কার্য্যে চলিয়া গেল।

মায়া উঠিয়া আসিবার পরেই প্রভা সূতার তাল ও কাঠি ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি আর্শিখানা লইয়া নিজের মুখখানিকে দেখিতে লাগিল। মায়ার তুলনায় নিজের মুখখানাকে বোধ হয় তাহার ভাল মনে হয় নাই! অনেকক্ষণ ধরিয়া আর্শিখানাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, একবার নিকটে একবার দূরে রাখিয়া, মুখখানিকে অনেকরকম করিয়া দেখিয়া, শেষে—"দূর হ! আর্শির কাঁচখানা মোটেই ভাল নয়—মুখ ভাল দেখায় না"—বলিয়া, রাগ করিয়া সেখানাকে রাখিয়া দিল। অমর সেই সময়ে বেড়াইতে যাইবার জন্য জামা-কাপড় বদলাইতে আসিয়া বলিল,—"কেমন, এখানে মন টিক্‌বে ত, প্রভা?"

প্রভা কক্ষতল হইতে সূচিকার্য্যের সরঞ্জাম উঠাইয়া লইয়া বলিল—"তা এখন কি ক'রে বল্‌ব।"

"কেন, এখানে ত আর সঙ্গীর অভাব বল্‌তে পার্‌বে না?"

"ইস্ সঙ্গী ত ভারি—যত বুড়ীর দল! থাক্‌বার মধ্যে শুধু মা বই ত না!"

"আর কেউ নেই?"

"আবার কে—ঐ রাঁধুনী ছুঁড়ী?—পোড়া কপাল আর কি!"

"রাঁধুনী তোমাকে কে ব'লেছে, প্রভা? দাদামশায়ের আত্মীয়ের মেয়ে—তা জান না বুঝি?"

"হ্যাঁ গো—খুব আত্মীয়, শুনেছি সব মা'র মুখে; আত্মীয় যদি, তবে রাঁধে কেন?"

অমর চুল ফিরাইতে ফিরাইতে বলিল—"আত্মীয় হ'লে বুঝি তা'কে রাঁধ্‌তে নেই? তোমাদের বড়লোকের ঘরের কথা বল্‌তে পারি না, আমাদের গৃহস্থের ঘরে ত স্ত্রী, ভগিনী বা মা—এরাই রাঁধে; পেশাদারী রান্না আমাদের গরিবদের মুখে ভাল লাগে না।"

"আমাকেও কি তোমাদের বাড়ীতে এসে হাঁড়ি ধর্‌তে হবে না কি? আমি তা পার্‌ব না কিন্তু, আগে থাক্‌তে ব'লে রাখ্‌ছি; আমাদের কেউ কখন রান্নাঘর মাড়ায় না—বামুনে ঘরে ভাত ব'য়ে দিয়ে যায়।"

অমর একটা পাণ মুখে দিয়া হাসিতে হাসিতে—"আচ্ছা, আমি এই দাদামশায়কে বলি গিয়ে যে, কাল থেকে তিনি তোমারও রাঁধ্‌বার একটা পালা ক'রে দেবেন"—বলিয়া বাহিরে আসিল। প্রভার আর সকল কথার মধ্যে "শুনেছি সব মা'র মুখে" এই কথাগুলি তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। "প্রভা বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই মা তাকে এসব কথা বল্‌তে গেলেন কেন?"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে চলিয়া গেল। রাধারাণী যে কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার চেষ্টায় আছেন, অমর তাহা বুঝিতে পারিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিগ্রহের সূত্রপাত।

সীতানাথ তাঁহার প্রিয়পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতিকল্পে কয়েকটি নূতন ব্যাপারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অমরেরও তাহাতে খুব উৎসাহ; সে তাঁহার সঙ্কল্পিত ব্যাপারের সিদ্ধি-সম্পাদনে যথাসাধ্য যত্ন করিতেছিল। অমরের আগমনে গোবর্দ্ধন ও মাধাইয়েরও উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়াছিল। তারাচাঁদ তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর।

সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য-পালনে তৎপর থাকিয়া পরস্পরের সুখস্বচ্ছন্দবিধানে যত্ন করিতেছিল। সংসার বেশ নির্ব্বিবাদে নির্ব্বিঘ্নে সুশৃঙ্খলায় চলিতেছিল। সেই শান্তির মধ্যে রাধারাণী তাঁহার হৃদ্‌গত বিদ্বেষের চরিতার্থতা-সাধনের জন্য একটা অশান্তি সৃষ্টি করিবার উদ্‌যোগ করিতেছিলেন।

নিপুণ কৃষক যেমন উর্ব্বরতাসাধক পদার্থের মিশ্রণ ও কর্ষণাদি দ্বারা ক্ষেত্রকে শস্যোৎপাদনক্ষম করিয়া লইয়া তাহাতে বীজবপন করিয়া থাকে, রাধারাণীও সেইরূপ মৌখিক স্নেহযত্ন ও তোষামোদের জলে প্রভাবতীর মনটিকে ভিজাইয়া, স্বার্থসাধনের অনুকূল করিয়া লইয়া তাহাতে মায়ার প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করিতেছিলেন। প্রথমে—"হাঁ গা! তুমি কেমন মেয়ে বল দেখি? তোমার হ'ল ঘরসংসার, তুমিই হ'লে ঘরের গিন্নী, ও-ছুঁড়ী কোথাকার কে—উড়ে এসে জুড়ে ব'সেছে? বাবার যেমন কাণ্ড! উনিই হলেন সর্ব্বময়ী, ওঁর হাতেই সব, আর তুমি যেন কেউ নও—কোথাথেকে বানের জলে ভেসে এসেছ! ছুঁড়ীর ন্যাকামি শুন্‌লে হাড় জ'লে যায়! তুমি ব'লে সহ্য কর্‌ছ, বাছা! আমি হ'লে দু'দিনে সোজা ক'রে দিতুম।" তৎপরে—"তুমি এ ভাল বুঝ্‌ছ না মা। যদি নিজের ভাল চাও, ত ছুঁড়ীকে সরাবার পথ দেখ! রাঁধুনীর অভাব প'ড়ে গেছে আর কি! ভাত ছড়ালে আবার কাগের অভাব কি গা? কি না—ভাল রাঁধে! এই ত? ভাল রাঁধ্‌তে যেন আর কেউ পারে না! শেষে একটা হৈ চৈ হবে, তার চেয়ে এইবেলা সাবধান হওয়াই ভাল নয়?" ক্রমে—"ছুঁড়ীর কাণ্ড কি গো! অমর যেন আমার তেমন নয়, কিন্তু বলা যায় কি গা—এ-কালের ছেলে ত? বলে—মুনির মন টলে, মানুষ ত কোন্ ছার! লোকের সামনে কলা-বউয়ের মত মুখে একহাত ঘোমটা টেনে রাখা হয়! ঘোমটার ভেতর খেম্‌টা-নাচ কেউ যেন দেখ্‌তে পায়

না।। আড়ালে কত রঙ্-তামাসা, হাসি-ঠাট্টা চলে, আবার মঙ্গলাকে শিখণ্ডী খাড়া ক'রে কথার বাণ ছোঁড়া হয়—'বল্ না মঙ্গলা! শোন্ না মঙ্গলা!'—সইতে পারি না বাছা! আমার গা কশ্ কশ্ করে! কি কর্‌ব, বাবার পেয়ারের রাঁধুনী, কিছু বল্‌তে পারি না। তুমি ভয় কর্‌বে কেন গা?" ইত্যাদি অশেষপ্রকার স্পষ্ট ও অস্পষ্ট কথায় ও ইঙ্গিতে তিনি প্রভাবতীকে মায়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন। তাহার ফলে এই হইয়াছিল যে, অমর কোন কথার প্রসঙ্গে মায়াবতীর উল্লেখ করিলেই প্রভা জ্বলিয়া উঠিত এবং সীতানাথকে সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও প্রত্যহ মায়ার বিরুদ্ধে দশটা মামলার নিষ্পত্তি করিতে হইত। সে মকদ্দমায় রাধারাণী, উকীল ও সাক্ষী উভয়ই। সীতানাথ কিন্তু উকীলের বক্তৃতা বা সাক্ষীর জবানবন্দী শুনিতেন না, বাদিনী ও প্রতিবাদিনীকে তলপও করিতেন না; একতরফা ডিক্রী দিতেন বা ডিস্‌মিস্ করিতেন। তিনি প্রভাকে বলিতেন, "লক্ষ্মী দিদি আমার! পরের উপরে রাগ কর্‌তে আছে কি? ও কোথাকার কে? তোমার ঘর, তোমার সংসার! তাড়িয়ে দিলেই যা'কে চ'লে যেতে হবে, তা'র সঙ্গে বচসা করা কি তোমার ভাল দেখায়?" আর মায়াকে বলিতেন, "প্রভার কথায় তুমি কিছু মনে ক'রো না, দিদি! ওটা পাগল; ওর ঘটে বুদ্ধি নেই—পরের কথায় নেচে মরে। তোমাকে আমি যেদিন কিছু বল্‌ব বা অমর যেদিন কিছু বল্‌বে, সেইদিন দুঃখ কর্‌তে পার।" মায়া চুপ করিয়াই থাকে, কখন হাসিতে হাসিতে বলে—"আমি যদি কোন কথা গায়ে মাখ্‌তুম দাদামশায়! তা হ'লে সংসারে দিনরাত রাবণের চুলী জ্বল্‌ত।"

সীতানাথ জানিতেন, খিট্ খিট্ করাটা প্রভার স্বভাব, সে নিজের দোষে খুটিনাটি লইয়া মায়ার সঙ্গে ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা করে; আর রাধারাণীও স্বভাবের দোষে প্রভার সঙ্গে যোগদান করেন। মায়ার গুণে তিনি

তাহাকে সকলের অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিয়া থাকেন। শুধু স্নেহ নহে—তিনি বেশ জানিতেন যে, মায়া না থাকিলে তাঁহার সংসার এমন সুশৃঙ্খলায় চলিবে না; অথচ প্রভাকেও কিছু বলিতে পারেন না। তিনি উভয় দিক্ বজায় রাখিতেই চেষ্টা করিয়া থাকেন; কিন্তু ব্রজ-গোপীদের সেই 'শ্যাম' ও 'কুল' দুইই রাখার মত তাঁহারও এই উভয় দিক্ রক্ষা করা ক্রমে কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাতে তিনি শুধু চিন্তিত নহে, একটু বিষণ্ণও হইলেন।

অমর এ-সকলের কিছুই জানিত না। সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। চিকিৎসায় তাহার বেশ যশ হইয়াছে। সীতানাথের আদেশ—"যাহারা সমর্থ ও স্বেচ্ছায় দিতে প্রস্তুত, কেবল তাহাদেরই নিকট হইতে 'ভিজিট্' লইবে, বাকী সকলকে বিনা-'ভিজিটে'—ঔষধের মূল্য পর্য্যন্ত না লইয়াই চিকিৎসা করিবে!" কিন্তু ফাঁকি দিয়া সারিতে পারিলে কে টাকা বাহির করিতে চাহে? সুতরাং উপার্জ্জন না থাকিলেও অমরের কাজের অভাব ছিল না। তাহার স্নান বা আহারের নির্দ্ধারিত সময় নাই। একদিন প্রভাতে বাহির হইয়া, অমর অপরাহ্নে বাড়ী ফিরিয়া নিজ কক্ষে বহির্বাস ত্যাগ করিতে আসিয়া দেখিল, তাহার কাপড়গুলি আলনায় বেশ গুছান রহিয়াছে। সেগুলি প্রায়ই ধোপার বাড়ী যাইবার মত—জামা কাপড়ে মিশান, একটা গাদী হইয়া থাকিত। সেগুলির গোছ দেখিয়া অমর জিজ্ঞাসা করিল—"কাপড়গুলি আজ যে বেশ গুছান দেখ্ছি, প্রভা! মা গুছিয়ে গেছেন বুঝি?" প্রভা খাটের উপরে পা ঝুলাইয়া বসিয়া উলের কি একটা বুনিতেছিল; বলিল—"হ্যাঁ, মায়ের ভারি গরজ—তাঁর ঐ কাজ কিনা!"—"তবে কি মঙ্গলার দৃষ্টি প'ড়েছে?"—"তা'র দায় পড়েছে!"—"তবে কি তোমার ঘরকন্নায় মন পড়্ল নাকি?"—"আমাদের বাড়ীতে দাসী-চাকরেরই ওসব কাজ ক'রে থাকে,

আমরা অমন কারু ছাড়া-কাপড় গুছতে যাই না।”—“তবে এ-কাজ কা'র প্রভা?”—“আহা! যেন ন্যাকা— জানেন না আর কি!”—বলিয়া প্রভা মুখ ঘুরাইল। অমর হাসিয়া বলিল—“কি ক'রে জান্‌ব—আমি ত ঘরে ছিলাম না যে দেখেছি; সকালে উঠে বেরিয়ে গেছি, আর এই ফিরে আস্‌ছি।” প্রভা রুক্ষস্বরে বলিল—“তোমার দাদামশায়ের পেয়ারের রাঁধুনী-ঠাক্‌রুণ গো—আবার কে? মুখে আগুন! কা'র ঘরই যে গুছিয়ে মরেন, তা'র ঠিকেনা নেই!”

মায়াবতী সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও আসিয়া তাহার কাপড়গুলি গুছাইয়া গিয়াছে—শুনিয়া অমর একটু লজ্জিত হইল, আপনার প্রতি অপরিচিতার এই অযাচিত যত্নের পরিচয়ে একটু প্রীতও হইল; এবং প্রিয়চিকীর্ষার প্রতিদানে তাহার প্রতি প্রভার উক্তরূপ কঠোর উক্তিতে একটু বিরক্তও হইল।

আহারের নিয়মিত একটা সময় নাই বলিয়া অমরের অন্নব্যঞ্জন ঘরের একপাশে ঢাকা দেওয়া থাকিত। ভোজনে বসিয়া অমর বলিল—“তিনি যা কিছু করেন, সে সমস্তই তোমার কাজ তা জান ত? তোমার কাজগুলি যে ক'রে দেয়, তা'র প্রতি একটু কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক্‌, দু'টো ভাল কথাও বল্‌তে পার না প্রভা?”

প্রভা চটিয়া উঠিয়া বলিল—“সে আমার কি কাজটা করে শুনি? ভাতটা কখন কখন ঘরে বয়ে দিয়ে যায়—এই ত? তা না হয় না দেবে! সে না দেয়, আর দশজন রয়েছে ত? সেই জন্যে তা'র কেনা হ'য়ে থাক্‌তে হবে না কি?”

“না, প্রভা! তাঁর প্রতি তোমার এ-রকম ভাবটা ভাল নয়—ছি! বাড়ীর সকলেই তাঁর সুখ্যাতি করে, তাঁকে ভালবাসে—শুন্‌তে পাই, কেবল তুমি তাঁকে দেখ্‌তে পার না—তাঁর নামে জ্বলে যাও! কেন বল দেখি?”

"তা'তে আর তা'র ক্ষেতিটা কি? যা'রা দেখ্‌তে না পার্‌লে ক্ষেতি আছে, তা'রা পার্‌লেই হ'ল—তা'রা পারে ত?"—বলিয়া প্রভা শয়ন করিল; আর কোন কথা কহিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিগ্রহের বৃদ্ধি।

নীল আকাশ নির্ম্মল—সৌরকরোদ্ভাসিত। দিক্ সকল প্রসন্ন। বায়ু মৃদু মন্দ বহিয়া আনন্দ ও স্নিগ্ধতা বিতরণ করিতেছে। সহসা দিগন্তের নিম্নান্তরাল হইতে যদি কাল-বৈশাখীর একখানা মেঘ ঠেলিয়া উঠিল, তবে আর প্রকৃতির সে শান্ত শোভা দেখিতে পাইবে না। দেখিতে দেখিতে সেই মেঘ ফুলিয়া উঠিয়া গগনের স্নিগ্ধ নীলিমাকে ধূমল বিতানে ঢাকিয়া দিবে। রবিরশ্মি অন্তর্হিত হইবে। বায়ু মৃদুগতি ছাড়িয়া প্রচণ্ডবেগে বহিতে আরম্ভ করিবে। মেঘমন্দ্রে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত ও কম্পিত হইতে থাকিবে। সুষমাময়ী সেই শান্তা প্রকৃতি নিমেষের মধ্যে ঘনঘোরা ও ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিবে। প্রকৃতি লীলাময়ী! প্রভার প্রকৃতিও অনেকটা সেই ধরণের। সে এই বেশ কথা কহিতেছে, হাসিতেছে; কিন্তু যদি কোন রকমে মায়ার প্রসঙ্গ উঠিল, তবে আর তাহার সে শান্তভাব থাকিবে না। তাহার হাসি নিবিয়া যাইবে, মুখ অন্ধকার হইবে, তাহার উচিত-অনুচিত, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য ও বক্তব্য-অবক্তব্যের বোধ তিরোহিত হইবে। সে ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া উঠিবে।

রাত্রি গভীর ও নিস্তব্ধ। দিবসের শ্রমসাধ্য কার্য্যে পরিশ্রান্ত অমর ঘুমাইতেছে। প্রভা শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে। এক-শয্যায় একজন যদি জাগিয়া ছট্‌ফট্‌ করে, তবে অন্যজন নিদ্রাতুর

হইলেও তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। প্রভার অস্থিরতায় অমরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার ঘুম আস্‌ছে না, প্রভা?" প্রভা বসিয়া বলিল—"যে বিছানা, এতে মানুষের ঘুম হয়? গদীখানা যে কতকালের পুরণো, তা'র ঠিকানা নেই—শক্ত একবারে হাড় হ'য়ে গেছে! বিছানার চাদরখানা কতকাল ধোপে যায় নি—কালো কুট্‌কুটে আর দুর্গন্ধে ভরা! কি ক'রে তোমার ঘুম হয়—জানি না"!—"সে কি প্রভা! গদীখানা এই সেদিন—তোমার আস্‌বার দু'চারদিন আগে দাদামশায় নূতন ক'রে করালেন! চাদরখানাও—আমি নিজে দেখেছি, মোটে আজ পাতা হয়েছে; তবু তুমি এই রকম বল্‌বে, তা কি বল্‌ব বল!"—"তা হবে! উড়ে-ধোপায় তোমাদের কাপড় কাচে বুঝি?"—"পাড়াগাঁয়ে উড়ে ধোপা কোথা থেকে আস্‌বে প্রভা? তবে বাহান্ন পুরুষ পূর্ব্বে যদি এদের কেউ উড়িষ্যে থেকে এসে এইখানে বাস ক'রে থাকে, ত তা বল্‌তে পারি না।—কেন বল দেখি?"—"উড়ে-ধোপার কাচার মত একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছ না? আমাদের সেখানে ঝিগুলো ফর্‌সা কাপড় প'রে এলে, এই রকম গন্ধ বেরুত।"—"কৈ আমি ত কিছু পাচ্ছিনা? আমার তা হ'লে হয় ত সর্দ্দী হ'য়ে থাক্‌বে।"—বলিয়া অমর পাশ ফিরিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল।

অল্পক্ষণ পরেই আবার খুব বিরক্তি-সূচক একটা—"আঃ! দূর হ! ছাই"—শব্দে অমরের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"আবার কি হ'ল প্রভা?"—"দেখ না! মশারিটা খালি-খালি গায়ে মুখে এসে ঠেক্‌বে!" অমর একটু হাসিয়া বলিল—"মধ্যে তিনহাত বিছানা প'ড়ে র'য়েছে, তবু তুমি অত মশারি ঘেঁসে শুয়েছ কেন?"—"স'রে শুয়েও দেখেছি—মশারিটার কেমন গায়ে পড়া রোগ"—"আচ্ছা আমি ওর সে রোগটা বোধ হয় সারিয়ে দিতে পারি—তুমি একটু স'রে শোও দেখি!"

অমর একটা পাশ-বালিশ লইয়া মশারির কিনারা 'চাপিয়া রাখিল। তাহাতেও নিস্তার নাই ; কিছুক্ষণ পরেই আবার—"বাবা! দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছে—একি মশারি? যেন জাহাজের পাল! জল গলে না—বাতাস সেঁধুবে কি!"—"এর চেয়েও পাতলা 'নেট'এর কাপড় বোধ হয় তাঁতির তাঁতে বোনা হয় না, প্রভা! তুমি কাল দাদামশায়কে ব'লো—তিনি গোটাকতক মাকড়সা লাগিয়ে তোমার জন্যে একখান মশারির জাল বুনিয়ে নেবেন।"—"আচ্ছা, তোমার সব কথাতেই রহাস্যি! এর চেয়ে পাতলা কাপড় হয় না? দেখ নি, তাই ব'লছ।" অমর কোন কথা কহিল না—চুপ করিয়া রহিল। তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই! "বাবা! কি ক'রে মানুষ এমন বিছানায় এত ঘুমোয়, তা জানি না!" অমর হাসিয়া বলিল—"ঘুমের ওষুধ আছে প্রভা! তা'তে আর বিছানার ভাল মন্দ বাছ্‌তে হয় না।"—"কি ওষুধ—আমাকে এক শিশি দেবে?"—"সে শিশিতে ক'রে দেবার মত নয়; ঘুমের ওষুধ হচ্ছে—ভোরে ওঠা, দিনে না ঘুমন, আর একটু আধটু পরিশ্রম করা। তুমি উঠ্‌বে বেলা ন'টায়, আর দিনে ঘুমবে বেলা পাঁচটা ছ'টা পর্য্যন্ত ; তা'র ওপর গাটি নাড়্‌বে না! তা'তে কি আর রাত্রে ঘুম হয়?"—"তাই ত! আমি গা নাড়ি না, আমার কাজগুলো আর পাঁচ জনে ক'রে দেয়!"—"তোমার আবার কাজ কি? কখন একটু উল বোনা, না হয় ত এক আধ পাতা গল্পের বই পড়া—এই ত?"—"তা বই কি, পরে এসে আমার হ'য়ে মুখ ধোয়, নায়, কাপড় কাচে, খায়, আর আমি শুধু ব'সে থাকি।"—"ওহো! এই কাজগুলো? তা এ-সব যদি পরে ক'রে দিলে চলে, ত না হয় দাদামশায়কে ব'লো তিনি তোমার জন্যে আর একটা দাসীর বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন!"—"যাও যাও আর মিছে বকো কেন? দাদামশায় আমার জন্যে ক'টা দাসী রেখে দিয়েছেন যে, বল্‌ছ? এই ত

একটা বুড়ী মাগী আছে ; মাগীর যেমন চেহারা, তেমনি কাজ ! আমাদের বাড়ী হ'লে কোন্ দিন দূর ক'রে দিতুম।"—"তোমাদের বাড়ীর দাসীদেরও ত দেখেছি প্রভা ! তারাও যে ইন্দ্রের সভা থেকে নেমে এসেছে, তা' ত মনে হয় না ? তবে তা'রা কল্‌কেতার ঝি—কাজকর্ম্মে যাই হ'ক, কথা অনেক জানে বটে। তা এখানের ঝি পছন্দ না হয়, তোমার বাপের বাড়ীরই একজনকে আনিয়ে নাও !"—"কেন বল দেখি ? বাপের বাড়ী থেকে ঝি আনিয়ে এখানে থাক্‌তে হবে ? এখানে সুখ ত ভারি, কথা কই এমন একটা মনিষ্যি নেই।"—"এত লোকের মধ্যেও তুমি একা কেন, তা জান প্রভা ?—কারুকে তোমার পছন্দ হয় না ; কারু কথা বা কাজ তোমার মনে ধরে না। বাড়ীতে এই ত এত লোক রয়েছে, তা'রা ত কেউ আপনাকে তোমার মত এত অসুখী মনে করে না ! তবু তা'রা পরের বাড়ীতে রয়েছে, আর এ তোমার নিজের ঘর। তবে বল্‌তে পার যে, তা'রা গরিব গৃহস্থের ঝি-বউ, আর তুমি বড়মানুষের মেয়ে।"—"থাম গো ! আর কথা শোনাতে হবে না ! আর যদি কখন কিছু বলি, ত আমাকে অতি বড় দিব্বি রইল। পুরুষের মুখে এত মেয়ে-কুচুটে কথা কখন শুনিনি !—শাশুড়ী-ননদের বাড়া !"—"রাগ ক'রো না, প্রভা ! তোমার বয়সে কত মেয়ে কত বড় বড় সংসারের ভার নিয়ে চালাচ্ছে ! তাও ত দেখ্‌তে পাচ্ছ ? আর তুমি -"

অমরকে কথা শেষ করিতে হইল না। সে মায়াকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত কথাগুলি বলিয়াছিল। তাহাতে প্রভার রক্ত একবারে গরম হইয়া যেন ফুটিয়া উঠিল। "চুপ ক'রে থাক বল্‌ছি, আমার সঙ্গে আর ঐ ছুঁড়ীর তুলনা দিতে হবে না ! তা'র সবই তোমার কাছে ভাল, আর আমার সবই মন্দ"—বলিয়া, রাধারাণীর বিদ্বেষপ্রণোদিত মিথ্যা বচনে তাহার হৃদয়ে যে অমূলক সংশয় বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহার প্রেরণায়

মায়া ও অমরের চরিত্র সম্বন্ধে কতকগুলা অশ্রাব্য, অকথ্য, যা-নয়-তাই, কুৎসিত মিথ্যার উদ্ভাবন করিয়া অসঙ্কোচে তাহাই বলিতে আরম্ভ করিল। সে ঈর্ষা-উদ্দীপিত ক্রোধে অধীরা হইয়া, উন্মত্তার ন্যায় যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া, তাহার সুচির-সঞ্চিত বিদ্বেষ-বিষ উদ্‌গীরণ করিল। অমর একটি কথাও না কহিয়া, স্তব্ধভাবে বসিয়া সমস্ত শুনিল। প্রভা পরিশ্রান্তা হইয়া নীরব হইবার পরেও কিছুক্ষণ সে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল; তাহার পরে তীব্রস্বরে বলিল—"কি বল্‌লে প্রভা?—মায়ার সঙ্গে আমি আড়ালে আড়ালে হাস্য-পরিহাস করি?"

কথাগুলা যে রাত্রিকালে শয়ন-কক্ষে থাকিয়া স্বামীর সঙ্গে হইতেছে —প্রভা রাগে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল— "কর কি না মনে ক'রে দেখ! শুধু আমার একার কথা নয়—বাড়ীর সবাই জানে, মা নিজের চোকে দেখেছেন। আবার মুখসাপট! লজ্জা করে না? চুপটি ক'রে থাকি ব'লে বুঝি? রাত পোহালেই আমি দাদামশায়কে সব কথা ব'লে এর একটা হেস্ত নেস্ত কর্‌ব, তবে ছাড়্‌ব। হয় তিনি ছুঁড়ীকে কালই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিন, না হয় ত আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন—আমি এখানে থাক্‌তে চাই না।"

অমর গম্ভীরভাবে দৃঢ়স্বরে বলিল—"প্রভা! তুমি রাগে পাগল হ'য়ে উঠেছ—কি বল্‌ছ তা বুঝ্‌তে পার্‌ছ না! মা বা বাড়ীর আর কেউ কি দেখেছেন তা জানি না, তোমার এই কথাও যে কতদূর সত্য, তাও বল্‌তে পারি না! সত্য সত্যই যদি কেউ তোমাকে এ-সম্বন্ধে কিছু ব'লে থাকে, তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে, যা'রা তোমাকে এইসব মিথ্যা কথা শুনিয়েছে, তা'রা তোমার হিতৈষী নয়—তোমার ভয়ানক শত্রু; তা'দের কথায় বিশ্বাস ক'রো না!"

প্রভা। যা' সত্যি, তা' আবার কে না বল্‌বে? আমি নিজেও কি কিছু দেখিনি, না বুঝ্‌তে পারি না—আমি খুকীটি নাকি?

অমর। তুমি যদি স্বচক্ষেও কিছু দেখে থাক, তবু মনে কর যে, তুমি ভুল দেখেছ প্রভা!—তোমার দৃষ্টির তখন বিকার ঘ'টেছিল। মায়া ব'লে একটি মেয়ে আমাদের বাড়ীতে এসে আছেন—শুনেছি; দাদা-মশায়ের মুখে—আরও পাঁচজনের মুখে, মাঝে মাঝে তাঁর সুখ্যাতি শুন্‌তে পাই। কিন্তু তিনি কেমন—কাল কি গোরো, সুন্দর কি কুৎসিত, তা আজ পর্য্যন্ত কখন চোখে দেখিনি—তাঁর কণ্ঠস্বর আজ পর্য্যন্ত কখন আমার কাণে প্রবেশ করেনি। এ কথা সত্য কি মিথ্যা, তা যিনি সর্ব্বসাক্ষী দেবতা—তিনিই জানেন! একথা আমি নিজের চরিত্র-দোষ ঢাকা দেবার জন্যে বল্‌ছি না; তুমি দাদামশায়কে ব'লে দেবে, সেই ভয়ে বা লজ্জাতেও বল্‌ছি না। একজন সম্পূর্ণ নিরপরাধ, অসহায় অবলার অকলঙ্ক, পবিত্র চরিত্রের সঙ্গে এ পাপ-কথার সংস্রব আছে ব'লেই বল্‌ছি, সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্যেই বল্‌ছি! সত্য হ'ক, বা মিথ্যা হ'ক, তুমি লজ্জার মাথা খেয়ে এইসব কুৎসিত, অশ্রাব্য কথাগুলো যে কি ক'রে মুখ দিয়ে বা'র করলে, তা বুঝ্‌তে পারি না! এ রকমের কথা নীচ জাতির স্ত্রীলোকের মুখেই শোভা পায়। এসব কথা যারা এমন অনায়াসে মুখ দিয়ে বা'র করতে পারে, যে বংশে তাদের জন্ম হয়েছে, সেটাকে ভদ্র বল্‌তেও যেন ঘৃণা হয়! দাদামশায়ের কাছে তুমি এইসব কুৎসিত কথা কি ক'রে বল্‌বে তা বুঝ্‌তে পারি না! হয় ত তুমি তাও পারবে; কিন্তু মনে ক'রো না যে, তিনি এই সব কথা শুন্‌বেন বা শুনে বিশ্বাস করবেন। তিনি আমাকে এতটুকুবেলা থেকে দেখে আস্‌ছেন,—হাতে গ'ড়ে মানুষ ক'রেছেন, ভালমতেই জানেন। আর যে ভদ্রকন্যার কথা বলছ, তাঁরও চরিত্র ভাল রকম

না জেনে শুনে তিনি তাঁকে বাড়ীতে স্থান দেননি—এত লোক থাক্‌তে তাঁর ওপরে এত বড় সংসারের ভার দিয়ে রাখেন নি। মনে ক'রো না যে, তিনি শুধু তোমার কথা শুনেই আমাকে অবিশ্বাস কর্‌বেন, বা তোমাকে জোর ক'রে স্বামিঘর ভাল লাগাবার জন্যে আশ্রিতাকে নিরপরাধে আশ্রয়চ্যুত কর্‌বেন। বল্‌লে এই হবে যে, সকলের কাছে তোমারই নীচতা আর নির্ব্বুদ্ধিতার কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌বে।

প্রভা রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিল—"তা'কে না তাড়ান, নেই নেই—তিনি তা'কে দিয়ে ঠাকুরের ভোগ রাঁধান, নিজে খান, সবাইকে খাওয়ান! আমার কি?—আমি কালই বাপের বাড়ী চ'লে যাব—আমি এখানে থাকৃতে চাই না।"

অমর রাগের হাসি হাসিয়া বলিল—"তবেই গোকুল আঁধার হয়ে যাবে! তুমি কি মনে কর যে, তোমার বাপের পয়সা আছে বা তোমার রূপ আছে ব'লে আমি তোমার পদানত হ'য়ে থাক্‌ব? বিধাতা সে ধাতুতে আমাকে গড়েননি। তোমার যখন ইচ্ছে চ'লে যেতে পার, গিয়ে যতদিন ইচ্ছে থাক্‌তেও পার! কখন তোমার সঙ্গে আমার মনের মিল হয় নি—কখন হবেও না। এ কথা এতদিন আমার মনে মনেই ছিল; তুমি জান্‌তে পারনি—কখন পার্‌তেও না! আজ তুমিই আমাকে এ-কথা বল্‌তে বাধ্য কর্‌লে। আমিও বল্‌ছি—আমি আর এ-জীবনে তোমার মুখ দেখ্‌ব না।"

অমর রাগভরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একেবারে দীঘির ঘাটে আসিয়া বসিল। প্রভা শয্যাপ্রান্তে বসিয়া চোখের জলে আঁচল ভিজাইতে লাগিল। তাহাদের কথা-বার্ত্তা নিতান্ত চুপে চুপে হয় নাই। রাগের কথা ভয়ে বা সরমে চুপে চুপে বাহির হয় না। তাহাদের কথা-বার্ত্তা শুনিবার জন্য রাধারাণী জানালার পাশে আড়ি পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

অমর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই তিনি সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সান্ত্বনার ছলে প্রভার মনের আগুনে উত্তেজনার বাতাস দিয়া তাহা বাড়াইয়া দিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিগ্রহের শাস্তি।

প্রভাত হইতে না হইতেই বিশ্রাম-কুটিরে বসিয়া, সীতানাথ অন্তঃপুরের বৃদ্ধা দূতী মঙ্গলার লাঠির ঠুক্ ঠুক্ শব্দ শুনিয়া চমকিত হইলেন। বাতে পঙ্গু মঙ্গলা যে সামান্য কারণে এত প্রত্যূষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া এই শৈল-আরোহণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তিনি তাহা মনে করিতে পারিলেন না। মঙ্গলা আসিয়া তাঁহাকে একবার বাড়ীর ভিতরে যাইতে বলিল—কি জন্য তাহা বলিল না। তিনি আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন; তাহা শেষ না করিয়াই সমুদ্বিগ্নচিত্তে তখনই গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

সীতানাথ অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন, গৃহ-চত্বরে পুরবাসিনীগণ জনতা করিয়াছেন। প্রভা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়াছে, এবং রক্তবর্ণ চোখদুইটিকে মাঝে মাঝে আঁচল দিয়া মুছিতেছে। রাধারাণী হাঁকিয়া হাঁকিয়া যাহা বলিতেছেন, তাহার অর্থ সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও, যাহা ঘটিয়াছে, সীতানাথ অনুমানে তাহার কতকটা বুঝিতে পারিলেন। পুরাঙ্গনাগণ সকলেই সেখানে উপস্থিত, কেবল মায়া নাই; আর মঙ্গলা তখনও উপস্থিত হইতে পারে নাই। তিনি রাধারাণীকে ডাকিয়া, ব্যাপারটা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা অল্প কথায় বলিতে বলিলেন। রাধারাণীর দুই চারিটা কথা শুনিয়াই গম্ভীরভাবে—"থাক্, আর

কিছু বল্‌তে হবে না—আমি সব বুঝেছি”—বলিয়া, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রভা রুদ্রমূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল—“হয় ও-ছুঁড়ীকে বাড়ী থেকে এখনি তাড়িয়ে দিন, নয় ত কারুকে পাল্কী ডেকে দিতে বলুন! আমি বাপের বাড়ী চ’লে যাই। আমার বাপের ঘরবাড়ী আছে—ভাত আছে—”

রাধারাণী প্রভার উক্তির পোষকতা করিয়া বলিলেন—“তাই ত, যা’দের কোন চুলোয় ঠাঁই নেই, তা’রাই নাথি-ঝাঁ্যাটা খেয়েও প’ড়ে থাকবে; ওর রাজা বাপ, ও কিজন্যে কারু কথা সইবে বাবু? আর শুধু কি কথা! শুন্‌লে না ত সব”—বলিয়া তিনি পুনশ্চ সেই সব কুৎসিত কথার অবতারণা করিতে উদ্যত হইলেন। সীতানাথ বাধা দিয়া বলিলেন—“তুমি চুপ কর, রাধা! যা বল্‌তে হয় আমি বল্‌ছি”—তাহার পর প্রভাকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন—“স্থির হও, প্রভা! এতটা উতলা হ’তে আছে কি? বাপ যদি রাজাও হন, আর স্বামী যদি দরিদ্র বা ভিক্ষুকও হয়, তবু বাপের অট্টালিকায় সুখভোগের অপেক্ষা স্বামীর কুটিরে দুঃখভোগই স্ত্রীজাতির বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত। যাঁ’রা সতীসাধ্বী তাঁ’রা রাজভবনের ভোগ-সুখ ত্যাগ ক’রে স্বামীর সঙ্গে বনবাসকেও অধিক সুখের মনে করেন। সতী, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী—এঁ’রা সকলেই তাই করেছিলেন; তাই তাঁ’রা আদর্শ রমণী—তাঁদের নাম কর্‌লেও পুণ্য হয়—”

প্রভা দলিতা ফণিনীর মত মস্তক তুলিয়া, সীতানাথের কথায় বাধা দিয়া তাঁহার মুখের উপরে তীব্রস্বরে বলিল—“আচ্ছা আচ্ছা, আপনাকে কেউ এখানে পুরাণ-মহাভারত আওড়াতে ডেকে আনেনি! আপনার ইচ্ছেটা কি তাই খুলে বলুন! ছুঁড়ীকে বিদেয় ক’রে দেব

ত দিন, নয় ত পাল্কী ডাকাবার ব্যাবস্থা করুন! বেশী কথার দরকার নেই।”

প্রভার কাণ্ড দেখিয়া পুরবাসিনীরা অবাক্ হইয়া পরস্পরে গা-টেপা-টিপি করিতে লাগিলেন। সীতানাথ স্তব্ধ হইয়া, নতমস্তকে বসিয়া, কর্ত্তব্য কি তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কি করিবেন—শ্যাম রাখিবেন কি কুল রাখিবেন, তাহা দেখিবার অপেক্ষায় পুরবাসিনীরা কৌতুকান্বিতা হইয়া, দাঁড়াইয়া রহিলেন। মঙ্গলাও তখন উপস্থিত হইয়াছিল। সে অঙ্গনের এক পাশে দাঁড়াইয়া একবার সীতানাথের, একবার প্রভার, আর এক একবার বক্রদৃষ্টিতে রাধারাণীর মুখপানে চাহিতেছিল।

সীতানাথকে চিন্তাকুল দেখিয়া রাধারাণী বলিলেন—“এর আবার এত ভাব্‌ছ কি, বাবা? সোজা ব্যাবস্থা ত প’ড়ে রয়েছে—এর আর চক্ষু-লজ্জাই বা কিসের? যার যেথা সুবিধে হবে, চ’লে যাবে,—পরের জন্যে ত আর ঘরের লক্ষ্মীকে বিদেয় করা যায় না! আর এই নিয়ে দিন দিন কোঁদল কচ্‌কচিও ভাল নয়—দেখ্‌তে শুন্‌তে সব দিকেই মন্দ। ডেকে বল না! ঐ যে, ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ভাল-মানুষ সেজে ব’সে র’য়েছেন!”

রাধারাণীর অযাচিত পরামর্শে ও অত্যাধিক আত্মীয়তায় একটু অসন্তুষ্ট হইয়া সীতানাথ বলিলেন—“আঃ! রাধা! তুমি একটু থাম মা!”

রাধারাণী যাহার উদ্দেশে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সে নিকটেই ছিল। মায়াবতী আপনাকে এই সমস্ত অকারণ-বিগ্রহের নিমিত্ত বুঝিয়া, এবং আপনার নির্ম্মল চরিত্রে প্রভা কর্ত্তৃক আরোপিত মিথ্যা কলঙ্কের লজ্জায় জড়সড় হইয়া, ঘরের কোণে লুকাইয়া বসিয়া, ঘৃণায়, বিষাদে ও মর্ম্মব্যথায় অশ্রু বর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণীর কথা শুনিয়া,

সে অশ্রু মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে লজ্জাজড়িতচরণে বাহিরে আসিল। সীতানাথ তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, তাহাতে বিষাদের একটা ছায়া পড়িয়াছে, এবং সেই ছায়ার অভ্যন্তর হইতে যথা ফানসের আলোর মত, আন্তরিক পবিত্রতা ও অবিকার্য্য ধর্ম্মনিষ্ঠার একটা জ্যোতিঃ যেন ফুটিয়া উঠিতেছে! তাহার মুখের ভাবে রাগ বা উত্তেজনার লেশ-মাত্রও লক্ষিত হইতেছিল না। সীতানাথ পুনর্ব্বার মুখ নত করিয়া নীরবে অবস্থান করিলেন। তখনও, বোধ হয়, তিনি কর্ত্তব্য-অবধারণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মায়া ধরানিবদ্ধদৃষ্টিতে তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল—"মা ত ঠিকই ব'লেছেন, দাদামশায়! এর আর আপনি এত ভাব্‌ছেন কি? আপনার মুখ দেখে মনে হয়, যেন আমাকে আশ্রয় দিয়ে আপনি ভারি একটা মুস্কিলেই প'ড়েছেন—মুখ ফুটে আমাকে চ'লে যেতে বল্‌তে পার্‌ছেন না! বল্‌তেই বা হবে কেন? আমি নিজেই যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে র'য়েছি, শুধু আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে ট্যাকা কড়ির একটা হিসেব নিকেশ দেবার অপেক্ষায় আছি। এ-মাসে আপনি যা দিয়েছেন, সব মজুত আছে! ও-মাসের যা বেঁচেছিল, তা'তেই এ ক'দিন চ'লে গেছে।" এই কথা বলিয়া মায়া একটা চাবির থোলো সীতানাথের পায়ের কাছে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

সীতানাথ বিষণ্ণমুখে বলিলেন—"কোথা যাবে, মায়া?"

"তা এখন কি ক'রে বল্‌ব, দাদামশায়? স্রোতের কুটোর মত ভেসে ভেসে আপনার আশ্রয়ে এসে ঠেকেছিনু; কোথা থেকে একটা ঢেউ উঠে আবার আমাকে অকূলে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! দেখি, আবার ভেসে ভেসে কোথায় গিয়ে ঠেকি"—বলিয়া মায়া একবার থামিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল—

"ভেসে বেড়ানই ষ'ার নিয়তি, তা'তে আর তা'র দুঃখ কিসের ?—তবে শেষে একটা মিছে কলঙ্ক কুড়িয়ে যেতে হ'ল, এই দুঃখ! প্রভা যদি হাসিমুখে আমাকে চ'লে যেতে বল্‌ত, আমি মনের সুখে যেতে পারতুম।" আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিল—"তা হ'ক, কারু কথায় ত আর প'চে যাব না—আমি যা', তা'ই আছি ; ভগবান্ আমার সাক্ষী। প্রভা! তুমি আর রাগ তাপ ক'রো না, দিদি! আমি চ'লে যাচ্ছি। না জেনে যদি কোন কারণে তোমার মনে দুঃখ দিয়ে থাকি, ত সে জন্যে কিছু মনে ক'রো না!"

মায়ার প্রতি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, প্রভা রুক্ষকণ্ঠে বলিল—"যাচ্ছিস্—দূর হ'য়ে যা! আবার এত কথা কেন? সতীত্ব নাড়া দিতে লজ্জা করে না লা তোর—কালামুখী—শতেক্‌খোয়ারী?"

মায়া লজ্জায় মুখ নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"তবে আমি যাই, দাদামশায়! যতক্ষণ থাক্‌ব—ততক্ষণ প্রভার মনের আগুন নিব্‌বে না। আমার গয়নার বাক্সটি এখন আপনার কাছেই থাক্। আমি কোথাও গিয়ে থিতি হয়ে চিঠি লিখ্‌লে, তা'র যা হয় একটা বিলি ব্যাবস্থা কর্‌বেন!"

রাধারাণীকে ও সীতানাথকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া মায়া বিদায়োন্মুখ হইলে, 'রামের মা' বলিয়া পরিচিতা এক বর্ষীয়সী পুরবাসিনী একখানি গামছা কাঁধে করিয়া আসিয়া সীতানাথকে বলিলেন—"মায়া ত আর একলাটি কোথাও যেতে পার্‌বে না, তাই আমি সঙ্গে যাচ্ছি ; কোথাও যদি দু'জনের থাক্‌বার মত ঠাঁই না মেলে, ত আমি ফিরে আস্‌ব।"

রামের মা'র পশ্চাতে একবস্ত্রে গমনোদ্যতা মায়াকে ডাকিয়া সীতানাথ ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—"কোথা যাও মায়া!—আমি ত এখনও তোমাকে যেতে বলিনি?"—বাষ্পাবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল।

সেই সময়ে বাহিরে দাঁড়াইয়া কে মঙ্গলাকে ডাকিয়া বলিল—"যে বাপের বাড়ী যেতে চায়, তা'কে আস্‌তে বল্, মঙ্গ্‌লা—পাল্কী এসেছে!"

অমরের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া, মায়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রভা কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই গট্ গট্ করিয়া বাহিরে চলিল। সকলে অবাক্! সীতানাথ রাধারাণীকে বলিলেন—"দাঁড়িয়ে দেখ কি, রাধা? যাও! প্রভাকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এস!"

রাধারাণী সীতানাথের নিদেশ পালন করিতে চলিলেন। সীতানাথ চাবির গোছাটি কুড়াইয়া লইয়া, মায়াকে প্রত্যর্পণ করিয়া বাহিরে যাইতে-ছিলেন, এমন সময়ে রাধারাণীর মুখে শুনিলেন, প্রভা পাল্কী চড়িয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে—অমর তাহার সঙ্গে গিয়াছে। সীতানাথ ও রাধারাণী ব্যতীত সকলেই ইহাতে হর্ষান্বিত হইল। মঙ্গলা একটু হাসিয়া, সীতানাথকে শুনাইয়া বলিল—"রাজার মেয়ে ব'লে প্যারী, যা' করে তাই শোভা পায়!"

* * * *

দুইদিন পরেই অমর প্রভাকে রাখিয়া ফিরিয়া আসিল এবং সীতা-নাথের সহিত দেখা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"আপনার সকের নাত-বউটিকে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছে দিয়ে এসেছি, দাদামশায়!"

"বড় কাজই ক'রেছ! যাক্—মনটা তা'র খারাপ হয়েছে, দশদিন ঘুরে আসুক! আবার আমাকে কল্‌কেতা ছুট্‌তে হবে—তা'রই ব্যবস্থা ক'রে এলে আর কি।"

"না, তা আর ছুট্‌তে হবে না; আমি তা'র পাকা বন্দোবস্ত ক'রে এসেছি!"

"ভারি পৌরুষের কাজই ক'রেছ! একটু খিট্‌খিটে বা রাগী ব'লে তা'কে ফেলে দিতে হবে নাকি? কুলের বউ আর কাঁধের পৈতে—যেমনই হ'ক—ত্যাগ কর্‌বার নয়, তা জান!"

"পৈতে ছিঁড়ে গেলেও তার গাঁট বেঁধে গলায় রাখ্‌তে হবে নাকি, দাদামশায়? তবে হাঁ—বল্‌তে পারেন যে, নূতন ক'রে আবার প'র্‌তে হবে।"—বলিয়া অমর হাসিল।

সীতানাথও মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তা তোমাদের কুলীনদের গুণে ঘাট নেই; বিশেষতঃ তিনটে বিয়ে করা ত তোমাদের কুলধর্ম্ম হ'য়ে প'ড়েছে। তোমার পিতামহের তিন সংসার ছিল—শুনেছি; তোমার বাপেরও তৃতীয় পক্ষ। তোমার এখনও একটা বাকী আছে বটে"—তা'র পর একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আমি তোমার উপরে ভারি রাগ ক'রেছি।"

মায়াকে রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়া সীতানাথ সুখী; কিন্তু প্রভার চলিয়া যাওয়াতে তাঁহার আনন্দ ছিল না। প্রভাকে রাখিয়া আসার জন্য তিনি অমরকে অনেক মৃদু ভৎ সনা করিলেন।

প্রভা পিতৃগৃহে গমন করিবার পরে সীতানাথের সংসারে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল। দাস-দাসী ও পরিজনবর্গ সকলেই আনন্দিত। আনন্দ নাই কেবল রাধারাণীর। সীতানাথের আচরণে তিনি যেন কিছু দমিয়া গিয়াছেন। সীতানাথ অনায়াসে মায়াকে তাড়াইয়া প্রভাকে রাখিতে পারিতেন। তিনি তাহা করেন নাই। সুতরাং মায়াকে তাড়ানটা রাধারাণী পূর্ব্বে যত সহজ মনে করিতেন, এখন আর তাহা পারেন না। তবে দুঃসাধ্য হইলেও সেটাকে তিনি একেবারেই অসাধ্যও মনে করেন না। তিনি ঈপ্সিত-সিদ্ধির অনুকূল উপায়ান্তরের চিন্তায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

নিশীথে উপাসনা।

সে-দেশের জল-বাতাস তখনও অমরের বেশ সহ্য হয় নাই; মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তাহার অসুখ হইতেছিল। তাহার উপরে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং স্নান-ভোজনের অনিয়মে একদিন তাহার খুব বেশী জ্বর হইল। জ্বরের প্রথম অবস্থাতেই বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। অমরের সহকারী চিকিৎসক ভয় পাইলেন। সীতানাথ পত্র লিখিয়া, গোবর্দ্ধনকে কলিকাতায় শৈলেনের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। শৈলেন কলিকাতার একজন বহুদর্শী, বিচক্ষণ ডাক্তার সঙ্গে লইয়া আসিল।

রোগীর অবস্থা ক্রমেই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। সীতানাথের বৃহৎ সংসার নিরানন্দময়। আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত পরিজনবর্গের মুখে একটা আশঙ্কা ও বিষাদের ছায়া পড়িল। গোবর্দ্ধন হিসাবপত্র রাখিতে হয় রাখে, সংসারের কাজকর্ম্ম দেখিতে হয় দেখে, কিছুতেই তাহার বেশ মন নাই। মাধাই আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল। তারাচাঁদ দোকান বন্ধ করিলেন। বালক বালিকারা খেলা ভুলিল। অন্তঃপুরে পুরবাসিনী-গণের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনা যায় না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলিও সকলেই চুপে চুপে কহে। শৈলেনের মুখে হাসি নাই, কথা নাই। সীতানাথও শঙ্কিত হইলেন।

সীতানাথ একদিন ডাক্তারকে বলিলেন—"কি বুঝ্‌ছেন—ঠিক ক'রে আমাকে বলুন!"

ডাক্তার কিছুক্ষণ ভাবিয়া, মাথা চুল্‌কাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আরও দু'পাঁচদিন না কাট্‌লে কিছুই বলা যায় না।"

সীতানাথের মুখ ম্লান হইল; উদ্বেগবিজড়িত-শুষ্ককণ্ঠে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আশা আছে ত?"

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"আশা?—তা—যখন জীবনের লক্ষণ রয়েছে, একটু আছে বৈ কি।"

সীতানাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ডাক্তার তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—"আপনি উতলা হবেন না! হতাশ হবার মত ত এখনও কিছু দেখ্‌ছি না!"

দীনদৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখপানে চাহিয়া সীতানাথ ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—"ডাক্তার বাবু! এই ছোট ভেলাখানির উপরে আমার সংসারের সমস্ত আশা-ভরসা বোঝাই দেওয়া রয়েছে; আর বেশী কি বল্‌ব—দেখ্‌বেন যেন ডুবে না যায়! এই যুবার জীবনের জন্যে আমি আমার শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত খরচ কর্‌তে প্রস্তুত। পরামর্শের জন্যে কল্‌কেতা থেকে কোন সাহেব-ডাক্তার আনা দরকার মনে করেন, ত সময় থাক্‌তে বল্‌বেন—চিকিৎসার কোন ত্রুটি না হয়!"

পরদিনই অতি প্রত্যূষে সাহেব-ডাক্তার আনিবার জন্য শৈলেন কলিকাতায় গমন করিল। সীতানাথ তাহার প্রত্যাগমনের পথ চাহিয়া অস্থিরভাবে সময় কাটাইতে লাগিলেন। তিনি বাড়ীর ভিতরে আসিয়া, এক একবার অমরের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, আর বাহিরে গিয়া, কাণ পাতিয়া পাল্কীবাহকদের সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় কি না, তাহা শুনিতে চেষ্টা করেন। কখন ঘড়ির পানে চাহিয়া থাকেন—ঘড়িটা চলিতেছে কি না, কাণ পাতিয়া তাহা শ্রবণ করেন। এইরূপ উৎকণ্ঠাপূর্ণ অপেক্ষায় তিনি সমস্তদিন অতিবাহিত করিলেন। ডাক্তার লইয়া শৈলেনের ফিরিয়া আসিবার সময় অতীত হইয়া গেল। সীতানাথের চঞ্চলতা আরও বৃদ্ধি পাইল।

সন্ধ্যার সময়ে একটা তারের খবর আসিল। শৈলেন সংবাদ দিয়াছে যে, তাহারা ট্রেণের অপেক্ষায় ইস্টেশনে বসিয়া আছে। সীতানাথ হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাহারা পরদিন বেলা দুইপ্রহরের পূর্ব্বে পৌঁছিতে পারিবে না। ততক্ষণ কি রোগী জীবিত থাকিবে? দৈবও প্রতিকূল বুঝিয়া তিনি অমরের জীবন-রক্ষা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার পরে সীতানাথ আর বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন না। তারাচাঁদ, গোবর্দ্ধন ও মাধাইকে সতর্ক থাকিতে বলিয়া, তিনি দীঘির ঘাটে আসিয়া বসিলেন। অতীতের বহুতর স্মৃতি মনে জাগিয়া তাঁহাকে অতিমাত্র ব্যাকুল ও বিষাদবিহ্বল করিয়া তুলিল। যেদিন তিনি অমরকে আনিবার জন্য রামকৃষ্ণপুরে গমন করেন, সেইদিনের সেই সব কথা—বালক অমরের সেই ম্লান মুখখানি, সেই কাঁদ-কাঁদভাবে—"আমি আপনার সঙ্গে যাব"—যাওয়া হইবে না শুনিয়া তাহার সেই কান্না, তাহার পরে তাঁহার নিকটে এই দীর্ঘ দ্বাদশ-বৎসরকাল-অবস্থানের প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক কথা—তাহার রাগ, অভিমান, তর্ক, আবদার,—কবে কি দোষের জন্য তিনি তাহাকে কি বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য অমর কবে কাঁদিয়াছিল, কবে ভাত না খাইয়া ঘুমাইয়াছিল, ইত্যাদি সমস্ত কথা একে একে মনে হইয়া তাঁহার হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। বাষ্পাকুলিত-স্থির-শূন্যদৃষ্টিতে শূন্যে চাহিয়া তিনি কখন নিম্নকণ্ঠে বলিতেছিলেন—"অমরকে এ-যাত্রা বাঁচাতে পার্‌লাম না!—হায়! যে দেশে লোক্ ওষুধ না পেয়ে মরে—আমি কেন আমার সংসারের একমাত্র অবলম্বন—আমার যথাসর্ব্বস্বকে সেই দেশে এনে রাখ্‌বার ব্যবস্থা কর্‌লেম!" কখন ভাবিতেছিলেন যে, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন—এ নিদারুণ শোক বহন করিয়া আর কতদিন

বাঁচিতে পারিবেন? কাহার উপরে তিনি তাঁহার সংসারের ভার দিয়া যাইবেন? কে নিঃস্বার্থ হইয়া এ ভূতের বোঝা বহন করিবে? সাধারণের কাজ দশজনে মিলিয়া মিশিয়া নিঃস্বার্থভাবে করিবার মত লোক এদেশে নাই—টাকা থাকিলেও উপযুক্ত লোকের অভাবে ভাল কাজ অচল হইয়া থাকে; দায়িত্ববোধবিহীন ব্যক্তির অপব্যয়ে বা অযথা ব্যয়ে সাধারণের অর্থ নষ্ট হইয়া, সৎকার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে বসিয়া অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের আরও অনেক কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভবিষ্যতের চিত্র যেন তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল! তিনি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, তাঁহার এই গৃহ আবার জনশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকায় স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, এবং জঙ্গলময় হইয়া ভেক, ঝিল্লী, পেচক ও চর্ম্মচটক প্রভৃতির স্বচ্ছন্দবাসস্থানে পরিণত হইয়াছে! দীঘির এই নির্ম্মল জলরাশি, বারিপর্ণী ও বিবিধ জলজ উদ্ভিজ্জে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে! মালঞ্চে বড় বড় তৃণ ও গুল্মরাজি জন্মিয়া ভাল ভাল ফুলের গাছগুলিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে! বিগ্রহের সন্ধ্যা-আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিলেন— আর কিছুদিন পরে এ সবই নীরব হইবে! আর আমার বিষ্ণু-বিগ্রহের সেবা হইবে না! আর এমন করিয়া প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আটচালা জুড়িয়া অতিথি, অভ্যাগত, অনাহূত ও রবাহূত ব্যক্তি প্রসাদ ভোজন করিতে বসিবে না। আটচালা ভাঙ্গিয়া পড়িবে, বিস্তৃত গৃহপ্রাঙ্গণ নীরব ও নির্জ্জন হইয়া পড়িয়া থাকিবে—শিবাকুলের বিশ্রব্ধবিচরণ-ভূমিতে পরিণত হইবে! গৃহে যাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাদের কি দশা হইবে, তাহা ভাবিতেই তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। আরও কিছুক্ষণ সেইস্থানে বসিয়া চিন্তা করিয়া, তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বাড়ীর দিকে আসিলেন। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে আর তাঁহার

ইচ্ছা হইল না; বাহিরে দাঁড়াইয়া জানিলেন, অমরের নাড়ীর অবস্থা ভাল নহে। তিনি একবারে বিশ্রাম-কুটিরে চলিয়া গেলেন।

বাড়ীর ভিতরে, ঠিক সীতানাথেরই মত ব্যাকুল ও চঞ্চলচিত্তে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছিল—মায়াবতী। সে লজ্জায় রোগীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিতে পারিতেছিল না, বা সে-কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া নিম্নকণ্ঠে যে যাহা বলিতেছিল, সে দূরে দাঁড়াইয়া, কাণটি পাতিয়া তাহাই শুনিতেছিল; আর মাঝে মাঝে এক একবার চারিদিকে চাহিতে চাহিতে—পাছে দেখিতে পাইয়া কেহ কিছু বলে এই আশঙ্কায়—ভয়ে ভয়ে সেই ঘরের নিকটে আসিয়া, তাহার ভিতরে বসিয়া কেহ কিছু বলিতেছে কি না তাহাও শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল।

রাত্রি প্রায় দুইপ্রহরের সময়ে গৌরীঠাকুরাণী অমরের হাত দেখিয়া আসিলেন। ঠাকুরাণীর নাড়ীজ্ঞান নাকি বড় চমৎকার! সপ্তাহ পূর্ব্বে হাত দেখিয়া তিনি নাকি মৃত্যু-নাড়ীর গতি বুঝিতে পারেন! তবে তাঁহার অনুমানটা, জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌গণনার ন্যায়, সব সময়ে নাকি ঠিক হয় না! কোন্ সময়ে—কাহার বিষয়ে যে ঠিক হইয়াছিল, তাহাও কেহ ঠিক বলিতে পারে না। জানা শুনার ভিতরে তিনি যে কয়েকজনের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া, শমন-ভবন-গমনের দিন স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই নাকি আজিও বাঁচিয়া আছে! যাহাই হউক, তিনি অমরের হাত দেখিয়া, নামিয়া আসিলেই মায়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম দেখে এলে দিদি?" ঠাকুরাণী মাথা চালিয়া বলিলেন—"ভাল বুঝ্‌ছি না রে ভাই! ভোর নাগাৎ—এই জ্বরটার বিচ্ছেদে—কি হয়!" মায়া লুকাইয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে সরিয়া গেল।

রোগীর ঘরে বেশী লোক থাকা ডাক্তার নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। বর্ষীয়সী দুইজন পুরাঙ্গনা এবং গোবর্দ্ধন ও তারাচাঁদ—ইহারাই পর্য্যায়-ক্রমে দুইজন করিয়া অমরের নিকটে থাকে; শৈলেন ও সীতানাথ মধ্যে মধ্যে, আর মাধাই নিয়ত। যক্ষের ধন পাহারা দেওয়ার মত মাধাই দিনরাত সেই কক্ষের এক কোণে—এক তাল তামাকু ও কতক-গুলা টিকা লইয়া আড্ডা পাতিয়া—বসিয়া থাকে; তাহার আহার-নিদ্রা নাই।

রাত্রি গভীর। রোগীর শয্যাপার্শ্বে যাহারা বসিয়াছিল, তাহারা ব্যতীত আর সকলেই শয়ন করিয়াছে। সীতানাথ তখনও শয়ন করেন নাই। তিনি একবার বিশ্রাম-কুটির আর একবার দীঘির ঘাট করিয়া বেড়াইতেছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে এক একবার উৎকর্ণ হইয়া, পুরীমধ্য হইতে বামাগণের রোদনের রোল উঠিল কি না—তাহাই শুনিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মধ্যে একবার অস্থিরচিত্তে আসিয়া তিনি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন, উপরে উঠিয়া অমরের কক্ষের সম্মুখে আসিয়াও দাঁড়াইলেন; কিন্তু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মুমূর্ষু অমরের সংজ্ঞাশূন্য দেহ ও পরিম্লান বিবর্ণ মুখের পানে চাহিতে পারিলেন না—শুশ্রূষাপরায়ণ গোবর্দ্ধন ও মাধাইএর ম্লান দুইখানি মুখ দেখিয়াই নিঃশব্দে নীরবে দীঘির ঘাটে ফিরিয়া আসিলেন।

মানুষের দুঃখে, শোকে, বিষাদে বা বিপদে প্রকৃতির সহানুভূতি দেখা যায় না। বিপন্ন ও বিষণ্ণের দারুণ মনোবেদনা, শোকার্ত্তের কাতর ক্রন্দন, সন্তপ্তের দীর্ঘশ্বাস, প্রকৃতির আনন্দ-হাস্যে বিঘ্ন জন্মাইতে সমর্থ হয় না। মর্ম্মচ্ছেদকর বিষাদের গভীর দীর্ঘশ্বাসে তোমার বুক ভাঙ্গিয়া যাউক, প্রবল শোকের অবিরাম অশ্রুধারায় তোমার নেত্র হইতে নদী প্রবাহিত হউক, প্রকৃতি হাসিবে—নিত্য যেমন হাসিয়া থাকে তেমনই

হাসিবে। আজ সীতানাথের এই বিপদ ও বিষাদের নিশায় প্রকৃতিসুন্দরী তাহার সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর বেশে ভূষিতা হইয়া হাসিতেছিল। নির্ম্মল নীলাম্বর প্রচুর-তারকিত ও চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত। দীঘির কাল জলে চাঁদের আলো ভাসিতেছে। তটতরুশ্রেণীর শিশিরসিক্ত পল্লবরাজি চন্দ্র-কিরণ-সম্পাতে উজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তরুপল্লবের নিভৃত-ক্রোড়ে প্রচ্ছন্ন পাপিয়ার সুমধুর কণ্ঠতানে স্তব্ধগগন পূর্ণ ও প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছে। সন্নিহিত পুষ্পোদ্যানে নানাজাতীয় ফুল ফুটিয়া সৌরভ বিকীরণ করিতেছে।

সীতানাথ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যানুরাগী ; কিন্তু আজ সুষমাময়ী নিশীথ-প্রকৃতির এই বেশভূষা—এই হাসিখুশী তাঁহার নেত্রে যেন বারবিলাসিনীর পেশাদারী সাজসজ্জা ও হৃদয়ের সম্পর্কশূন্য, নীরস, দেঁতো হাসির মত প্রতীত হইতেছিল। চিরবিদায়োন্মুখ প্রিয়জনের বিয়োগ-আশঙ্কায় প্রাণ যখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠে, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে বক্ষঃ ও পঞ্জরের অস্থিনিচয় ভাঙ্গ ভাঙ্গ হইয়া পড়ে, মর্ম্মভেদকর মনোবেদনায় সান্ত্বনা ও সহানুভূতি-লাভের আশায় মানুষ চারিদিকে আকুলনেত্রে চাহিতে থাকে, তখন সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির শোভন বেশ ও আনন্দহাস্য যেন মানুষের দুঃখে উদাসীনা প্রকৃতির কঠোর পরিহাস বলিয়াই মনে হইয়া থাকে। সে-সময়ে সমবেদনাপূর্ণ মানবের বিষণ্ণ ও ম্লান মুখই যেন ভাল লাগে! তখন কাহার মনে হয়—প্রকৃতি করুণাময়ী, মানুষ অকরুণ ? কাহার না ইহার বিপরীত মনে হইয়া থাকে ?

সীতানাথ নিশীথনির্জ্জন প্রকৃতির অযাচিত সৌন্দর্য্য-উপহার উপেক্ষা করিয়া, মৌন ও ম্লানমুখে অবস্থিত স্বজনের সান্নিধ্যই অন্বেষ্টব্য মনে করিয়া উঠিতেছিলেন ; এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটি রমণীমূর্ত্তি দ্রুতপদে তাঁহারই দিকে আসিতেছে! রমণীমূর্ত্তি সন্নিহিত হইলে

দেখিলেন—রাধারাণী! রাধারাণী যে কোন নিদারুণ দুঃসংবাদ দিবার জন্যই তাঁহার সন্ধানে আসিতেছেন, সীতানাথের তাহাতে সংশয় রহিল না। তিনি ঘনস্পন্দিত হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া দুঃসংবাদ শুনিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। রাধারাণী নিকটে আসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"এই যে, বাবা এইখানেই রয়েছ—একবার এদিকে এস!"

সীতানাথ শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন রাধা? খবর মন্দ কি?"

রাধারাণী একটু হাসিয়া বলিলেন—"না, সে-সব কিছু নয়; এই তুমি বিশ্বাস করতে চাও না কিনা, তাই তোমাকে একটা মজা দেখাব—আমার সঙ্গে এস!"

সীতানাথ একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের আশঙ্কার ভারটা যেন একটু কমিয়া গেল। কৌতূহলাবিষ্টহৃদয়ে নীরবে তিনি রাধারাণীর পশ্চাতে চলিলেন। তাঁহাকে দেবালয়ের অদূরে আনিয়া রাধারাণী বলিলেন—"আমি এইখানে দাঁড়াই, তুমি দরজার ছেঁদা দিয়ে ঘরের ভেতরটা একবার দেখে এস!"

দেবালয়ের দুইটি দ্বার। সদরের দিকেই প্রধান দরজা। সেই দরজার কপাটে—দেবগৃহদ্বার সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিতে নাই বলিয়া—চতুষ্কোণ একটি ছিদ্র ছিল। পার্শ্বদ্বার হইতে একটি প্রচ্ছন্ন পথ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পুরবাসিনীরা সেই পথে ও সেই দ্বার দিয়া গমনাগমন ও দেবগৃহে ভোগাদি বহন করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে প্রধান দ্বার ভিতরের দিক হইতে রুদ্ধ থাকে। ঘরের ভিতরে সমস্ত রাত্রি ঘৃতের দীপ জ্বালিবার ব্যবস্থা আছে।

সীতানাথ দ্বারের ছিদ্র দিয়া কক্ষাভ্যন্তরে যে দৃশ্য দেখিতে পাইলেন, তাহা তিনি তাঁহার দীর্ঘজীবনে আর কখনও দেখেন নাই—জীবনে

ভুলিতেও পারেন নাই—তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সে দৃশ্য তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত ছিল। সেই গভীর নিশীথে রুদ্ধদ্বার দেবগৃহের কক্ষতলে, বিগ্রহের সম্মুখে জানুদ্বয়ের উপরে দেহভার ন্যস্ত রাখিয়া মায়াবতী অবস্থিতা! মধ্যরাত্রে সে-গৃহের অভ্যন্তরে মনুষ্যের দৃষ্টি প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা না থাকায়, সে মুক্তাবগুণ্ঠনে অসঙ্কোচে অবস্থান করিতেছিল। তাহার আলুলায়িত, দীর্ঘ ও বিপুল কেশরাশির অগ্রভাগ কক্ষতল চুম্বন করিতেছে! অনিমেষ দীর্ঘনয়ন হইতে বিগলিত অশ্রুধারায় তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতেছে! স্থির দৃষ্টি দেবতার মুখের উপরে লগ্ন! পাণিদ্বয় পীনোন্নতবক্ষে সন্নিবদ্ধ! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব নিশ্চল, কেবল ঈষৎস্ফুরিতাধরোষ্ঠে হৃদয়োত্থিত প্রার্থনার নিঃশব্দ-ভাষণ সূচিত হইতেছিল। সহসা দেখিলে মনে হয়, যেন মর্ম্মর-নির্ম্মিত দেবতা-বিগ্রহের সম্মুখে নিপুণ ভাস্কর কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা উপাসনা-নিরতা একটি প্রস্তরময়ী, পূর্ণযৌবনা রমণীমূর্ত্তি স্থাপিতা হইয়াছে! মুহূর্ত্তের জন্য সীতানাথের যেন একটা আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। তিনিও যেন সেই উপাসনা-নিরতা সুন্দরীর তন্ময়তায় তন্ময় হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন কোন সঞ্জীবনী-মন্ত্রবলে দেবতার পাষাণ বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং উপাসকের কাতরতায় উপাস্যের অন্তরে করুণার উদ্রেক হইয়াছে! উপাসক ও উপাস্যের মধ্যে যেন প্রার্থনা ও প্রার্থিত বরের একটা আদান-প্রদানের ভাব পরিব্যক্ত হইতেছে! সীতা-নাথ মায়াবতীর অনুচ্চকণ্ঠে অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত যে দুই চারিটা উপাসনার কথা শুনিতে পাইলেন, তাহাতেই বুঝিতে পারিলেন যে, দেবতার নিকটে মুমূর্ষু অমরের জীবন-ভিক্ষাই তাহার এই উপাসনার উদ্দেশ্য। যাহা হউক, সীতানাথ সে স্থানে আর অপেক্ষা না করিয়া, যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন।

সীতানাথ অন্যমনস্ক হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন ; এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, পশ্চাৎ হইতে রাধারাণী বলিতেছেন—"কেমন, নিজের চোখে দেখে এলে তা ? আমাদের কথায় যে বিশ্বাস কর না !"

সীতানাথ বোধ হয় সে-কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, অথবা তখন তাঁহার মনের অবস্থা তাহা বুঝিবার মত ছিল না ; তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া, রাধারাণীর মুখপানে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন—"কি বিশ্বাস করি না, রাধা ?"

রাধারাণী একটু হাসিয়া বলিলেন—"আহা ! বাবা যেন কি ! বলি—এত লোক রয়েছে, ও-ছুঁড়ী কেন অমরের অসুখে এমন আকুলি-বিকুলি হ'য়ে ঠাকুরের কাছে কাঁদাকাটা করে বল দেখি ? এতেও কি আর বুঝ্‌তে পার্‌ছ না—ভেঙ্গে ব'ল্‌তে হবে ?"

সীতানাথ গম্ভীরভাবে ও দৃঢ়স্বরে—"ছি—রাধা ! এ বিপদের সময়েও তুমি এইসকল ঈর্ষাবিদ্বেষের ছোট কথা নিয়ে রয়েছ ? এ বিপদ শুধু আমার নয়—সবারই ; অমরের জীবন-মরণের উপরে এই সংসারের ভাল-মন্দ, থাকা-না-থাকা নির্ভর কর্‌ছে। তোমরা সেটা এখনও বুঝ্‌তে পারনি ; মায়া বুদ্ধিমতী—সে তা বুঝেছে ; তাই বিপদের দিনে যা করা উচিত, তাই কর্‌ছে। যাও—ঘরে যাও ! ভগবান্‌কে ডাক্‌তে না পার, স্থির হয়ে ঘুমবার চেষ্টা কর গিয়ে !"—বলিয়া তিনি দ্রুতপদে বিশ্রাম-কুটিরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

সপ্তম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

আরোগ্যে অস্বস্তি।

অমর আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তাহার দেহ সবল হইয়াছে। কিন্তু আরোগ্যলাভের পরে তাহার মনে কেমন যে একটা বিমর্ষভাব আসিয়া পড়িয়াছে, সেটা কিছুতেই অপগত হইতেছে না। পীড়িতাবস্থায় যাতনার মধ্যেও মানুষ, এমন একটা সুখ উপভোগ করিতে পায়, সুস্থাবস্থায় যাহার সম্ভোগ সম্ভব নহে। অন্যসময়ে আত্মীয়স্বজনের স্নেহ ও চিন্তা সংসারের বিবিধ বিষয় ও বস্তুর উপরে বিক্ষিপ্ত থাকে। প্রিয়জন কেহ পীড়িত হইলে সকলের সব চিন্তা, সমস্ত স্নেহমমতা, অন্য সমস্ত বিষয় হইতে পরাবৃত্ত হইয়া, পীড়িতকে কেন্দ্র করিয়া নিয়ত তাহারই উপরে পতিত থাকে। সে আরোগ্য লাভ করিবার পরে কিন্তু আর তাহাদের সে-ভাব থাকে না। ইহার উপরে আবার যদি এমন কেহ প্রিয় আত্মীয় থাকে, শুধু রোগ-শয্যায় পড়িয়াই যাহার দেখা পাওয়া গিয়াছিল—সুস্থাবস্থায় কখন দেখা পাওয়া যায় নাই এবং পাইবার আশা পর্য্যন্তও নাই, তাহা হইলে সে রোগ-শয্যা হইতে যেন আর সারিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না! সারিয়া উঠিবার পরেও যেন সেই দয়িতজনের অদর্শন জন্য একটা বিষাদ হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে! অমরের তেমন কেহ ছিল কি না, সেকথা সেই বলিতে পারে। তবে নিয়ত রাত্রিজাগরণে অন্যান্য সকলে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, শেষে দিনকতক রাধারাণী ও মায়াবতীর পালা পড়িয়াছিল। অমরের বিকারের ঘোর

কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ কাটিয়া যায় নাই। তখন মাঝে মাঝে একটু আধটু জ্ঞানের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু তাহা বায়ুসঞ্চালিত মেঘমালার মধ্যে ক্ষীণ চন্দ্রের ক্ষণিক প্রকাশের মত বড়ই ক্ষণস্থায়ী। দুই একটা জ্ঞানের কথা কহিয়া তখনই সে আবার অজ্ঞানতার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। সে অবস্থায় মনের কোনপ্রকার সম্বদ্ধ চিন্তার শক্তি থাকা সম্ভব নহে, তৎকালের কোন অনুভূতির স্মৃতিও যে আজিও তাহার চিত্তে এই বিষাদ জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহাও মনে হয় না। তবে তাহার এই বিমর্ষভাবের কারণ কি?

সীতানাথ কিছুই বুঝিতে পারেন না। অমরকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য তিনি অশেষপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকেন—সর্ব্বদাই তাহার নিকটে থাকিয়া নানারকমের কথা-বার্ত্তায় ও গল্পে তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে যত্ন করেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টার ফল স্থায়ী হয় না। যতক্ষণ তিনি কথা কহেন, ততক্ষণমাত্র অমর যেন একটু সজাগ থাকে; তাহার পরেই আবার সেই বিষাদের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এমন কি তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতেই সে অনেক সময়ে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে; একটা কথা দুই তিনবার শুনিবার পরেও আবার জিজ্ঞাসা করে—"কি বল্‌ছিলেন, দাদামশায়?" সীতানাথ হাসিয়া বলেন—"এই যে তিনবার ধ'রে বল্‌লেম, অমর! তোমার মন কোথা ছিল ভাই?"—অমর লজ্জিত হইয়া বলে —"কি জানি কেমন একটু আন্‌মনা হ'য়ে প'ড়েছিলাম।"

দিনে দিনে অমরের এই ভাবটা বড়ই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সকল কার্য্যেই তাহার কেমন যেন একটা আলস্য, অনিচ্ছা ও ঔদাসীন্য! সীতানাথ ভাবিয়াছিলেন, অমর সারিয়া উঠিলে তাহার সাহায্যে তিনি অনেক কাজ করিতে পারিবেন। তিনি সে আশায় নিরাশ হইয়া পড়িলেন। অমরের চিত্ত যে চিরদিনই কিছু ভাবপ্রবণ, তাহা তিনি

জানিতেন, এবং ভাবপ্রবণতা যে কার্য্যের অনুকূল নহে, তাহাও তিনি বুঝিতেন; কিন্তু তাহার এখনকার এই উত্তমহীনতা ও উদাসীনতায় তিনি বড়ই নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িলেন। স্থায়ীভাবে দেশে আসিবার পরে তাঁহার নিজের শরীরও বেশ সুস্থ ছিল না। তিনি প্রায়ই অসুস্থ হইতেছিলেন, এবং দিনে দিনে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। এখন আর তিনি পূর্ব্বের মত প্রত্যহ গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, গ্রামবাসিগণের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না; একটু ঘুরিলেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। তাহার উপরে অমরের এইরূপ উদাসীন ভাব দেখিয়া, তিনি বিশেষ চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। তাহাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়াও সন্তোষজনক কোন উত্তর না পাইয়া, তিনি তাহার মনোভাব বুঝিবার জন্য পত্র লিখিয়া শৈলেন্‌কে আহ্বান করিলেন।

সীতানাথ যেদিন শৈলেন্‌কে পত্র লিখিলেন, অমরও সেইদিন তাহাকে একখানা পত্র লিখিল। উভয়েরই পত্র এক দিনে, এক সময়ে, একই ডাকঘরের মোহর পরিয়া শৈলেনের উদ্দেশে বাহির হইল। সীতানাথ অন্যান্য কথার মধ্যে লিখিয়াছিলেন—"আমার ইচ্ছা, তুমি একদিনের জন্যও একবার আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাও। বিশেষ আবশ্যক না হইলে, তোমাকে কার্য্যের ক্ষতি করিয়া আসিতে অনুরোধ করিতাম না। যে কারণে আসিতে বলিতেছি, তাহার সহিত তোমার প্রিয় সুহৃদ্ অমরের ভবিষ্যৎ ভালমন্দ ও সুখদুঃখের বিশেষ সম্বন্ধ আছে জানিবে। কোন্ দিনে তোমার আসিবার সুবিধা হইবে, তাহা যেন পূর্ব্বে জানিতে পারি।" আর অমর লিখিয়াছিল—"শৈলেন, আমাকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া তোমরা ভাল কর নাই। যে জীবনে সুখ নাই, শান্তি নাই, হর্ষ নাই, উত্তম নাই, সে জীবন লইয়া আমি কি করিব? তুমি চিরদিনই আমাকে স্বপ্ন-জগতের অধিবাসী বলিয়া থাক; পরিহাসের ছলে বলিলেও কথাটা

নিতান্ত মিথ্যা নহে। সত্যই আমি একটা স্বপ্নের রাজ্যে বাস করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি আমার সেই স্বপ্ন-রাজ্যে একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। আমার হৃদয়, মন, ইন্দ্রিয়, সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করিয়াছে—আমার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। আমি একা তাহাদের সঙ্গে কত যুদ্ধ করিব? এখনও তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করি নাই; কিন্তু তাহা না করিয়াও আর পারিতেছি না, দিনে দিনে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। তুমি যদি একটু কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া এই সময়ে একবার এখানে না আস, তাহা হইলে আমার যে কি গতি হইবে, তাহা জানি না। এ অবস্থায় তোমার একবার এখানে আসা নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণা।

অতিথি অভ্যাগতের এবং পরিজনবর্গের ভোজনশেষে সীতানাথ বাড়ীর ভিতরে আহার করিতে বসিয়াছেন। মায়াবতী পরিবেশন করিতেছে। মঙ্গলা একটু দূরে বসিয়া ফুলা হাঁটুতে বাতের একটা তেল মালিশ করিতেছে। মায়া জিজ্ঞাসা করিল—"মাধাইকে আজ সকাল থেকে দেখিনি কেন, দাদামশায়!—কোথাও পাঠিয়েছেন?"

সীতা। তা'র ত আজ একবার ইষ্টেশেনে যাবার কথা ছিল,—বোধ হয় তাই গিয়ে থাকবে।

মঙ্গলা সেই কথা শুনিয়া বলিল—"পোড়ার মুখো মানুষ! গেলি যে তা ব'লে যেতে হয় না?"

"হ্যাঁ, দাদামশায়! দাঁত বাঁধাতে কত খরচ পড়ে?"—এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মায়া মঙ্গলার মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল।

মঙ্গলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া, মায়াকে ধম্‌কাইয়া বলিল—"কাজ সেরে নাও গে না—মিছে বক্‌ছ কেন? সবার সকাল হ'লেও তোমার সেই বেলা তিন পহরে একবারে ভাতে-জলে!"

সীতা। দাঁত বাঁধাবে কে—মঙ্গলা তুই নাকি?

"তুমিও তেমনি! দিদিমণির কি—দিনরাত খালি রঙ্গ নিয়েই আছেন—হাতেরও কামাই নেই আর মুখেরও কামাই নেই! তবু যদি—" বলিয়া মঙ্গলা কি একটা পরিহাসের কথা বলিতে যাইতেছিল, মায়া তাহাতে বাধা দিয়া বলিল—"তবে দাদামশায়কে সেই কথাটা বলি?"

মঙ্গলা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"তা বল গে যাও! মিছে কথা নাকি? হ্যাঁ গা কত্তাবাবু!—আমাদের সেথা একজন বিদ্যে-বড়দীঘি-ভট্‌চাজ্জি ছেল না গা?"

সীতানাথ সবিস্ময়ে মায়ার মুখপানে চাহিলেন। মায়া হাসিয়া বলিল—"বুঝ্‌তে পার্‌লেন না?—বিদ্যেসাগর মশায়ের কথা বল্‌ছে! মঙ্গলা সাগর-নোড়লের বউ কিনা, তাই সাগর বল্‌তে হ'লে 'বড়দীঘি' বলে; ও জানে, সাগর একটা বড় দীঘির মত আর কি!"

সীতা। তা বিদ্যেসাগর মশায়ের কথা এল কেন? তিনি কি দাঁত-বাঁধানর দোকান বসিয়ে গেছেন নাকি?

মায়া। তা কেন গো, তিনি বিধবা-বিয়ের ব্যাবস্থা দিয়ে যাননি?

সীতা। ও! তা মঙ্গলা, তোর কি এতকাল পরে আবার বিয়ে কর্‌তে সাধ হ'য়েছে নাকি?

মঙ্গলা হাসি চাপিয়া একটা ঝঙ্কার করিয়া বলিল—"সেবা হ'য়ে থাকে, ত উঠে পড় না বাবু!—দিদ্দিমণিও যেমন, আর তুমিও তেমনি!"

মায়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"কথা হয়েছে কি জানেন ?—এখন মঙ্গলা হ'ল গিয়ে সহর-ঘেঁটা ; মাধাই ত আর তা নয়—সেটা 'পাড়াগেঁয়ে ভূত' ! মঙ্গলা তা'র কাছে সহরের অনেক অদ্ভুত গল্পও করে ; যেমন— বউবাজারে ছোট বড় নানা রকমের বউ কেনা বেচা হয়, 'পটলড্যাঙ্গা' ব'লে একটা মস্ত বালিচড়া আছে, তা'তে তাকিয়া বালিশের মত বড় বড় পটল ফলে, 'লাল দীঘি' ব'লে একটা দীঘি আছে, তা'র আল্‌তাগোলা জলে সবাই কাপড় ছুপিয়ে নিয়ে যায়—এইরকম কত শত ! তা'র মধ্যে বিদ্যেসাগর মশায়ের ঐ—একাদশীকে ফাঁকি দিয়ে বিধবাদের মাছ-ভাত খাবার—ব্যাবস্থার কথা ! মাধাই এখন তাই শুনে ব'লেছে যে, মঙ্গলা যদি দাঁতকটা বাঁধিয়ে নিতে পারে, ত সে ওকে বিয়ে করে !"

সীতা। বটে !—এ ত বেশ কথা। তা দাঁত-বাঁধানর দরকার কি ? —সে বেটারও ত নীচ-ওপরে মোটে আড়াইটে কি তিনটে নড়া দাঁত আছে। ওটা গায়ে গায়ে শোধ হ'লেই ত চুকে যায় ! আর বিয়ের ব্যাপারে—গায়ে হলুদ, ফুলশয্যে, পুরুত-নাপিত-বিদেয় প্রভৃতিতে—এমন চলেও ত ? তা শুধু বিদ্যে-বড়দীঘি কেন, আমি হাতীর বাগানের বড় বড় দিগ্‌গজ ভট্‌চাজ্জিদের ভাষ আনিয়ে দোব এখন। মাধাইকে তোর পছন্দ হ'য়ে থাকে ত বল্ !

মঙ্গলা মাধাইএর "তোব্‌ড়া মুখে খড়ের নুড়ো" জ্বালিয়া দিবার কথা বলিতেছিল, এমন সময়ে মাধাই উপস্থিত হইয়া বলিল—"শৈলেন বাবু এসেছেন।" সীতানাথ তাড়াতাড়ি ভোজন শেষ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

অমর বাড়ীতে ছিল না, দূরে কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছিল। সীতানাথ শৈলেন্‌কে ভোজন করাইয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিশ্রাম-কুটিরে আসিলেন। অমরের বিষণ্ণতা-সম্বন্ধে দুইজনে অনেক কথা হইল।

সীতানাথ বলিলেন—"কৌশলে তা'র মনের কথাটা কি, তোমাকে জান্‌তে হবে; তোমার কাছে নিশ্চয়ই সে তা গোপন কর্‌বে না।"

শৈলেন। না করাই সম্ভব; তবে তা'র মর্জ্জির কথা কিছুই বল্‌বার জো নেই, দাদামশায়! মাথা খুঁড়ে ম'লেও যা বল্‌বে না, এক সময়ে হয় ত আবার নিজেই সেধে সেই কথা বল্‌বে!—এ বিষয়ে আপনি কি অনুমান করেন?

সীতা। আমি ত ভাই কিছুই বুঝ্‌তে পারি না! এর-তা'র কথায় যা মনে হয়, তা'তে আস্থা করা যায় না—কর্‌তে প্রবৃত্তিও হয় না!

শৈল। আপনার যা মনে হয় তা বুঝ্‌তে পেরেছি। অনেক দিন থেকেই এ কথাটা আমারও মনে হ'য়েছিল; কিন্তু অমরকে যতটা জানি, তা'তে আমিও সে কথাকে মনে ঠাঁই দিতে পারিনি। তবে প্রভা রাগ ক'রে চ'লে যাবার পরে, তা'র মুখে সব কথা শুনে টুনে এখন সেটাকে সম্পূর্ণ অমূলক ব'লে একবারে উড়িয়ে দিতেও পারি না। প্রভা বালিকা নয়;—বিশেষতঃ এ-সকল বিষয়ে স্ত্রীজাতির একটা অশিক্ষিত-পটুত্বও আছে।

সীতা। প্রভা যা বল্‌ত, বা রাধা যা বলে, আমি সে কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই মনে করি না; তবে কি জান, তুচ্ছ একটা লঘু জিনিষের পুনঃ পুনঃ আঘাতে পাথরেও একটা দাগ পড়ে। কখন কখন মনে হয়েছে যে, এরা এ-কথাটাই বা বলে কেন? কিন্তু অমরের বা মায়ার মুখের পানে চাইলে, আর সে কথা মনে দাঁড়াতে পায় না—মনে উঠেছিল ব'লেও যেন আপনার কাছেই আপনাকে লজ্জিত হ'তে হয়!

শৈল। একটা কথা বুঝে দেখ্‌তে হবে, দাদামশায়! দু'জনেরই বয়েস্ অল্প; অবস্থার হিসেবে দু'জনেই দু'জনের আকর্ষণস্থল। অসাধারণ রূপ বা গুণ কখন অনাদৃত থাকে না—সহজেই মনকে মুগ্ধ করে। রূপের

বা গুণের সমাদর থেকে যে একটা সহানুভূতি জন্মে, তাই অনুরাগের মূলসূত্র। অমর যদি প্রভার প্রতি অনুরক্ত হ'ত, তা হ'লেও বিশেষ আশঙ্কার কারণ থাকৃত না।

সীতানাথ চিন্তামগ্ন হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন; সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যেন তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। শৈলেন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আমি ত দূরে থাকি—আপনি সদা সর্ব্বদা কাছে কাছে থেকেও কখন কিছু তেমন দেখ্‌তে শুন্‌তে পান না?"

সীতা। দেখ্‌বার মধ্যে, অমরের অসুখের যেদিন বড় বাড়াবাড়ি—তুমি ডাক্তার আন্‌তে গিয়ে ট্রেণ্ ধর্‌তে না পেরে আস্‌তে পার্‌লে না—সেই রাত্রিতে মায়ার ব্যাকুলতাটা যেন খুব বেশী হ'য়েছিল—দেখেছিলাম! কিন্তু তা ত অন্য কারণেও হ'তে পারে?

শৈলেন এই কথা শুনিয়া, যেন সংশিত বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়া বলিল—"তাই ঠিক, দাদামশায়! অমরও আমাকে একখানা চিঠি লিখেছে; স্পষ্ট কিছু না লিখ্‌লেও তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, সে কোন একটা প্রবল প্রলোভন বা আকর্ষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌ছে। এত দিক্ দিয়ে যখন মিল্‌ছে, তখন আর এ সংশয়টাকে মিছে ব'লে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক কি?"

সীতানাথ স্তব্ধভাবে বসিয়া, একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আমি এখনও বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না, শৈলেন! যা'র কিছু চুরি যায়, অনেক সাধুলোক্‌কেও তা'র চোর ব'লে সংশয় হয়। সহস্র রকমের অনুমান সেই সংশয়ের প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত হয়। কিন্তু আসল চোর ধরা পড়্‌লে, পূর্ব্বের সেই সকল সংশয় যে ভ্রান্ত, সেটা সে বুঝ্‌তে পারে। অমরের মনের কথাটা কি, আগে বুঝে দেখ! তা'র পর বোঝা যাবে, কি ঠিক আর কি অঠিক। মায়ার দেব-চরিত্রে ত আমার

তিলপ্রমাণও সংশয় হয় না। তা'র অন্তরে যে বিন্দুমাত্র পাপ, শঠতা বা নীচতা লুকান থাকতে পারে, তা'র মুখ দেখে তা বোধই হয় না। যাই হ'ক, তুমি যা অনুমান কর্‌ছ, তা'ই যদি হয়, ত তা'র প্রতিকার কি বলদেখি?"

শৈল। প্রতিকার—মায়াকে স্থানান্তরিত করা।

সীতা। সেটা তুমি যত সহজ মনে কর্‌ছ, আমি তা করি না। তা'র কি অপরাধ—তা'কে সরাবই বা কোথায়?

শৈল। এ যে দেখ্‌ছি আপনার অতিরিক্ত উদারতা, দাদামশায়! আপনাকে বাঁচিয়ে, তা'র পরে ত পরকে বাচাতে হবে? সরাবার স্থানের ভাবনা কি? ইচ্ছে করেন, ত তিনি আমাদেরই বাড়ীতে গিয়ে অনায়াসে থাকতে পারেন! আমার ভগিনী নেই, মা তাঁকে নিজের মেয়ের মত যত্নে রাখ্‌বেন।

সীতা। উদারতার জন্যে নয়, শৈলেন! স্বার্থের জন্যেই আমি এই কথা বল্‌ছি। মায়াকে সরিয়ে দিলে, আমার এই সংসারটি একেবারে অচল হ'য়ে পড়্‌বে। কারু জন্যে কিছু একেবারে অচল হয় না বটে; কিন্তু ঠিক তেমনটি চলে কি? তার চেয়ে বরং অমরকেই তুমি হাওয়া-বদলের অছিলায় দিনকতক তোমাদের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখ! পরে আমি সেইখানেই তা'র থাকবার স্থায়ী বন্দোবস্ত ক'রে দেব। প্রভাও সেইখানেই থাকবে। তা হ'লে আমার সংসারে কোনরূপ বিশৃঙ্খলতা ঘট্‌বে না।

সেই সময়ে অমর সেই স্থানে উপস্থিত হইল। শৈলেন্‌কে তাহার সহিত নির্জ্জনে কথা কহিবার অবসর প্রদান করিবার ইচ্ছায়—"তোমরা কথাবার্ত্তা কও! আমি একবার বাড়ী থেকে আস্‌ছি"—বলিয়া, তিনি উঠিয়া আসিলেন।

বাড়ীর ভিতরে আসিয়া সীতানাথ মায়াকে খুঁজিলেন। সে তখন কাপড় কাচিতে গিয়াছে। গৌরী-ঠাকুরাণীর সহিত দুইচারিটা বাজে কথা কহিয়া তিনি ফিরিতেছিলেন; রাধারাণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ বাবা! শৈলেনের মুখে প্রভার খবর কিছু পেলে, সে এখানে আস্‌তে টাস্‌তে চায়—শুন্‌লে?"

"শৈলেন্‌কে তা কিছু জিগেসা করিনি। তবে প্রভাকে আন্‌বার কথা লিখেছিনু, তা'র উত্তর পেয়েছি—তা'রা আছে ভাল; এখানে আস্‌বার সম্বন্ধে প্রভার সেই একই কথা।"

"এ যে তোমারই অন্যায় বাবু! কোথাকার কে—কা'র সইএর বউএর বকুলফুল কি গোলাপফুল, তা'র জন্যে সে নিজের সোয়ামীর ঘর কর্‌তে পাবে না?"

"আমি কি তা'কে আস্‌তে মানা ক'রেছি রাধা, না থাক্‌তে মানা ক'রেছিলেম? তাঁ'র জন্যে আমার ঘরের লোকগুলিকে এখন কোথা তাড়িয়ে দি বলদেখি?—যাক্, এসব কথা যেন মায়া না শোনে—সে দুঃখ কর্‌বে।"

মায়া ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল—"কি কথা, দাদামশায়?—শুন্‌লে দুঃখু কর্‌ব না; না বল্‌লে কিন্তু তা কর্‌ব।"

সীতানাথ যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"এই, প্রভা এখানে আস্‌তে চায় না—সেই কথা আর কি"—বলিয়া, বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সীতানাথ চলিয়া গেলে রাধারাণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বাবা কত রকমই জানেন! তোমার কাছে তোমার মত, আমার কাছে আমার মত! এই মাত্তর্ আমার কাছে ব'সে, তোমার জন্যে প্রভাকে নিয়ে ঘর-সংসার কর্‌তে পার্‌ছেন না ব'লে, কত দুঃখ কর্‌লেন—কত কথাই

বল্‌লেন ; আবার যাবার সময়ে মানাটিও করা আছে—"মায়া যেন না শোনে" !—বলিয়া, হাসিতে হাসিতে স্বস্থানে গমন করিলেন।

রাধারাণীর কথাগুলি আজ মায়ার প্রাণে লাগিল। সীতানাথ যে তাহার জন্যই প্রভাকে আনিতে পারিতেছেন না—একথা নূতন নহে, মায়াও তাহা জানে ; কিন্তু তাহার অসাক্ষাতে এই কথার আন্দোলনটা তাহার অন্তরে একটু আঘাত করিল। তাহার হাসিটুকু সহসা মিলাইয়া গেল, বুক কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাসও নির্গত হইল, চোখ দিয়া দুই এক ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িল। সেসকল কেহই দেখিতে পাইল না। পরক্ষণেই সকলে দেখিল, মায়া গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছে, যেমন হাসে তেমনি হাসিতেছে, সর্ব্বদা সকলের সঙ্গে যেমন হাস্য-পরিহাস করে তাহাও করিতেছে, নিত্য যেমন দিবসের কার্য্যশেষে রাত্রির ও রাত্রির কাজ শেষ হইলে পরদিনের জন্য যথাসম্ভব আয়োজন করিয়া রাখে, তাহাও করিল। কিন্তু হাসি, পরিহাস, কাজ ও কথার মধ্যেই সে যেন আজ কিছু অন্যমনস্ক। গৌরীঠাকুরাণী আজ তাহার কার্য্যের দুই একটা ভুলও ধরিয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাজীমাৎ।

চিকিৎসায় অমরের বেশ পসার্ হইয়াছে। সে বেলা আট্‌টা সাড়ে-আট্‌টা পর্য্যন্ত উপস্থিত রোগীদের ঔষধের ব্যবস্থা করে, তাহার পরে দূরের রোগী দেখিতে বাহির হয়। আজ দূরের একটা বড় জরুরী ডাক আসিয়াছিল বলিয়া সে প্রথমেই বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। শৈলেন একাকী

কিছুক্ষণ ফুলবাগান ও দীঘির ধারে বেড়াইয়া সীতানাথের সন্ধানে বিশ্রাম-কুটিরে উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, সীতানাথ প্রত্যহ খুব প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া থাকেন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তাঁহার স্নান হইয়া যায়, আহ্নিক পূজা শেষ করিয়া, তিনি প্রভাতেই নামিয়া আসেন। আজ তিনি তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নাই। তিনি জাগিয়াও আলস্যপ্রযুক্ত শয়ন করিয়া আছেন ভাবিয়া, শৈলেন পরিহাস করিয়া বলিল—"দাদামশায়ের কুঞ্জে, প্রভাতটা বোধ হয় কিছু বিলম্বেই হয়!"

শৈলেন্‌কে বসিতে বলিয়া সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভাতের কথা কি বল্‌ছিলে, শৈলেন?"

"বল্‌ছিলাম যে, প্রভাতের আলোটা বোধ হয় এই সব ঘন গাছের নিবিড় ছায়া ঠেলে শীঘ্র আপনার এই নিভৃত কুঞ্জ-কুটিরে প্রবেশ কর্‌তে পারে না!"

"না ভাই, আমার প্রতিবেশী পাখীগুলি খুব প্রত্যুষেই প্রতিদিন আমাকে জাগিয়ে তোলে। তা'রা প্রত্যহ যেমন ডাকে, ডেকে গেছে; শরীরটা ভাল নয় ব'লে আমি আজ তাদের সঙ্গে উঠ্‌তে পারিনি—গত রাত্রে ভারি জ্বর হয়েছে। তুমি যে একাটি বেড়াচ্ছ—অমর কোথা?"

"ভোরেই একটা ডাক এসেছিল—সে বেরিয়েছে।"

"তা'র মনের কথা কিছু পেলে?"

"সে কি সহজে পাব—মনে করেন? বল্‌বে ব'লে নিজেই আমাকে পত্র লিখে ডেকে এনেছে—আর আমি যেই এসেছি, অমনি—এখন নয় তখন, আজ নয় কাল, এবেলা নয় সেবেলা—এই কর্‌ছে। আজ ত আবার দিন প'ড়েছে; দেখি, কি হয়।"

সেই সময়ে কুটিরের বাহিরে একটা ঠুক্ ঠুক্ শব্দ শুনা গেল।

সীতানাথ কাণ পাতিয়া শব্দটা শুনিয়াই বলিলেন—"বোধ হয়, মঙ্গলা আস্‌ছে ; দেখ—আবার কি খবর নিয়ে এল !"

বলিতে বলিতেই মঙ্গলা কুটিরদ্বারে উপস্থিত হইল, এবং কোন কথা না কহিয়া, মেঝের উপরে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ বড় বিষণ্ণ ; দেখিলেই বুঝা যায় যে, সে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছে। তখনও তাহার কোটরগত-অক্ষিকোণে এবং জরাকুঞ্চিতগণ্ডে অশ্রু প্রকাশ পাইতেছিল। সে নীরবে বসিয়া আঁচলের খুঁট দিয়া ঐ দুইটি স্থান ধীরে ধীরে মুছিতেছিল। সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে রে মঙ্গ্‌লা ?—তুই যেন ভারি কেঁদেছিস্‌—বোধ হচ্ছে !—কেন বল্‌ দেখি ?"

সীতানাথের প্রশ্নে যেন মঙ্গলার অচিরনিরুদ্ধ অশ্রুর প্রস্রবণ একটা নূতন পথ পাইয়া উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমার কপাল যদি না মন্দ হবে, কত্তাবাবু, তবে এসব হবে কেন ? যে আমাকে একটু যত্ন আত্তি কর্‌বে, পোড়া ভগ্‌বান্‌ তাকেই সরিয়ে দেবে ! এত নোক মরে—আমার মরণ নেই !"—বলিয়া সে আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

সীতানাথ যত তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া তাহার দুঃখের হেতু কি তাহা জানিতে চাহেন, মঙ্গলা ততই কাঁদে, আর বাজে কথা কহিয়া আসল কথা চাপিয়া রাখে। শেষে সীতানাথ একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কি হ'য়েছে—বলিস্‌ ত বল্‌ ; আর না বলিস্‌ যদি, ত বাড়ীতে গিয়ে কাঁদ্‌গে যা ! একে জ্বরের যাতনায় মর্‌ছি—তা'র ওপর তুই আবার এখানে ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ প্যান্‌ প্যান্‌ কর্‌তে এলি কেন বল্‌ দেখি ?"

মঙ্গলা বোধ হয় সে কথা শুনিতে পাইল না ; সে কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁগা কত্তাবাবু ! এখানে যারা কোন কাজে নাগে

না, ও-পুরীতেও বুঝি তাদের দরকার হয় না—যমও ত কৈ তাদের নিতে চায় না ?"

"সে কথা ঠিক, মঙ্গলা ! তা'র সাক্ষী এই দেখ্‌না—আমারও মরণ নেই ! তোকে কে কি ব'লেছে বল্ দেখি, আমি একবার তা'কে খুব ধম্‌কে দিয়ে আসি গে !—রাধা কিছু ব'লেছে কি ?"

"তিনি কবে না বলেন, তাঁর কথায় কি আমি কোন দিন কাঁদি ?"

"তবে কে—মায়া বুঝি ?"

মঙ্গলার রোদনের বেগ একটু কমিতেছিল, সীতানাথের প্রশ্নে আবার তাহা প্রবল হইয়া উঠিল। সে আবেগভরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"সে কি কারুকে কিছু বল্‌বার মেয়ে গা—সে কেন আমাকে দশ কথা শোনাতে রইল না—এমন ক'রে কাঁদিয়ে আমাকে ফেলে চ'লে গেল কেন, কত্তাবাবু"—বলিয়া, মঙ্গলা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সীতানাথ বিদ্যুদ্‌বেগে একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"কি বল্‌ছিস্ মঙ্গলা ?—মায়া চ'লে গেছে ?"

"তবে আর কা'র জন্যে সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে মর্‌ছি ? চার্ দিক্ খুঁজে এনু—কোথাও নেই—"

সীতানাথ শয্যার উপরে বসিয়া পড়িয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া তিনি পুনর্ব্বার দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং "তুমি একটু অপেক্ষা কর, শৈলেন !—ব্যাপারটা কি, আমি ঠিক্ ক'রে বুঝে আসি"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সীতানাথ বাড়ীর ভিতরে আসিয়া শুনিলেন, মঙ্গলার কথা মিথ্যা নহে—মায়া সত্য সত্যই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলেন, সে একাকিনী যায় নাই—'রামের মা' বলিয়া যে বর্ষীয়সী বিধবা পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তিনিও তাহার সঙ্গে গিয়া-

ছেন। 'রামের মা' বিশ্বস্তা; কোন বিষয়ে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া কখন, কাহাকেও ঠকিতে হয় নাই। শুধু বিশ্বস্তা নহে, চতুরাও বটে; মঙ্গলা বলিয়া থাকে, "রামের মা অনেক পুরুষের কাণ কাটিয়া দিতে পারে।" 'রামের মা'র চরিত্রও বেশ পবিত্র। অতএব তিনি মায়ার সঙ্গে গিয়াছেন শুনিয়া, সীতানাথ কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। 'রামের মা' সঙ্গে থাকিতে, পথের কোন বিপদ সহজে মায়াকে জড়াইতে পারিবে না। কিন্তু মায়া গেল কেন?

রাধারাণীকে ডাকিয়া সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাধা! মায়া এতদিন পরে আজ এমন হঠাৎ চ'লে গেল কেন বল দেখি?"—"কি জানি বাবু, তুমিই জান আর সে-ই জানে"—"সেদিন আমি চ'লে গেলে তা'র সঙ্গে তোমার কোন কথা হয়েছিল?"—বলিয়া রাধারাণীর মুখের উপরে সীতানাথ তাঁহার মর্ম্মভেদী তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মনে পাপ থাকিলেই জিহ্বায় যেন কেমন একটা জড়তা আসিয়া পড়ে। রাধারাণী প্রথমেই একটু থতমত খাইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"হ্যাঁ"; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন—"না! কই কি কথা?—কিছুই ত নয়?"

সীতানাথ বোধ হয় তাহাতেই যাহা বুঝিবার, তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি সে বিষয়ে আর কোন কথা কহিলেন না; গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"টাকার বাক্সের চাবিকাঠিটা মায়া রেখে যায়নি?"

"বাক্সের আংটাতে বাঁধা ছেল, কেউ খুলবে টুলবে ব'লে আমি নিয়ে রেখেছিনু—এই নাও!"—বলিয়া রাধারাণী সেটা অঞ্চল হইতে খুলিয়া দিলেন। সীতানাথ বাক্স খুলিতেই একটা খরচের ফর্দ্দ পাইলেন। তাহারই সঙ্গে একখানা খোলা চিঠিও ছিল।

মায়া লিখিয়া গিয়াছিল :—"দাদামশায়—প্রভা আর কতকাল এমন ক'রে বাপের বাড়ীতে প'ড়ে থাকবে? আমি এখানে থাকতে সে আসবে

না। আমার কোথাও যাবার ঠাঁই নেই ব'লে কি সে তা'র স্বামীর ঘরে আস্‌তে পাবে না? আমাকে আপনি যেতে বল্‌বেন না। আমি যেতে চাইলেও আপনি অনুমতি দেবেন না। এ অবস্থায় আমার এই রকম ক'রে চ'লে যাওয়া বই আর উপায় কি?

আমার জন্যে ভাব্‌বেন না! আমি রামের মা'কে সঙ্গিনী পেয়েছি। তা'র জানাশুনা একজন আপনার বয়সী বৃদ্ধলোক স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থবাস কর্‌তে চ'লেছেন। তাঁ'র টাকা আছে, পুত্রকন্যা নেই; সেবাশুশ্রূষা কর্‌বার মত আপনার জনও কেউ নেই। 'রামের মা'কে তাঁরা অনেক দিন থেকেই ডাক্‌ছিলেন। সে কেবল আমার জন্যেই যেতে পারে নি। তাঁরা দয়া ক'রে আমাদের দু'জনকেই সঙ্গে নিতে রাজী হয়েছেন।

আপনার স্নেহের শীতল ছায়া ছেড়ে কোথাও যেতে আমার ইচ্ছে ছিল না। প্রভা যদি আস্‌ত—মিলে মিশে থাক্‌ত, তা হ'লে আমি কোথাও যেতাম না—কি জন্যে যাব? কিন্তু সে তা কর্‌লে না। অনেক দিন অপেক্ষা ক'রেও ত দেখ্‌লাম্। কাজেই তা'র সুখের জন্যেই আমাকে চ'লে যেতে হ'ল। না ব'লে গিয়ে ভাল কর্‌ছি কি মন্দ কর্‌ছি, তা জানি না। এজন্যে কি আপনি আমার উপরে রাগ কর্‌বেন? আমার বুদ্ধিতে ত এখন ভাল কর্‌ছি ব'লেই মনে হচ্ছে। এতে যে আমার একটুও দুঃখ নেই, এমন নয়। কিন্তু আমি থাক্‌লে যে প্রভা দুঃখ পায়—দাদামশায়!—আপনারাও সকলে দুঃখ পান। সবার দুঃখ বড়, না আমার একার দুঃখ বড়? আপনাকে না ব'লে চ'লে গিয়ে যদি দোষ ক'রে থাকি, মার্জ্জনা কর্‌বেন!

টাকা কড়ি যা দিয়েছিলেন, ফর্দ্দমত মিলিয়ে নেবেন। আমার গয়নার বাক্স আপনার কাছেই রইল—আমি পরের বাড়ী দাসীপনা কর্‌তে চ'লেছি,

গয়না নিয়ে গিয়ে কি কর্‌ব? আপনার টাকা থেকে উপস্থিত পথ-খরচের জন্যে পাঁচটি টাকা আমি নিয়ে গেলাম। আমার প্রণাম—শত সহস্র প্রণাম রইল। আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন, যেন ধর্ম্মে আমার মতি থাকে! আশা করি, আপনার স্নেহে কখনও বঞ্চিত হব না!—আপনার স্নেহের মায়া।"

সীতানাথ চিঠিখানি রাখিয়া, ফর্দ্দখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন; এবং বাক্সের চাবিকাঠি রাধারাণীকে দিয়া বলিলেন—"রাধা! এই নাও! মায়া যেমন ক'রে চালাত—দেখেছ ত?—তেমনি ক'রে সংসার চালাতে চেষ্টা ক'রো—যেন কা'রও কোন বিষয়ে কষ্ট না হয়!"

রাধারাণী খুসীমনে ও হাসিমুখে চাবিকাঠি আঁচলে বাঁধিয়া সুচির-বাঞ্ছিত গৃহিণীপনার ভার গ্রহণ করিলেন। মায়াকে তাড়াইবার জন্য তিনি এতদিন ধরিয়া যে খেলা খেলিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার জিত হইয়াছে। জয়ের উল্লাসে ও কূট কৌশলের সাফল্যজনিত গর্ব্বে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনের কথা।

সীতানাথের কৃত্রিম শৈলের নিম্নদেশে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর। দিবা-শেষে, অমর ও শৈলেন তাহার উপরে বেড়াইতে আসিয়াছে। মাঠে তখন কোন ফসল ছিল না। যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর শুধু শূন্য মাঠ—তরুশূন্য, তৃণশূন্য, বিশাল—ধূ ধূ করিতেছে! গ্রীষ্মের তীব্র তপন-তাপে মৃত্তিকা শুষ্ক ও স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে বড় বড় চিড় দেখা দিয়াছে! একস্থানে শুষ্কনীর একটি অগভীর, ক্ষুদ্র

জলাশয়ের উপরে কচি কচি ঘাস জন্মিয়াছিল। অমর ও শৈলেন সেই শষ্পাবৃত নিম্ন ভূমিভাগে পাশাপাশি বসিয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল।

শৈ। আমি ত আর থাক্‌তে পার্‌ছি না, অমর! কালই আমাকে যেতে হচ্ছে। কি জন্যে আমাকে আস্‌তে লিখেছিলি, তা ত কই আজও বল্‌লি না? বল্‌তে হয়, ত এইবেলা বল্!—এ স্থানটি বেশ নির্জ্জন—কেউ কোথাও নেই, মনের লুকান কথা বল্‌বার উপযুক্ত স্থান!

অমর চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, বিষণ্ণমুখে একটু হাসিয়া বলিল—“মাঠটি বেশ! ঠিক্ আমার হৃদয়ের মত শুষ্ক—শূন্য—নিরানন্দময়! এ মাঠও আবার একদিন শ্যাম শস্য-সম্পদে শোভিত হবে; কিন্তু আমার হৃদয়ের আর কখন আনন্দপূর্ণ হবার আশা নেই!”—বলিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, পুনশ্চ বলিল—“স্থানটি উপযুক্ত হ’লে কি হবে, শৈলেন—যে কথা বল্‌ব ব’লে তোকে আস্‌তে লিখেছিলাম, সে কথা বল্‌বার আর কোন দরকার হচ্ছে না।”

শৈ। বেশ! বল্‌বি ব’লে এতদূর ডেকে নিয়ে এসে—‘আর দরকার হচ্ছে না’—কি রকম?

অ। সত্যই তা’ই। মনে একটা ভুল সংশয় উপস্থিত হ’য়ে দিনকতক আমাকে ভারি জ্বালাতন ক’রে তুলেছিল। সে কথা চিঠিতে লেখ্‌বার মত নয় ব’লেই তোকে আস্‌তে লিখেছিলাম। সে সব সংশয় এখন মিটে গেছে—নিজের ভুল নিজেই বুঝ্‌তে পেরেছি।

শৈ। তা হ’লেও আমাকে বল্‌তে আর ক্ষতি কি?—সংশয়টা কি হয়েছিল, আর তা’র সিদ্ধান্তই বা কি হ’ল—শুনিই না!

অ। বল্‌তে পারি, যদি কারুকে না বলিস্!—দাদামশায়কেও বল্‌বি না—বল্?

শৈলেন শ্রুতকথা গোপন রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলে, অমর বলিল—

"পদ্মার সেই মুখখানি আমি আজও ভুল্‌তে পারিনি, শৈলেন! অনেক দিন পূর্ব্বে একবার তা'কে স্বপ্নে দেখেছিলাম—সে কথা বোধ হচ্ছে তোকে ব'লেছি; তা'র পরে অনেকদিন গেল,আর তা'কে স্বপ্নেও দেখিনি। সেদিন এই অসুখটার পরে আবার সেই মুখখানি আমার চোখে প'ড়েছিল। বিকারের ঘোরটা তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি বটে, কিন্তু সে দেখাটাকে স্বপ্ন বা ভ্রান্তি বল্‌তেও পারি না। বিকারের খেয়ালে কত রকম দেখেছি, কত কি ব'লেছি, তা'র বিন্দু-বিসর্গও এখন মনে কর্‌তে পারি না—এরা এখন গল্প করে, আমি শুনে হাসি! এটা কিন্তু তা নয়। এ দেখাটা ঠিকই; তবে হয়ত একজন মানুষের মত আর একজনের মুখ থাক্‌তে পারে! মায়াবতী এতদিন আমাদের বাড়ীতে ছিল—আমি কখন তা'কে দেখিনি, সে-ও কখন আমার সম্মুখে বেরুত না। অসুখের সময় হঠাৎ একদিন তা'কে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। দেখ্‌লাম, তা'র মুখ-চোখ অবিকল পদ্মার মত! তা'তেই আমার সংশয় হয়েছিল, হয়ত পদ্মার মরণের কথাটা মিছে—সেই হয়ত মায়াবতী নামে আমাদের বাড়ীতে এসে রয়েছে! ভজা আর আমি ছাড়া আমাদের বাড়ীর আর কেউই তা'কে দেখেনি। ভজা ম'রে গেছে। আমার সম্মুখে পদ্মা বেরুত না। সুতরাং ছদ্মভাবে এখানে থাকা তা'র পক্ষে একটুও কঠিন নয়। তা'র বেঁচে থাকাটা যে সম্ভব নয়, একথাও আমার মনে হ'ত; কিন্তু তবুও কেমন এই সংশয়টাকে মিছে মনে ক'রে আমি মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পার্‌তাম না। মনে কর্‌তাম, সুবিধে হ'লে একদিন মায়াকেই এ-কথা জিগেসা ক'রে দেখ্‌ব। তা'তে আবার এমনটাও মনে ভয় হ'ত যে, যদি সে আমার অভিপ্রায় বুঝ্‌তে না পেরে—অন্য রকম কিছু একটা ভেবে নিয়ে—একটা হৈ চৈ ক'রে তোলে তা' হ'লে মুখ দেখান ভার হবে! দাদামশায় বা অন্য কারুকে এ কথা বলব মনে

ক'র্লেও যেন লজ্জায় মাথা ঝুলে প'ড়্ত! ভাব্তাম, যদি তা না হয়? না হওয়াই বেশী সম্ভব। সে যদি পদ্মাই হবে, ত এমন লুকিয়ে থাক্বে কেন? আবার ভাব্তাম, হয়ত বা লজ্জায়, অভিমানে, দুঃখে, সে আত্ম-প্রকাশ ক'র্তে চায়নি। এই রকম সাত পাঁচ ভাবনায় মনটা দিনকতক আকুল হ'য়ে উঠেছিল। মনের সেই অবস্থায় তোকে পত্র লিখেছিলাম। এখন মনে হ'চ্ছে, ভাগ্যে তখন আর কারুকে এ সব কথা বলিনি! তা হ'লে কি হ'ত?"

শৈ। যাক্—তা' হ'লে আমি যা ভেবেছিলাম, তাও মিছে!

অ। তুই কি ভেবেছিলি?

শৈ। আমি তোর পত্রের ভাবে মনে ক'রেছিলেম, বুঝি প্রভার কথাই ঠিক; এখন বুঝ্ছি যে, তা' নয়।

অমর সুপ্তোত্থিত শার্দ্দূলের মত গর্জ্জিয়া উঠিল—"কি বল্লি, শৈলেন! —প্রভার কথাই ঠিক্? তুই কি আমাকে এতই অনাত্মবশ, অসংযতচিত্ত, অপদার্থ মনে করিস্? না শৈলেন! যে তোদের সঙ্গে এতদিন কাটিয়ে এসেছে—ছেলে বেলা থেকে দাদামশায়ের মত লোকের চোখের ওপরে থেকে মানুষ হ'য়েছে, তা'র সম্বন্ধে এমন নীচ, ঘৃণ্য, জঘন্য সংশয়কে মনে স্থান দেওয়া তোর উচিত হয়নি!"

শৈলেন হাসিয়া বলিল—"আর যিনি হাতে গ'ড়ে তোকে মানুষ ক'রেছেন, তিনিও যদি এই রকম সংশয় ক'রে থাকেন, ত কি বল্বি?"

অমরের মুখ ম্লান হইল। স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, সে ক্ষুব্ধ-চিত্তে বাষ্পাবেগকম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল—"দাদামশায়ও যখন আমার চরিত্র সম্বন্ধে এইরকম নিন্দিত সংশয়কে স্থান দিতে পারেন, তখন আমার জীবনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না, শৈলেন!—মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ!"—বলিতে বলিতেই তাহার নেত্রযুগল

অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতেই তাঁহার উভয় গণ্ড প্লাবিত করিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইল। অমর মুখে হাত চাপা দিয়া বালকের মত আবেগভরে কাঁদিতে লাগিল।

শৈলেন অপ্রতিভ হইয়া, তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিল—"তুই এমন ছেলেমানুষ—তামাসা বুঝিস্ না—ছি! দাদামশায়ের মন এত অনুদার বা সঙ্কীর্ণ নয়, অমর! আমিই প্রভার কথা শুনে, আর তা'র পরে তোর পত্র পেয়ে এই রকমটা সংশয় ক'রেছি মাত্র, সত্য ব'লেও বিশ্বাস করিনি! অস্খলিত-যৌবন দেব-চরিত্রেও দুর্ল্লভ, অমর! রূপ ও গুণের মনোমুগ্ধকরী শক্তিও দুর্ব্বার। মায়াবতীর সে সকল অসাধারণ ছিল—শুনেছি। তা'তেই এই রকমটা আমার মনে হয়েছিল।"

অমর দুই করে চক্ষু মার্জ্জন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"তোদের মনে যখন এ রকম সংশয় হ'তে পারে, তখন আমার কথাতেও হয়ত তোদের বিশ্বাস হবে না! না হ'ক, ধর্ম্ম আমার সাক্ষী! এই সৌম্য সন্ধ্যায়, তারকা-খচিত উদার উন্মুক্ত গগনের তলে ব'সে, অনন্তকে সাক্ষী ক'রে বল্‌ছি, শৈলেন!—পদ্মা ছাড়া আর কোন স্ত্রী কখনও এ হৃদয়ে স্থান পায়নি —কখন পাবেও না! জোর ক'রে তোরা প্রভার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিস্, তোদের খাতিরে আর কর্ত্তব্যের অনুরোধেই কেবল আমি তা'র প্রতি শিষ্টব্যবহার ক'রে এসেছি। আমার মন কিন্তু চিরদিনই পদ্মার অনুরাগী। সে জীবিতই থাকুক আর মৃতই হ'ক, আমি চিরজীবন তা'র বিরহ-ব্রত পালন কর্‌ব। হিন্দুর অশিক্ষিত বালবিধবা,সেই শুভদৃষ্টি মুহূর্ত্তের অস্পষ্ট দেখা স্বামীর স্মৃতি নিয়ে, পুনর্ম্মিলনের আশায় মৃত্যুর পথ চেয়ে, দীর্ঘজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্‌তে পারে; আর আমরা উচ্চ শিক্ষার ও জ্ঞানের বড়াই নিয়ে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প কঠোর ব্রহ্মচর্য্য—একটু সংযম মাত্রও পালন কর্‌তে পারি না? অসাধারণ রূপ

ও গুণে মানুষের মন আকৃষ্ট হয়, তা ঠিক। সকলের মুখে মায়াবতীর রূপগুণের প্রশংসা শুনে শুনে, আমার হৃদয়ের প্রীতিভাব যে তা'র প্রতি ধাবিত হয়নি—এ কথা বল্‌তে পারি না। কিন্তু সে পবিত্র প্রীতিভাব কামনা-সম্পর্কশূন্য কি না—দেবতাভক্তির অনুরূপ কি না, তা অন্তর্যামী দেবতাই জানেন! এ প্রীতিভাব যদি পরস্ত্রীর প্রতি অবৈধ অনুরাগের তুল্য হয়, আর তা'র ফলে আমাকে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হয়, তবে বুঝ্‌ব যে, এই বিশ্বের যিনি নিয়ন্তা—মানুষের সুকৃতি-দুষ্কৃতির যিনি বিচার-কর্ত্তা, তাঁ'র কাছেও ভাল-মন্দের বিচার নেই—সেখানেও মুড়ী-মিছ্‌রীর এক দর।"

শৈ। সে যাই হ'ক, শুধু মুখের একটু সাদৃশ্য দেখেই মায়াকে তোর কি ক'রে পদ্মা ব'লে সংশয় হ'য়েছিল, সেটা আমি ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লাম না! নিজে গিয়ে দেখে শুনে অনুসন্ধান ক'রে,যা'র মৃত্যু নিশ্চয় ক'রে এলি, সে যে, আবার দানো পেয়ে, শ্মশানের চুলো থেকে উঠে তোদের বাড়ীতে কাজকর্ম্ম কর্‌তে এসেছে, এ ধারণা ত, ভাই সহজবুদ্ধিতে কারু হয় না!

অমর শূন্য দৃষ্টি দূরে নিক্ষিপ্ত রাখিয়া স্থিরভাবে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছিল ; শৈলেনের কথার উত্তরে অন্যমনস্কভাবে—"কি জানি—এ ধারণাটা কোন্ স্বপ্নরাজ্য থেকে বাতাসে ভেসে এসে আমার মনের তটে লেগেছিল, তা আমিও ঠিক্ বুঝ্‌তে পারি না"—বলিয়া আবার চিন্তায় মগ্ন হইল।

শৈ। কি ভাব্‌ছিস্?—শোন্ না! পদ্মার মৃত্যু সম্বন্ধে কি তোর কোন সন্দেহ আছে? তা যদি থাকে, ত বল্—না হয় একবার গিয়ে ভূতের সন্ধানটা ভাল ক'রে নিয়ে আসি!

অমর। আর সে-কথা নিয়ে পরিহাস করিস্ কেন, শৈলেন? ব'লেছি ত—সেটা আমার স্বপ্ন,আমার দুর্ব্বল, অলস,উদ্‌ভ্রান্ত মনের কল্পনা।

তখন যে এই সংশয়টাকে ভুল ব'লে মনে কর্‌তে পারিনি, তা'র কারণ, মানুষ যখন কোন একটা ভুল সংশয়কেও যথার্থ ব'লে ভেবে নিতে ইচ্ছে করে, তখন বিরুদ্ধ প্রমাণগুলিও অনুকূল হ'য়ে দাঁড়িয়ে, সেই ভুলটাকেই ঠিক ব'লে বিশ্বাস করিয়ে দেয়। তখন অসম্ভবগুলোও সম্ভব ব'লে মনে হ'য়েছে। মনে ক'রেছি, হয় ত যা'র মুখে আমরা পদ্মার মরণের কথা শুনে এসেছি, তাঁরও সে শোনা কথা, হয় ত তিনিও আমাদেরই মত ভুল শুনেছিলেন। তাঁদের গ্রামের তখন যে অবস্থা, তা'তে সেটা অসম্ভবও নয়। আর জনরবও অনেক সময়ে জীয়ন্ত মানুষকেও মরা ব'লে রটায়।

শৈ। তা ত বুঝ্‌লাম ; কিন্তু এতদিন একদিনের জন্যেও এ সব কথা তোর মনে হয়নি কেন ?

অ। দেখে শুনে এসে যা ধারণা হয়েছিল, তা'র বিরুদ্ধে ত আর কখন কোন কিছু দেখ্‌তে বা শুন্‌তে পাইনি!

শৈ। এখন ?—এখন কি তোর মনে হয়, সে বেঁচে আছে ?

অ। অসম্ভব! তা হ'লে এতদিন তা'র কোন খবর পাওয়া যেত না ? সম্ভব হ'ত, যদি মায়াবতীর ছদ্মবেশে এখানে থাকাটা সত্য হ'ত। তা-ও নয় ;—তা যদি হবে, ত এত কাল সে আপনাকে ঢেকে রাখ্‌বে কি জন্যে ? যদিই তা-ও রেখে থাকে, এখন এমনভাবে চ'লে যাবে কেন ? সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নেই, শৈলেন! মায়া—মায়াবতী—পদ্মাবতী নয় ; পদ্মা এ জন্মের মত চ'লে গেছে—এ-জীবনে আর তা'কে পাবার আশা নেই। তা'কে পত্নীরূপে পাওয়ার ব্যাপারটা আগাগোড়াই যেন একটা স্বপ্ন! যে পুণ্যের ফলে তা'কে পেয়েছিলাম, তা'কে পাওয়াটাই বোধ হয় সেই পুণ্যের ফল ;—পাওয়াতেই সে পুণ্যটুকুর ক্ষয় হ'য়ে গেছে। তা'কে জীবনের সঙ্গিনীরূপে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার নেই।

অমর একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরব রহিল। শৈলেনও আর কোন কথা কহিল না; তাহার সতত-পরিহাস-প্রফুল্ল মুখেও যেন গভীর বিষাদ ও চিন্তার একটা নিবিড় ছায়া ভাসিয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যা তখন অতীত হইয়াছিল। তামসী রাত্রির অন্ধকার দিগন্তের নীল বনশ্রেণীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া প্রান্তরবক্ষে ঘনীভূত হইতেছিল। দুই বন্ধু বিষণ্নমনে উত্থিত হইল, এবং নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন হইয়া নীরবে ধীরে ধীরে বিশ্রাম-কুটির-অভিমুখে গমন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কর্ত্তব্য-উপদেশ।

মায়াবতীর পলায়নের রাত্রি হইতেই সীতানাথ জ্বরভোগ করিতেছেন। জ্বর যে তাঁহার খুব বেশী, তাহা নহে। অন্য সময়ে এমন সামান্য একটু আধটু জ্বর তিনি গ্রাহ্যই করেন না; তাহার উপরেই উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়ান, কাজ কর্ম্মও যথাসাধ্য করিয়া থাকেন। এবারে কিন্তু এই সামান্য জ্বরটুকুতেই তিনি যেন বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন! বিশ্রাম-কুটির ছাড়িয়া, দিনের মধ্যে একবারও তিনি কোথাও যাইতে পারেন না—সর্ব্বদাই বিছানায় পড়িয়া থাকেন। মায়ার আকস্মিক পলায়নে তাঁহার মনেও বোধ হয় একটা আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁহার দেহ ও মন দুই-ই যেন একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

সন্ধ্যার পরে তিনি কুটিরে শয়ান আছেন, এমন সময়ে অমর ও শৈলেন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। শৈলেন জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কেমন আছেন, দাদামশায়?—জ্বরটা ক'মছে কি?" অমর তাঁহার ললাটের

ও গাত্রের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া বলিল—"ক'মছে কোথা—জ্বর ত সমানই ভোগ হচ্ছে!"

সীতানাথ তাহাদের দুইজনকে বসিতে বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমরা দু'জন হোমরা চোমরা দু'টো ডাক্তার রয়েছ, আমার জ্বরটাকে তাড়াতে পারছ না?"

শৈ। জ্বর ত আর লাঠি মেরে তাড়াবার নয়—দাদামশায়! আপনি ত ওষুধ খাবেন না?

সীতা। না, ভাই! এ বয়েসে আর তোমাদের স্বাদু ও সুগন্ধি 'মিক্শ্চার'গুলো ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঢক্ ঢক্ ক'রে খেতে পারি না! আমার এ পোষা জ্বর—মাঝে মাঝে আসে যায়; দু'চারদিন উপোস ক'রলেই পালাতে পথ পাবে না। জ্বর আর পর খেতে না পেলেই পালায় —জানত?

অমর। ওষুধ না খেলে দাদামশায় আর সকলকে খুব বকতে পারেন —ওঁকে ত আর বকবার কেউ নেই।

শৈ। এ আপনি কি বোঝেন, তা জানি না—ওষুধ না খেয়ে রোগে ভুগে ভুগে মরাকে কি আপনি একরকম আত্মহত্যা বলেন না?

সীতা। ওষুধ খাই না—কে ব'লেছে? তোমাদের ঐ সব বিদেশের আমদানী যাচ্ছেতাই গুলো বই কি আর জগতে ওষুধ নেই?

অমর। কাজ কি আপনার সে সব ওষুধ খেয়ে—কবিরাজী ওষুধই খান!

সীতা। কিছু দরকার নেই—আমি খুব উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করছি—ডাক্তার-কবিরাজের অচিকিৎস্য—শিবের অসাধ্য, ভবরোগ থেকে যিনি মুক্ত ক'রতে পারেন, আমি সেই বিষ্ণুর অকালমৃত্যুহরণ, সর্ব্ব-ব্যাধি বিনাশন চরণামৃত নিত্য পান ক'রছি।

অমর। আমার অসুখের সময়ে তবে এ-ডাক্তার সে ডাক্তার ক'রে কতকগুলো টাকা নষ্ট কর্‌লেন কেন?

সীতানাথ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"তোমার অসুখে আর আমার অসুখে সমান হ'ল, অমর?"

শৈ। আচ্ছা, আপনাকে ওষুধ খেতে হয় কি না—দেখ্‌ছি; কালই আমি টেলিগ্রাম ক'রে মাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

"না—ও মতলব ক'রো না! মিছে কেন সে ব্রাহ্মণের মেয়েকে ছুটোছুটি করাবে? আমার সময় হ'লে কি ওষুধ খাইয়ে তোমরা আমাকে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে? মূলে কুঠারের ঘন ঘন আঘাতে যে গাছ পড় পড় হ'য়ে, হেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা'কে দড়ি-দড়া বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা কেন? সে গাছে আর ফুলও ফুট্‌বে না, ফলও ধর্‌বে না!"—বলিয়া, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সীতানাথ পুনরপি বলিলেন—"যদি এমন বুঝ্‌তাম যে, যতদিন বেঁচে থাকা যায়, ততদিনই দেহ বেশ সবল—কর্ম্মক্ষম থাকে, আর ওষুধপত্র খেয়ে বেঁচে থাকা যদি মানুষের সাধ্য হয়, তা হ'লে ত সবারই তা'করা কর্ত্তব্য। তা' ত হয় না!—বয়েসে দেহ হীনবল হ'য়ে পড়ে, ইন্দ্রিয় সব শিথিল হ'য়ে পড়ে, দর্শনশক্তির হ্রাস হয়, শ্রবণশক্তিও ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে, চলৎশক্তি থাকে না, মুখের কথা পর্য্যন্ত কেউ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারে না। সে অবস্থায় শুধু যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বার জন্যে আর আত্মীয়-গণকে কষ্ট ভোগ করাবার জন্যে জড়ভরত হ'য়ে বেঁচে থাক্‌বার চেষ্টা কর্‌বারও বিশেষ কি প্রয়োজন আছে, তা বুঝ্‌তে পারি না। মরণের নির্দ্ধারিত কাল যতক্ষণ উপস্থিত না হচ্ছে, ততক্ষণ ত আর মাথা কুড়্‌লেও মরণ হচ্ছে না!"

অমর দীনদৃষ্টিতে সীতানাথের মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার কথা-

গুলি শুনিতেছিল। কোন কারণে তাঁহার মনে যে একটা গভীর নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার কণ্ঠস্বরে এবং কথার ভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়া, সে নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিল।

শৈ। আপনি তা ব'লে এখনই এরকমের কথা বল্‌বেন না, দাদামশায়! শুন্‌লেও যে আমাদের বড় কষ্ট হয়! দেখুন—অমর আপনার কথা শুনে মুখখানি শুকিয়ে ব'সে রয়েছে! আপনি ত পরের জন্যেই বেঁচে আছেন! আপনার আশ্রয়ে কত অসহায়, দীন অনাথ ও অনাথা প্রতিপালিত হচ্ছে। তা ছাড়া, অমরকে শুধু লেখাপড়াই শিখিয়েছেন; তা'কে সংসারে একটু থিতিয়ে গুছিয়ে দিয়ে যাবেন না?

সীতানাথ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তুমি মনে ক'র্‌ছ, শৈলেন! আমি ভীষ্মের মত ইচ্ছামৃত্যু বর পেয়েছি! মরণ কি কারু সময় অসময়, সুবিধে অসুবিধে দেখে, ইচ্ছে অনিচ্ছে বুঝে আসে? মনে কর যে, আমি আজই মর্‌ছি! তা হ'লেও ত আমি অমরকে ভাসিয়ে যাচ্ছি না, শৈলেন? আমি তা'কে তা'র বাপের কাছে রেখে যাচ্ছি। প্রভাই কি চিরদিনই এমনি অবোধ থাক্‌বে? তা ছাড়া, তোমার মত এমন অকৃত্রিম সুহৃদ্, তোমার বাপের মত এমন শুভানুধ্যায়ী অভিভাবক সংসারে ক'জন পায়? যা'র এতগুলি আছে, তা'র একটা বুড়ো দাদামশায় নাই রইল? মাতামহ পিতামহ কা'র ক'দিন থাকে? একটা দুঃখ এই যে, উপস্থিত আমি অমরকে সংসার-সুখে সুখী দেখে যেতে পার্‌ছি না। আমার সে চেষ্টা ভগবান্ ব্যর্থ ক'রে দিয়েছেন!" —বলিয়া তিনি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

অমর বিমর্ষভাবে অধোমুখে বসিয়া ছিল। সীতানাথের কথা শুনিয়া বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিল—"কেন, দাদামশায়? যা'তে যা'তে মানুষ সুখী হ'তে পারে, আপনি ত সে সমস্তই আমাকে দিয়েছেন? তবুও

যে আমি সুখী নই, সে ক্রটি ত আপনার নয়,—সে আমার অদৃষ্টের ফল। সুখ আমার অদৃষ্টে নেই। সুখের জন্যে আমি লালায়িতও নই। এই বয়েসে আমি জীবনের সব রকম সুখ, সকল প্রকার দুঃখ শোক ভোগ ক'রে নিয়েছি। আর কিছুর জন্যেই আমার বিশেষ একটা আকাঙ্ক্ষা নেই। এখন শুধু, ভগবান্ তাঁর অনুগত প্রিয়জনকে কাছে ডেকে নিয়ে যে বিশ্রাম দান করেন, সেইটুকুর জন্যেই হৃদয়ের একটা ব্যাকুলতা বুঝ্‌তে পারি—সেইটুকু পেলেই পরিতৃপ্ত হই।"

অমরের খেদোক্তি শুনিয়া, সীতানাথ হাসিয়া বলিলেন—"তোমার বন্ধুর কথা শুন্‌লে, শৈলেন?"—তাহার পরে স্নেহপূর্ণনেত্রে অমরের মুখপানে চাহিয়া একটু গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন—"অমর! তোমার বয়স্ এই সবে আটাশ বছর মাত্র!—এরই মধ্যে তুমি জীবনের ভারে এত শ্রান্ত হ'য়ে পড়্‌লে? স্বীকার করি, তুমি জীবনে দুই একটা শোক পেয়েছ—ছেলেবেলা একটু আধটু দুঃখও ভোগ ক'রেছ! তাই ব'লে এই বয়সেই জীবনটাকে এমন দুর্ভর মনে ক'র্‌তে পার না! মনে ক'রো না যে, সংসারে তুমিই একমাত্র অসুখী। তোমার চেয়ে অধিক দুঃখী সংসারে অনেক—অনেক আছে; দুঃখের ভারে ক্লিষ্ট হ'য়েও ত তা'রা তোমার মত এমন অল্প বয়সেই সংসার ছেড়ে পালাবার ইচ্ছে করে না? আমার জীবনের কথাও ত তুমি সব শুনেছ—সবই জান; বল দেখি, তোমার ও আমার মধ্যে কে বেশী দুঃখী—তুমি না আমি? তোমাকে স্নেহ-মমতা ক'র্‌বার জন্যে অন্ততঃ একজনও ছিল—এখনও আছে; আমার কে ছিল—কে আছে, ভাই? তুমি জীবনের এক প্রান্তে, আর আমি অন্য প্রান্তে। তুমি সবেমাত্র এই জীবন আরম্ভ কর্‌ছ, সংসারে এখনও প্রবেশ করনি—তা'র দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ মাত্র! আর আমি জীবনের কাজ একরকম শেষ ক'রে এনেছি, জীবনের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছি—বৈতরণীর কূলে

এসে খেয়াতরীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না ; কিন্তু আমি ত এখনও সংসার ছেড়ে পালাবার জন্যে তোমার মত এতটা অধীর হ'য়ে উঠিনি ? এখনও যদি কোন প্রসন্ন দেবতা এসে আমাকে বলেন— "তোমাকে যৌবনের শক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছি—তুমি আরও শতবর্ষ জীবিত থেকে কর্ম্ম কর !"—আমি তাঁ'র পায়ে ধ'রে আরও দু'শ বৎসর আয়ু ভিক্ষা ক'রে নিয়ে কাজ ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি। জীবনই দুর্ল্লভ, অমর ! মৃত্যু ত আছেই, চাও আর নাই চাও—আস্‌বেই ; তা'র জন্যে কারুকে মাথা কুড়্‌তে হয় না। জীবনই মানুষের দিন—মৃত্যুই রাত্রি। রাত্রিতে কোন কাজ করা যায় না। কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুতেই সুখ নেই। জীবনে যত দুঃখই থাক্, যত অভাবই থাক্, তবু তা'তে সুখ আছে। পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ, জলের মধুরশীতল স্বাদ, মৃদু সমীরণের সুখস্পর্শ, দীপ্ত রবি, ভাস্বর শশী, উজ্জ্বল নক্ষত্র-রাজি, উদার—উন্মুক্ত—সুনীল আকাশ, এ সকলে ত আর কেউ বঞ্চিত নয় ? জীবনের সঙ্গে এ সবই ছেড়ে যেতে হবে। মৃত্যু কোথায়—কোন্ অন্ধকার রাজ্যে নিয়ে যাবে, সে দেশে এ সকল আছে কি না, তা' কে জানে ? আনন্দসুখপূর্ণ এই সংসার, শোভা-সৌন্দর্য্যময়ী এই পৃথিবী ছেড়ে, সেই অজানা আঁধার দেশে যা'বার জন্যে, জীবনের প্রভাতেই বিশ্রাম-শয্যা রচনার সাধ কেন, ভাই ? দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়ে, কর্ম্মভূমি এই সংসারে এসে, কি কাজ ক'রেছ ? দু'পাঁচখানা বই প'ড়েছ মাত্র—না হয় একটু লেখাপড়াই শিখেছ ; কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যটা কি বুঝেছ, আমাকে বল দেখি ?"

অমর অধোমুখে স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া সীতানাথের কথা শুনিতেছিল। তাঁহার কথা শেষ হইলে, সে একবার ঘাড় তুলিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিল মাত্র—কোন উত্তর করিল না। শৈলেন তাঁহার প্রশ্নের

উত্তরে মৃদু হাসিয়া বলিল—"লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ করা—এই ত, না আর কিছু, দাদামশায় ?"

সীতা। তাই বটে; কিন্তু সেই যে জ্ঞান, সেটা কি রকমের? সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ বা অঙ্ক প্রভৃতি কোন বিশেষ শাস্ত্রের, না, যে জ্ঞানের প্রভাবে, শ্রৌত কর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী হইলেও শাক্যসিংহ ভগবানের অবতার, শঙ্কর—"শঙ্করঃ সাক্ষাৎ,"—সেই রকমের জ্ঞান?

শৈ। সে জ্ঞান কি শিক্ষায় লাভ কর্‌বার মত বলেন?

সীতা। নয় কেন? - সবই ত প্রযত্নলভ্য, শৈলেন! দৈব, প্রকৃতি-লব্ধ বা অদৃষ্টাগত ব'লে যা মনে হয়, তা'র জন্যেও মানুষকে একদিন চেষ্টা করতে হ'য়েছে। অদৃষ্ট কি?—অতীত জন্মের অপ্রত্যক্ষ পুরুষ-কার বা অদেখা চেষ্টা! যে চেষ্টা দেখা যায়নি—এইখানে, এই জীবনে করা হয় নি, তা'র ফলে আমরা যা কিছু পাই, তা'কেই অদৃষ্টলব্ধ বলি। মানুষ নিজেই নিজের অদৃষ্টের সৃষ্টি করে।

শৈ। জ্ঞানলাভের চেষ্টা ত সকলেই করে; কিন্তু বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য ক'টা জ'ন্মেছে, দাদামশায়?

সীতা। তা'র মানে হয়ত, জন্মান্তরে তাঁ'রা সে-জন্মে যে রকম চেষ্টা ক'রেছিলেন, সে রকম আর কেউ পারেনি। সে কথা এখন থাক্, যে কথা হচ্ছিল তাই বলি; শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ করাই বটে; কিন্তু সেটা কোন বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান নয়। যে জ্ঞান মানুষকে মানুষ নামের উপযুক্ত করে, যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে তা'র শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে, যে জ্ঞানের দর্পে মানুষ—"ধূলার উপর দাঁড়িয়ে সূর্য্যের পানে চেয়ে বল্‌তে পারে, 'তুমি সূর্য্য বটে, কিন্তু মানুষ নও!"—সেই রকমের জ্ঞান! দৈহিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ বৃত্তিগুলির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তিসাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য; অথবা অল্প কথায় শিক্ষার উদ্দেশ্য, কর্ম্মকুশলতা। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য

কাজ, আর শিক্ষার উদ্দেশ্য সেই কাজগুলিকে যথারীতি সম্পন্ন করতে পারা। সংসারের নিতান্ত প্রয়োজনীয়, জীবনের অবশ্যকর্ত্তব্য কাজগুলিকে যে সুসম্পন্ন কর্‌তে না পার্‌লে, সে দশটা পাশ কর্‌লেও—সতেরটা ভাষায় পণ্ডিত হ'লেও আমি তা'কে শিক্ষিত বলি না। জীবনটাকে যেভাবে পাওয়া গেছে, তা'র চেয়ে উন্নত ক'রে তোলা,—পৃথিবীর যে দেশে জন্ম হ'য়েছে, জ'ন্মে সে স্থানটাকে যা দেখা গেছে, তা'র চেয়ে একটু ভাল দেখে যা'বার চেষ্টা করা,—যে সময়ে সংসারে আসা গেছে,সেই সময়ের উপযোগী হওয়া,—সংসারের অনন্ত অভাব ও দুঃখের কণামাত্রও কমিয়ে যাবার চেষ্টা করা, এইগুলিকেই আমি মোটামুটি জীবনের, সুতরাং শিক্ষারও উদ্দেশ্য ব'লে মনে করি। আমাকে বল দেখি, অমর! এইগুলির মধ্যে কোন্‌টার কতটুকু কি ক'রেছ? কিছু না ক'রেই বিশ্রামের কথা বল্‌তে পার না! এই বিশ্বের যিনি অধ্যক্ষ ও নিয়ন্তা, যিনি তোমাকে এই কর্ম্মক্ষেত্রে ডেকে এনে, এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে তুলে দিয়েছেন, তিনি তোমাকে দৃশ্যপটমাত্র ক'রে সৃষ্টি করেননি,—জড় পদার্থের মত শুধু জন্ম,স্থিতি,বৃদ্ধি,বিপরিণামাদিই তোমার নিয়তি নয়—তৃণপুষ্পাদির মত জ'ন্মে, শিশির আর সূর্য্যকিরণ মেখে দু'দিন বাতাসে হেলে দুলে শুকিয়ে যাওয়া বা ঝ'রে পড়াই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়! বিধাতা তোমাকে অভিনেতা ক'রে—একটা কিছুর অভিনয় কর্‌বার জন্যেই এই রঙ্গালয়ে এনেছেন, সে অভিনয় হাসিই হ'ক বা কান্নাই হ'ক, নাচগানই হ'ক আর যুদ্ধই হ'ক, তা না ক'রেই তুমি পালাতে পার না। পালাতে চেষ্টা কর,ত সাজা পাবে—পালিয়ে যাও, ত ধ'রে এনে আবার তুলে দেবেন! কাজ শেষ না হ'লে ছুটি নেই, অমর! প্রতিকূল অদৃষ্ট, এবং সংসারের বিবিধ অনিবার্য্য ও অপ্রতিবিধেয় দুঃখ, রোগ, শোক প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আহত বা শ্রান্ত হ'য়ে প'ড়েছি ব'লে—কাঁদ্‌লেও ছাড়ান পাবে না। ক্ষতস্থান চেপে ধ'রে, দুঃখ, বেদনা,

শ্রান্তি ও অবসাদ ঠেলে ফেলে, এক হাতে চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তেও আর এক হাতে কাজ কর্‌তে হবে।

অমর একবার মাথা তুলিয়া, বিষণ্ণভাবে একটু হাসিয়া বলিল,—"ক'র্‌তেই যদি হয়, ত এ-যাত্রা আর কিছু নয়, দাদামশায়! এবার বড় কুদিনে —কুক্ষণে যাত্রা ক'রে এসেছি, যাত্রাটা বদ্‌লে ফিরে এসে তখন দেখা যাবে; এবারে সব তোলা রইল"—বলিয়া, অমর একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবার নীরব হইল।

অমরের নির্ব্বেদ-বাক্যে সীতানাথ যেন কিছু দুঃখিত হইলেন; তাঁহার প্রশান্ত মুখে আভ্যন্তরীণ বিষাদের একটা ম্লান ছায়া প্রতিভাত হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি দুঃখিতচিত্তে বলিলেন—"সংসার কারু পক্ষেই শুধু সুখের হয় না, অমর! জীবনে সম্পূর্ণ সুখী কে? যা'রা সমৃদ্ধিতে জ'ন্মেছে—সম্পদের কোলে সুখে লালিত হ'য়েছে, অদৃষ্ট যা'দের অনুকূল—কোন রকমের কোন অভাব বা দুঃখ যা'দিগে কখন বুঝ্‌তে হয় না, রোগ বা শোক ভোগ ক'র্‌তে হয় না, অভাবখিন্ন—অন্নক্লিষ্ট আত্মীয়স্বজনের ম্লান ও বিশীর্ণ মুখ দেখ্‌তে হয় না, প্রিয়জনের বিরহ-বেদনা অনুভব কর্‌তে হয় না,—তা'রাও কি সংসারে সুখী মনে কর? তা'রা যদি চক্ষুষ্মাণ হ'য়েও অন্ধ আর শ্রবণ-শক্তি সত্ত্বেও বধির না সেজে থাকে—পরের দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন হ'তে না পারে, তবে তা'রাও বল্‌তে পারে না—সংসার সুখের। যে সংসারের চারিদিকেই নিরন্তর ক্ষুধিতের চীৎকার, শোকার্ত্তের কাতর ক্রন্দন পীড়িতের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, সংসার ও সমাজের বিবিধ অত্যাচারে প্রপীড়িত দুর্ব্বলের হাহাকার রব, সে সংসারে মানুষ এমন কে আছে—কে থাকৃতে পারে, যে নিশ্চিন্তমনে নিজের সুখটুকু ভোগ ক'র্‌তে পারে? তাদেরও সুখের সে মৃদু গান সংসারের অশ্রান্ত, উচ্চ ও গভীর হা-হা-ধ্বনিতে

মগ্ন হ'য়ে যায়। নিতান্ত স্বার্থপর, অজ্ঞান, অশিক্ষিত—বর্ব্বর ব্যতীত আর কে সংসারের অশেষবিধ দুঃখে উদাসীন থাকতে পারে? যা'রা শূন্যচিত্ত, তা'রাই শুধু সংসারে সুখী, তা'রাই কেবল মনের আনন্দে হেসে খেলে আমোদ আহ্লাদ ক'রে বেড়ায়; অজ্ঞানতাই তা'দের সুখ। যা'রা জ্ঞানী, যা'রা চিন্তাশীল—তা'রাই দুঃখী—তা'রাই কাঁদে; শুধু আপনার দুঃখে নয়, পরের দুঃখেও না কেঁদে থাকতে পারে না। "রোদন করাই সংসারের নিয়ম,হাস্য তাহার ব্যভিচারমাত্র"—একথা শোকসন্তপ্তের প্রলাপবাক্য নয়, নির্ব্বিন্নহৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস নয়—অতি সত্য কথা। কান্নাই সংসারের নিয়ম। সকলকেই কাঁদতে হয়। ভূমিষ্ঠ হ'লেই কান্নার আরম্ভ; মৃত্যুর দিনে—জীবনের সঙ্গে তা'র অবসান। তবে, শুধু আনন্দসুখপূর্ণ না হ'লেও সংসারটা যে কেবলই বেদনা আর দুঃখে ভরা, নীরস মরুভূমি, তা'ও নয়। সংসারে দুঃখ আছে সুখও আছে, বিবাদ আছে আনন্দও আছে, বেদনা আছে আরামও আছে, কান্না আছে হাসিও আছে, রোগ আছে আরোগ্যও আছে, আতপ আছে ছায়াও আছে, অন্ধকার আছে আলোও আছে। কিন্তু সবই মেশামিশি—সবই পরস্পরের সঙ্গে অপরিহার্য্যরূপে সংশ্লিষ্ট; ভালটিকে চাইলেই মন্দটিকেও নিতে হবে। সংসারে কান্নাছাড়া হাসি দেখতে পাবে না, অ-দুঃখ-সম্ভিন্ন সুখ সংসারে নেই। মন্দগুলিকে বাদ দিয়ে, যা'রা শুধু ভালগুলিকে চায়, তা'রা নিতান্ত নির্ব্বোধ। ফোটা গোলাপটি কখন একবারে আকাশ থেকে নেবে আসতে পারে না—পাতা ও কাঁটা-ঝোপের মাঝ থেকেই গোলাপটি ফুটে ওঠে। সংসারে যা'রা সুখের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, তা'রা সুখ ত খুঁজে পায়ই না, অধিকন্তু নিজের কাজ হারায়। নির্ব্বোধ তা'রা, বোঝে না যে,কাজের মধ্যেই সুখের বসতি—কাজের ভিতর দিয়েই শান্তির পথ প্রবাহিত। জীবনের প্রারম্ভেই তুমি যদি এত শ্রান্ত হ'য়ে প'ড়ে থাক;ত

কাজ ক'র্‌বে কি ক'রে, অমর? কাজের জন্যই জীবন। কাজ ক'র্‌তেই সংসারে আসা। কর্ম্মের ডোরই সকলকে সংসারে বেঁধে রেখেছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত ক'রে, কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন ক'র্‌তে হবে। কাজ থাক্‌তে ছুটি নেই, বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, মুক্তি নেই। দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ কর! বিষাদ, দৈন্য, আলস্য, অবসাদ ঠেলে রেখে, নিজের কাজ খুঁজে নিয়ে তাইতে প্রবৃত্ত হও! জীবনের দিন প্রতিপলে—প্রতিনিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুরিয়ে যাচ্ছে! মৃত্যুর তামসী রাত্রি প্রগাঢ় অন্ধকার নিয়ে এগিয়ে আস্‌ছে! জীবনের বেলা কতটুকু? রোগ, নিদ্রা প্রভৃতি তা'রও অর্দ্ধেক আগুলে রেখেছে; বাকীটুকুও আর আলস্যে নষ্ট ক'রো না!"

শৈ। আপনি কি কাজ কর্‌বার কথা বল্‌ছেন, দাদামশায়? আমাদের ত মনে হয়, পয়সা উপার্জ্জন করাই পুরুষের প্রধান কাজ। সে কাজ ত সকলেই কর্‌ছে—সকলেই নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত—সকাল থেকে অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত বিব্রত। কেউ চাকরি, কেউ ব্যবসায়, কেউ মুটেগিরি বা মজুরি, কেউ জমীদারী বা মহাজনী—যা'র যে কাজ। কাজকর্ম্ম যা'র নেই, সেও কাজের উমেদারীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে! নিষ্কর্ম্মা কে?

সীতানাথ একটু হাসিয়া বলিলেন—"উপার্জ্জিত অর্থ যদি দেশের বা দশের কাজে খরচ হয়, ত উপার্জ্জনের চেষ্টা একটা কাজ বটে; তা না হ'লে শুধু জীবিত থাক্‌বার জন্য বা পুত্রকন্যাপরিবার প্রতিপালন কর্‌বার জন্য দিনরাত ছুটোছুটি ক'রে বেড়ান কাজের মধ্যেই নয়। সে কাজ ত পশুপক্ষীতেও ক'রে থাকে। ইতর জীবে আর মানুষে কোন পার্থক্য নেই? খাওয়া, পরা আর পরিবারবর্গ ভরণ-পোষণ করা ছাড়া মানুষের আরও অনেক কাজ আছে। কাজ কর্‌বার শক্তি ও যোগ্যতা সবার সমান নয়। কাজও সবার এক রকমের নয়। সংসার ও সমাজের অবস্থা এবং

স্থানীয় প্রয়োজন হিসাবে মানুষের কাজ রকমওয়ারি। কোন্‌টা কা'কে ক'র্‌তে হ'বে, সেটা দেশ, কাল, পাত্র অথবা প্রয়োজন ও যোগ্যতা হিসাব ক'রে বুঝে নিতে হয়। যে কাজটা হাতের কাছে, সেটাকেই আগে করা দরকার। ধর্ম্ম, সমাজ ও দেশ রক্ষার জন্মে, এবং অত্যাচার-প্রপীড়িত দুর্ব্বলের পরিত্রাণ, বিপন্নের বিপৎপ্রতীকার, অবলার সতীত্ব ও মর্য্যাদা-রক্ষার জন্মে কখন কখন প্রাণপাত করাও মানুষের কর্ত্তব্য হ'য়ে পড়ে। ধর্ম্ম, দেশ ও সমাজের শত্রুর বিরুদ্ধে কাহাকেও অস্ত্র, কাহাকেও বা লেখনী ধারণ কর্‌তে হয়। দেশের শত্রু অনেক। জল ও স্থল-দস্যু, পার্ব্বত্য বা বন্য তস্করাদিই কেবল দেশের শত্রু নয়; দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, সংক্রামক ব্যাধি প্রভৃতিও দেশের শত্রু। ধর্ম্ম ও সমাজের শত্রুও অনেক। তা'র মধ্যে কতকগুলি বাহ্য, আর কতকগুলি আভ্যন্তরিক। বাহিরের অপেক্ষা ভিতরের শত্রুই অধিক অনিষ্ট-কারী। কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতাই ধর্ম্মের ও সমাজের প্রধান শত্রু। তবে এই সকল বিবিধ শত্রুর বিরুদ্ধে সকলকেই সর্ব্বদা সশস্ত্র থাক্‌তে হয় না—এগুলি সব দেশে সকল সময়েই বিদ্যমানও থাকে না—সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। আবশ্যক হ'লেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে হয়। কিন্তু অজ্ঞানতা, রোগ, অভাব ও দরিদ্রতা প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্মের, দেশের ও মনুষ্য-সমাজের চিরশত্রু; এ সকল সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বভৌমিক—সব দেশে, সকল সময়েই বর্ত্তমান আছে। এগুলির বিরুদ্ধে সকলেরই সর্ব্বদা যুদ্ধ করা আবশ্যক। এতে বিশেষ একটা শক্তি, যোগ্যতা অথবা অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার হয় না; অল্পবিস্তর সকলেই পারে, সাধ্যানুসারে সকলেরই করা উচিত। আমার মনে হয়, ইহাই মনুষ্য-জীবনের প্রধান কাজ।"

এই সময়ে মাধাই আসিয়া আহার করিতে যাইবার জন্য অমর ও

শৈলেন্‌কে ডাকিয়া গেল। সীতানাথ বহুক্ষণ কথা কহিয়া শ্রান্ত হইয়াছিলেন; তাহারা চলিয়া গেলেই তিনি নিদ্রিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কর্ম্মের পথ।

পরদিন সীতানাথের জ্বরের বিরাম হইয়াছিল। অপরাহ্নে তিনি একটু সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। অমর ও শৈলেন তাঁহার নিকটে বসিয়া পাঁচ রকমের কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। শৈলেন পূর্ব্বদিনের কথার প্রসঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, দাদামশায়! কাল রাত্রে আপনি মানুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যা যা বল্‌লেন, তা'র মধ্যে ত আমাদের শাস্ত্রোক্ত যাগ-যজ্ঞের কথা কিছু বল্‌লেন না! সে সকলের অনুষ্ঠান কি মানুষের কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য নয়?"

সীতা। শাস্ত্রের কথা ত কিছু হয়নি, শৈলেন! মনুষ্যসাধারণের কর্ত্তব্য ব'লে যেগুলি আমার মনে হয়, সেইগুলির কথাই ব'লেছি। যাগ-যজ্ঞের কথা যদি তুল্‌লে ত বলি, সে-সকল শুধু ক্লেশনিষ্পাদ্য নয়—সকাম; তা'র ফলে স্বর্গলাভ হ'তে পারে, কিন্তু তা'তে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না।

শৈ। কেন; মীমাংসা-শাস্ত্রের মতে ত বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারাই স্বর্গলাভ হয়, দাদামশায়! অ-দুঃখসম্ভিন্ন, অভিলাষোপনীত, নিরবচ্ছিন্ন সুখের নামই ত স্বর্গ?

সীতা। মহর্ষি কপিলের তা অভিপ্রায় নয়। তাঁর মতে, সকাম-কর্ম্মসাধ্য স্বর্গসুখও ঐহিক সুখের মত দুঃখমিশ্রিত আর নশ্বর। দুঃখের মূল-কারণ নষ্ট না হ'লেই দুঃখের পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে। এ কথাটা

বেশ মনে লাগে। আমার বিবেচনায়, কর্ত্তব্য মনে ক'রে যদি মানুষ নিষ্কাম পরহিতব্রত পালন করতে পারে, ত তা'র ফলেই স্বর্গলাভ হয়। সেই স্বর্গই মানুষের সুখতৃষ্ণার চিরবিশ্রামভূমি, তা'রই নাম অমৃত বা মোক্ষ।

শৈ। জ্ঞান, ভক্তি, উপাসনা, এ সকলের দ্বারাও ত মোক্ষলাভ হয়!

সীতা। জ্ঞান, ভক্তি আর কর্ম্ম, এই তিনই মোক্ষলাভের পথ; উপাসনাটা সর্ব্বসাধারণী—তিন পথেই আছে। কিন্তু, এই তিন পথের মধ্যে কোন্ পথটা সহজ? চিনিতেই যদি রোগ আরাম হয়, ত তেতো খা'বার দরকার কি, শৈলেন? মুক্তির জন্য যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, সে জ্ঞান লাভ করা কি সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ—মনে কর? ষোড়শ পদার্থের জ্ঞানই বল, আর পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানই বল; প্রকৃতিপুরুষ-বিবেকেই বল, আর ব্রহ্মজ্ঞান-সমাধিই বল—এ সবই বড় কঠিন, ভাই! আমার ত মনে হয়, তত্ত্বজ্ঞানের পথটা তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের মত দুরারোহ! ভক্তির পথটা অপেক্ষাকৃত সরল বা সুগম ব'লে বোধ হয় বটে; কিন্তু ভাল ক'রে বুঝে দেখ্‌লে আর তা মনে হয় না। ভক্তিও জ্ঞানসাপেক্ষ। ভগবান্ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ভিন্ন তাঁ'র প্রতি বিশিষ্ট ভক্তির উদয় হওয়া সম্ভব নয়। স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, সেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য ও সখ্যভাব এবং আত্ম-নিবেদন, ভক্তির এই লক্ষণগুলিকেই সাধারণ লোকে ভক্তি মনে করে; কিন্তু এইগুলিই ভক্তি নয়। ভক্তিটা অন্তরের জিনিষ; অন্তরে ভক্তি জন্মিলেই বাহিরে এই লক্ষণগুলি আপনা হ'তেই প্রকাশ পায়। অন্তরে ভক্তি না থাক্‌লে শুধু লোক-দেখান ফোঁটা কেটে, মালা প'রে আর সঙ্কীর্ত্তনের দলে মিশে চীৎকার ক'রেই ভক্ত হওয়া যায় না। ব্রহ্মজ্ঞানে যেমন উপাস্য আর উপাসকের পার্থক্য থাকে না, ভক্তি বিষয়েও তেমনি ভগবানে আর ভক্তে কোন প্রভেদ থাকে না। ভক্তি ভালবাসারই রূপান্তর বা নামান্তর।

পূজ্যের প্রতি যে অনুরাগ, তা'রই নাম ভক্তি। ঈশ্বরে এই যে প্রেম বা পরমানুরক্তি—এই যে—"আমি যেন তুমি হরি, তুমি যেন আমি"-ভাব, এ কি সহজ সাধনা মনে কর? এ ভক্তি ক'জনের হয়? চৈতন্যদেবের হ'য়েছিল। প্রহ্লাদের হ'য়েছিল। ব্রজগোপীদের হ'য়েছিল। ভগবান্‌কে ভালবেসে, তাঁ'র প্রেমে বিভোর হ'য়ে, তাঁ'র সঙ্গে আপনাদের একাত্মতা হৃদয়ঙ্গম ক'রে, তাঁ'রা সর্ব্বত্যাগী হ'য়েছিলেন; তাঁ'র চরণে আপনাকে ও আপনার বল্‌তে তাঁদের যা কিছু ছিল, সবই দান ক'রেছিলেন। আমাদের সে সাধনা কোথায়? আমরা ভগবান্‌কে প্রাণ খুলে ভালবাস্‌তে পারি কই? তাঁ'কে প্রাণ, মন, হৃদয়, সব অর্পণ ক'রে, ব'ল্‌তে পারি কই,—শ্রেয় হে! প্রেয় হে! তুমিই আমার জীবনসর্ব্বস্ব—তুমিই আমার—"ধন জন মন, জীবন যৌবন, তুমি সে গলার হার"; তুমি ছাড়া এ জগতে আমার আর কেউ নেই—কিছুই নেই। তুমিই আমার সব, আমার—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ"? মুখে হয়ত দশবার—শতবার—সহস্রবার ব'লে থাকি; কিন্তু কাজে কর্ত্তব্যে সে মহদ্ভাব মনে রাখ্‌তে পারি কই? সর্ব্বস্ব অর্পণ কর্‌ব মনে ক'রে, দেবার বেলা সাত পাঁচ ভাবি। সব দিতে পারি না; একটু আপনার জন্যে লুকিয়ে রাখি। সব দিয়েছি মনে ক'রেও দেখ্‌তে পাই, তখনও মনের কোণে একটু মমতা লেগে র'য়েছে। আপনাকে দিতে পারি,ত আপনার প্রিয়বস্তুটিকে দিতে মন সরে না। ভাল ফলটি দিতে পারি; কিন্তু দিয়ে যদি প্রসাদ পা'বার প্রত্যাশা না থাকে, বা জন্মের মত সেটিকে ত্যাগ ক'র্‌তে হয়, তবে উৎকৃষ্ট ফলটি দিতে মন উঠে না—নোড়্‌টি কামরাঙ্গাটি দিয়েই সারি! এ রকম আধ-ভালবাসা, অসম্পূর্ণ—সুবিধামত আত্মত্যাগ, আর লোক-দেখান, মৌখিক ভক্তি নিয়ে কি মুক্তির আশা করা যায়? যা'দের জ্ঞান আছে, যথার্থ ভক্তি জ'ন্মেছে, তা'রা সেই সেই পথে গিয়ে মুক্তির সন্ধান করুক্! আমি ত

তাই কর্ম্মের পথটাই অপেক্ষাকৃত একটু সহজ মনে করি।' যে পথেই যাও, উপাসনার দরকার আছেই! জ্ঞান আর ভক্তিমার্গের উপাসনাবিধিও যেন আমার কঠিন মনে হয়। চিত্তবিক্ষেপ তা'র প্রধান অন্তরায়। বিক্ষেপধর্ম্মশীল মন নিয়ে ভগবানের ধ্যান কর্‌তে ব'সে দেখেছি, চঞ্চল মনকে কিছুতেই ধ্যেয় বস্তুতে সংলগ্ন রাখ্‌তে পারি না। অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে যদি কোন রকমে একবার তাঁর কাছে নিয়ে গেছি, ত অমনি বাসনাময় মন তা'র ভিক্ষার ঝুলি খুলে ব'সেছে—"ভগবান্! এটি দাও আর ওটি দাও! এটি কর আর সেটি কর!" শুধু 'দেহি' আর 'দেহি'—"রূপং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি দিশো। জহি"!—রূপ দাও! ধন দাও! যশ দাও! শত্রুজয় ক'রে দাও!—বিজয়, আয়ু, আরোগ্য, পুত্র প্রভৃতি "সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে"! তবে তাও বলি, এটা বিচিত্রও নয়। উপাসনায় এক দিকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের প্রদাতা, সকল-ঈপ্সিত-প্রদানে সমর্থ, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী এক মহাপুরুষ; আর এক দিকে দীন, অভাবময় মানুষের ক্ষুদ্র মানবত্ব! এক দিকে যাবতীয় কাম্য বস্তুর অক্ষয় অনন্তভাণ্ডার, আর একদিকে অনন্ত-বাসনাপূর্ণ মানবের অপূরণীয় ভোগ-তৃষ্ণা! একজনের সবই আছে—সবই দিতে সমর্থ ও প্রস্তুত, আর একজনের দিবার কিছুই নেই—সবই চাহিবার! এ অবস্থায় মানুষ না চেয়ে থাক্‌তে পারে না। কিন্তু চাইলেই ঠক্‌তে হয়; অমৃত ব'লে যা চেয়ে নেওয়া যায়, পেয়ে দেখা যায়, সেটা অমৃত নয়—বিষ! কর্ম্মের পথেও উপাসনা আছে; তবে তা'তে ভাব্‌বার বেশী কিছু নেই। জন মজুর গৃহস্থের বাড়ীতে খাট্‌তে এসে, কাজে লাগ্‌বার আগে কর্ত্তাকে প্রণাম ক'রে জেনে নেয়, কি কাজ ক'র্‌তে হবে; ছুটির বেলাও—কি কাজ কতখানি হ'ল—ব'লে গড় ক'রে চ'লে যায়। এতেও সেই রকম, প্রভাতে উঠে তাঁর কার্য্যে প্রবৃত্ত হবার পূর্ব্বে একবার তাঁকে বন্দনা

ক'রে জানান—"বিশ্বপতি! তোমার সংসারে কাজ ক'র্‌তে এসেছি, কি কাজ ক'র্‌তে হবে—ব'লে দাও!" আর দিবসের কার্য্যশেষে সন্ধ্যাসময়েও একবার সেই রকম, তাঁকে নমস্কার ক'রে জানান—"জগদীশ! আজ তোমার কাজ আমার দ্বারা এই পর্য্যন্ত হ'য়েছে!" এ ছাড়া আর বেশী কিছু নয়। কর্ম্মই কর্ম্ম-পথের উপাসনা।

শৈ। উপাসনার ত বাঁধা পথ রয়েছে, দাদামশায়! পূজা, হোম, জপ, এ সকলে চিত্তবিক্ষেপ হবার ত কথা নয়! ধ্যান বা স্তোত্র সবই গড়া; আলস্য ত্যাগ ক'রে সেইগুলি শুধু আওড়ান মাত্র; তা'তে আর বাধা-বিঘ্নের কি আছে? খোসামোদ করলে অতি নিষ্ঠুর, দুষ্ট মানুষও তুষ্ট হয়, আর দয়াময় তিনি, স্তব কর্‌লে তিনি তুষ্ট হন্ না? তিনি তুষ্ট হ'লেই ত সব হ'তে পারে, আর কিছুর দরকার কি?

সীতা। তিনি তুষ্ট হ'লে সবই হ'তে পারে তা ঠিকই। তবে কথা হচ্ছে এই যে, তিনি কথায় বেশী তুষ্ট হন, কি কাজে বেশী তুষ্ট হন? আমার ত বোধ হয়, শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না, ভাই! মনে কর, তোমার দু'টি চাকরের একটি খুব বিনয়ী, তোমাকে দেখ্‌তে পেলেই ভূমিষ্ঠ হ'য়ে গড় করে, আর পাড়ায় পাড়ায় ব'লে বেড়ায়—"আমার মনিব শিবতুল্য," তোমাকেও বলে—"বাবু! আপনার মত মানুষ দেখ্‌তে পাই না—আপনার রূপ গুণ বিদ্যে বুদ্ধির তুলনা হয় না!" কিন্তু কাজকর্ম্ম সে তোমার কিছুই করে না। আর যে একটি চাকর আছে, সে কথা টথা বেশী কিছু কয় না, কারু কাছে তোমার সুখ্যাতিও করে না বা নিন্দাও করে না; কিন্তু তোমার কাজগুলি সে সব বেশ গুছিয়ে করে, তোমাকে কোন অসুবিধা বুঝ্‌তে দেয় না—হাতে হাতে জলটুকু, পাণটি, গামছাখানি এগিয়ে দেয়, কাপড়খানি কুঁচিয়ে রাখে। তুমি কোন্ চাকরটিকে বেশী ভালবাস্‌বে ভাই? মনে কর, এক গৃহস্থের ছোট

বড় অনেকগুলি ছেলে মেয়ে। বড় ছেলেটি পণ্ডিত; কিন্তু সংসারের কোন খোঁজ খবরই রাখে না—কিছুতেই নেই। মেজ ছেলেটি বড় পিতৃ-ভক্ত; প্রত্যহ বাপের পাদোদক পান করে, নমস্কার করে, পায়ের ধূলো নেয়, আর 'বাবা' 'বাবা' ক'রে সদা সর্ব্বদাই কাছে কাছে ঘোরে। কিন্তু তার পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টা নেই—কাজ কর্ম্ম কিছুই করে না। তৃতীয় ছেলেটি পণ্ডিতও নয়, আর পিতৃভক্তি দেখাবার জন্যেও তা'র বিশেষ একটা আগ্রহও নেই; চাক্‌রি বাক্‌রি ক'রে যা উপার্জ্জন করে, সবই সংসারে খরচ করে। গৃহস্থালী কাজে তা'র আলস্য নেই—ছোট ছোট ভাই-বোনগুলিকে যত্ন করা, তাদের জামা, কাপড়, খাবার প্রভৃতি কিনে দেওয়া, অসুখ হ'লে ডাক্তার দেখান, ওষুধ এনে খাওয়ান, মোট কথা—বাপকে সে কোন ঝঞ্ঝাট ভোগ কর্‌তে দেয় না। বল দেখি, কোন্ ছেলেটিকে বাপের বেশী স্নেহ করা সম্ভব? মনে কর, এই সংসারটা মস্ত একটা পরিবার। সকলেই এক পিতার সন্তান, মানুষ সব ভাই ভাই বা ভাই বোন। ভাইদের মধ্যে ছোট বড় আছে। যা'রা জ্ঞানী ও ধনী, তা'রাই বড়; যা'রা মূর্খ, গরিব, অসহায় ও নিরুপায়, তা'রাই ছোট। ভগবান্ সকলের পিতা। সবার সব ভাবনাই তাঁকে একা ভাব্‌তে হয়, সবারই অন্নবস্ত্র, ওষুধ ও পথ্য প্রভৃতি যোগাতে হয়। বড় ভাই যা'রা, তা'রা যদি গরিব, দুঃখী, অসহায়, পীড়িত, অন্ধ, খঞ্জ, ও বিকলাঙ্গ ভাই-বোন-গুলিকে দেখে, সাধ্যানুসারে তাদের দুঃখ ও অভাব দূর কর্‌তে যত্ন করে, তা হ'লে কি বাপের কিছু সাহায্য হয় না? এই বিরাট বিশ্বব্যাপারের ছোট বড় নানা কাজে তিনি সর্ব্বদাই বিব্রত। ছোট ছোট তুচ্ছ কাজগুলো দেখ্‌তে না হ'লে তিনি বড় বড় কাজে আরও বেশী মন দিতে পারেন না? যা'রা তাঁর কার্য্যে সহকারিতা কর্‌তে চায়—তাঁর কাজগুলি ক'রে দেবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করে, তাদের প্রতি কি তিনি অধিক তুষ্ট হন্ না?

শৈ। তিনি যদি মানুষ হ'তেন, ত তাই বটে ; তা ত আর ন'ন্। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, একা হ'লেও তিনি অনন্ত। তাঁর শক্তি, জ্ঞান, করুণা, সবই অসীম। কেউ তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় নেই—তাঁর কাছে সবাই সমান। সৃষ্টিব্যাপারের পরিচালনায় তিনি কি মানুষের সাহায্য প্রত্যাশা করেন ? তা ছাড়া, অনাথ, ভিক্ষুক, কাণা, খোঁড়া ও কুষ্ঠের সাহায্য করা উচিত কি অনুচিত—সে সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায় ; কেউ কেউ বলেন, আন্ধ্য,কৌষ্ঠ্য ও দারিদ্র্য প্রভৃতি মানুষের দুষ্কার্য্যের বা পাপের দণ্ড। দণ্ডিতকে সাহায্য করায় দণ্ডবিধাতার প্রতিকূলতাচরণ বা বিধি-বিধানের উপরে হস্তক্ষেপ করা হয়। সুতরাং তা'তে প্রসন্ন হওয়া দূরে থাক্, বিধাতার—যদি তাঁর প্রসন্নতা বা অপ্রসন্নতা সম্ভবই হয়, ত অপ্রসন্ন হবারই কথা !—নয় কি ?

সীতানাথ মৃদুমধুর হাস্য করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ঈশ্বর মানুষের মত রাগদ্বেষাদির বশীভূত ন'ন্—তা সত্য। তিনি ক্লেশ, জন্ম, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের অপরাভূত—চৈতন্যস্বরূপ। তিনি নিত্য ও নিরতিশয় বা অনাদি ও অনন্ত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, দেশকালের অপরিচ্ছিন্ন ; সুতরাং সদা সর্ব্বত্র বিরাজমান। কিন্তু এই অনন্তপ্রকৃতি, অ-মনঃপ্রাণসত্ব—শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত পরমেশ্বর আমাদের মত নিম্নাধিকারী বা নিম্নশ্রেণীর উপাসকগণের উপাস্য বা আদর্শ হ'তে পারেন না। শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ বৃত্তি যাতে সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছে, সেই সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত, ঐশ্বর্য্য গুণসম্পন্ন, ঈশ্বর সদৃশ মনুষ্য, বা আদর্শ-মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ পরমেশ্বরই আমাদের উপাসনীয় ও আদর্শ হ'য়ে থাকেন—যেমন শ্রীকৃষ্ণ। জন্ম-মৃত্যুর অধীন হ'লেও "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। তিনি মানুষের আকারে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হ'য়ে, আপনার বিভূতি প্রচ্ছন্ন রেখে, আপনাকে

একজন সাধারণ মানুষ ব'লে জানিয়ে, মানুষেরই মত সব কাজ ক'রে গেছেন! তাই আমরা ঈশ্বরকেও মানুষের মত অনুভূতিসম্পন্ন ভেবে নিয়ে, আত্মতৃপ্তির পথানুসরণে পুষ্প, চন্দন, ভক্ষ্য, পেয় ও পরিধেয় প্রভৃতি উপহার দিয়ে তাঁ'র পূজা ক'রে তৃপ্তি বোধ করি। তিনি যে রাগদ্বেষাদির বহির্ভূত, তা মনে করি না; তাঁ'র প্রসন্নতালাভেরই চেষ্টা করি, যা'তে তিনি অপ্রসন্ন হ'তে পারেন ব'লে মনে হয়, এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকি। ফল কথা, তাঁ'কে আমরা আমাদেরই মত—কেবল আমাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বগুণ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, মানুষ ভেবে নিয়ে থাকি। একাই তিনি বিশ্বের কার্য্য-ভার বহন করতে পারেন; তা'তে তাঁ'র ক্লেশ নাই। কিন্তু তাঁ'র কষ্ট বা শ্রান্তিবোধ হচ্ছে ভেবে নিয়ে যদি আমরা সে ভার যথাসাধ্য একটু লঘু করতে চেষ্টাই পাই, তা'তে কি তিনি অসন্তুষ্ট হন—মনে কর? মনে কর, তুমি একটা মস্ত 'ব্যাগ' হাতে ক'রে চ'লেছ! সেটা তোমার ভারি বোধ হচ্ছে না। তবু যদি কেউ বলে—"আপনি একলা বইছেন কেন, শৈলেন বাবু? দিন্‌না —আমিও খানিক পথ ব'য়ে দি!"—তা'র উপরে কি তুমি চ'টে যাবে? তা ছাড়া, বিশ্ব-ব্যাপারে মানুষের করণীয় কিছু নেই,এ কথা বল্‌তে পার না! এই বিরাট্ বিশ্বের বিবিধ কার্য্যনির্ব্বাহের জন্যই তিনি এই অনন্তকোটী জীব—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এবং গ্রহ, নক্ষত্র, শৈল, নদী, তরু, লতা,গুল্ম, তৃণটি পর্য্যন্ত সৃষ্টি ক'রে, প্রত্যেকের উপরে এক একটা কাজের ভার দিয়ে রেখেছেন। কাণাখোঁড়াকে একটা আধ্‌লা দিলে ভগবান্ রাগ করেন, এ কথা তোমাকে কে ব'লেছে, শৈলেন? কূট তর্কের কথা ছেড়ে দিয়ে, সরল বুদ্ধিতে বিচার ক'রে দেখ! মনে কর, বাপ একটি ছেলেকে দোষের জন্য তাড়না ক'রেছেন। ছেলেটি বেদনায় আকুল হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে কাঁদ্‌ছে। তা'র বড় ভাই দেখ্‌তে পেয়ে, ছুটে এসে তা'কে কোলে

তুলে নিয়ে, যদি তা'র চোখের জল মুছিয়ে দেয় ; তা হ'লে কি, তুমি বল্‌তে চাও যে, বাপ সেই বড় ছেলের মুখ দেখেন না ? আমি ত ভাই তা মনে করি না। আদর্শ পুরুষ ও ঈশ্বর জ্ঞান ক'রে আমি যাঁ'র উপাসনা করি, তিনি মানুষকে কর্ম্মের পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন ; অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু না থাক্‌লেও—কর্ম্ম কর্‌বার কোন প্রয়োজন না থাক্‌লেও, তিনি কর্ম্ম ক'রে লোককে কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনিই ব'লেছেন—অন্য কোন প্রয়োজন না থাক্‌লেও কেবল লোক-হিতের জন্যও সকলের কর্ম্ম করা দরকার। আরও ব'লেছেন—"মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পণ কর, দেহান্তে আমাতেই বিলীন হবে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ক'রেও যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখ্‌তে না পার, তবে আমার প্রীতির জন্য কর্ম্ম কর, কর্ম্মদ্বারাও সিদ্ধিলাভ ক'র্‌তে পার্‌বে।" যে কার্য্যে তাঁ'র প্রীতি জন্মান সম্ভব মনে করি, যথাসাধ্য তা'রই অনুষ্ঠান ক'রে থাকি।"

শৈ। তিনি ত কেবল যজ্ঞার্থেই কর্ম্ম কর্‌বার কথা ব'লেছেন, দাদামশায় ! যজ্ঞোদ্দিষ্ট ভিন্ন অন্য সমস্ত কাজকেই ত তিনি বন্ধনের হেতু ব'লে গেছেন !

সীতা। যজ্ঞ এক রকমের নয়, শৈলেন ! ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মানবযজ্ঞ প্রভৃতি ভেদে যজ্ঞ অনেক রকমের। যা'র যা'তে অধিকার, তা'ই তা'র যজ্ঞ। অতিথি-সেবার নামই মানবযজ্ঞ। শুধু অভ্যাগতের পূজা নয়,—দীন, অসহায়, অনাথ ও পীড়িতের সেবাও, আমার বোধ হয়, মানবযজ্ঞেরই প্রকার-ভেদ। কলিকালে যদি কোন যজ্ঞের প্রয়োজন থাকে, ত মানবযজ্ঞেরই আছে। শাস্ত্রে ত বলে, কলিতে যজ্ঞই নেই, অর্থাৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এ যুগের কর্ম্ম নয় ;—"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে।"—সত্যযুগে

তপস্যাই প্রধান কর্ম্ম ছিল, ত্রেতায় জ্ঞানই প্রধান,দ্বাপরে যজ্ঞ,আর কলিতে শুধু দানই প্রধান কর্ম্ম। দানের সার্থকতা কিসে—কিরূপ দানে? স্বর্গ, মহৈশ্বর্য্য বা ক্রতুশতফলাদি প্রাপ্তিকামনায়—“যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়” যে দান, তা'কে আমি দান মনে করি না। অকৃতোপকার দরিদ্র ব্যক্তিকে—সে ব্রাহ্মণই হ'ক আর শূদ্রই হ'ক—ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হ'য়ে শুধু বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় যে দান, তাই প্রকৃত দান। “দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়!”—ইত্যাদি বাক্য ঈশ্বরের অনুশাসন ব'লেই আমি মনে করি।

শৈ। আপনি দেখ্‌ছি, অনাথ ও দরিদ্র-সেবারই পক্ষপাতী; কিন্তু এই যে সেবা-ধর্ম্ম, এ কি আপনি হিন্দুধর্ম্মের অনুমত বলেন?

সীতা। নয় কেন?

শৈ। কি ক'রে? এতে যে অনেক সময়ে জাত-বিচার চলে না; ব্রাহ্মণকে হয়ত নীচ জাতীয়ের পরিচর্য্যাদিও ক'র্‌তে হয়—হিন্দুকে মুসলমানের মড়া বইতে হয়। হিন্দুধর্ম্মে তা চলে কি?

“এই জন্যে?—তা সে রকমই যদি কিছু ঘটে, ত একদিন মাথা মুড়িয়ে উপোষ ক'রে থেকে, কাহনকতক কড়ি বা তন্মূল্য টাকা উৎসর্গ ক'রে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দিলেই মিটে যেতে পারে না?”—বলিয়া সীতানাথ একটু হাসিলেন; তৎপরে একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন—“সেবা-ধর্ম্ম হিন্দু-ধর্ম্মের অনুমত কি না, তা ঠিক ব'লে উঠ্‌তে পারলাম না, শৈলেন! তবে সেটা যে মানুষের ধর্ম্ম, তা'তে আমার একটুও সংশয় নেই। বৈষ্ণবকে কি তুমি অহিন্দু ব'ল্‌তে চাও? তাঁরা কি জাতিবিচার ক'রে থাকেন? আর অহিংসা, অক্রোধ, অস্তেয়, সত্য, দয়া প্রভৃতি যা পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেরই অনুমত, তা কি হিন্দুধর্ম্মের অনুমত নয়? হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডি নির্দ্দেশ করা একটু কঠিন। এ ধর্ম্মটা এত বড়—এত উচ্চ যে, তা'র সমস্তটা

কেউ: দেখ্‌তে পায় নি—কাণার হাতী দেখার মত একদেশমাত্র দেখেই বাকীটাও সেই মতই হবে,এইরূপ অনুমান ক'রে নিয়েছে। জাতিবিচারের কথা যা বল্‌ছ, সমাজের গণ্ডির মধ্যে থাক্‌তে হ'লেই সেটা মেনে চল্‌তে হবে। নদী যতক্ষণ সাগরে গিয়ে না পড়্‌ছে, ততক্ষণ তা'র নাম আছে, কূল আছে, সীমা-নির্দ্দেশ আছে; মহাসাগরে গিয়ে মিশ্‌লে আর সে সকল থাকে না! তখন নদী আর সমুদ্র এক—অবিভাজ্য জলরাশি! ব্রাহ্মণ-শূদ্র ও হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য সমাজের গণ্ডির মধ্যে। মনুষ্যমাত্রকে একটা মহাজাতির অন্তর্ভূক্ত মনে কর—আর সে পার্থক্য দেখ্‌তে পাবে না! জগতে যত কিছু পৃথগ্‌ভাব দেখ্‌তে পাও, সে সমস্তই মোহ বা অজ্ঞানোপহত চৈতন্য থেকে উদ্‌ভূত হ'য়েছে। মূলে সবই এক। মোহটা কেটে গেলে আর কোন রকমের ভিন্নভাব—জাতিগত পার্থক্য বা বস্তুগত বৈষম্য কিছুই দেখ্‌তে পাবে না; তখন দেখ্‌বে, সমস্তই এক—অদ্বিতীয়, নিত্য চৈতন্যের অনন্ত সমুদ্র—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। সেবাধর্ম্ম সমাজের অনুমত ধর্ম্ম না হ'তে পারে; কিন্তু এ ধর্ম্মও—"বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ"—এবং আমারও—"হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ"—সুতরাং আমি এটাকে ধর্ম্ম ব'লেই মেনে নিয়েছি। আমার মনে হয়, এই যে অনাথ-দীন-দরিদ্রের সেবা, এটা শুধু পরহিত-ব্রত নয়—এতে ভগবানের পূজাও করা হয়।"

শৈ। কাঙ্গাল গরিব খাইয়ে—ভগবানের পূজো হয়!—সে কি রকম, দাদামশায়?

সীতা। আমরা একটা জড়পিণ্ডে চিন্ময় পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান কল্পনা ক'রে নিয়ে, তা'র সম্মুখে ভক্ষ্য,পেয় ও পরিধেয় প্রভৃতি উপহার দিয়ে মনে করি—ভগবান্‌কে দান কর্‌লাম, তাঁর পূজা কর্‌লাম। আর এই প্রাণময়, দরিদ্ররূপী বিগ্রহের অভ্যন্তরে ভগবানের অধিষ্ঠান জেনে,

তাঁ'র উদ্দেশে তাঁকে সেই সকল উপহার দিয়ে তৃপ্ত করলে তাঁ'র পূজা করা হয় না? মাটির পুতুলের সম্মুখে যেগুলি ধ'রে দেওয়া গেল, সেগুলি ভগবান্ গ্রহণ কর্‌বেন কি না, তা ঠিক্ বোঝা গেল না; কিন্তু এই দরিদ্র-নারায়ণ তোমার চোখের সাম্‌নে ব'সে তখনই সেগুলি ভোজন বা পরিধান কর্‌লেন। এ বেশ নয়? মানুষের অন্তরে যে নারায়ণ অধিষ্ঠান কর্‌ছেন, তা'তে সংশয় কর্‌বার কিছু আছে কি? মানব-দেহই শ্রেষ্ঠ দেবালয়। মানুষের এই পাঞ্চভৌতিক দেহায়তনের মধ্যেই সেই সনাতন পরমপুরুষ আত্মা স্বরূপে বিরাজমান! "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি"—এই মহাবাক্যের পরম তথ্য সাত সমুদ্র তের নদীর পারে ম্লেচ্ছ দেশেও উপলব্ধ হ'য়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যেও কোন কোন মনস্বী মানুষকে "Visible Manifestation and Impersonation of the Divinity"—দেবতার সাকার অভিব্যক্তি বা অবতার ব'লে বুঝেছেন। তাঁ'দের বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধাদিতেও আমরা দেখ্‌তে পাই—"There is but one Temple in the world, and that Temple is the Body of Man. Nothing is holier than this high Form. Bending before men is a reverence done to this Revelation in the Flesh. We touch heaven when we lay our hands on a human Body."—পৃথিবীতে একটিমাত্র দেব-মন্দির আছে; মানব-দেহই সেই মন্দির। এই শ্রেষ্ঠ দেবায়তন অপেক্ষা পবিত্রতর আর কিছুই নেই। মানুষের সম্মুখে প্রণত হওয়া—মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা! মানুষকে স্পর্শ কর্‌লে দেবতা-স্পর্শের পুণ্য হয়।

অমর এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই—নীরবে বসিয়া সীতানাথ ও শৈলেনের কথোপকথন শুনিতেছিল; সীতানাথের শেষকথাগুলি

শুনিয়া বলিল—"মানুষের অন্তরে দেবতা আছেন, আবার সয়তান্ও ত থাকে, দাদামশায়! মানুষের মধ্যে সকলেই ত আর বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, বশিষ্ট, ব্যাস, জনক, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির মত পুণ্যাত্মা বা ধর্ম্মাত্মা নয়?—হরে, শ্যামা, রামা ইত্যাদি যত চোর, নেশাখোর, বদমাশ লোক, তা'দের অন্তরেও কি দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা ক'রে নিয়ে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখা'তে হবে—তা'দের পূজো করতে হবে?"

সীতা। মানুষের অন্তরে দেবতা আর সয়তান দু'ই আছে, তা ঠিকই, অমর! সুমতিই দেবতা, আর কুমতিই সয়তান। সয়তানের পূজা করবে কেন? সয়তান শুধু সুখের সহচর। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যাদির অন্ধকারই তা'র নিরাপদ আশ্রয়। দেবতা সুখ ও দুঃখ, জ্ঞান ও অজ্ঞান সব অবস্থাতেই মানুষের অন্তরে বিরাজ করেন। মানুষ যখন সুখী, সুস্থ, স্বচ্ছন্দ, যৌবনমদমত্ত, ধনগর্ব্বিত আর বলদৃপ্ত, তখনই তা'র অন্তর সয়তানের বিলাস-মন্দির—তা'র স্বচ্ছন্দবিহারের যোগ্য ভূমি। দুঃস্থ, বিপন্ন, পীড়িত বা অন্নক্লিষ্ট মানুষের বিষাদ, দুশ্চিন্তা, বেদনা ও দৈন্যপূর্ণ হৃদয়কে সয়তান তা'র সুখের আবাস ব'লে মনে করে না। মানুষে যদি দেবতার পূজা করতে চাও, ত দেখ, কে দীন, কে দুঃস্থ, কে বিপন্ন, কে পীড়িত! দেখ, কা'র অন্ন নেই, আশ্রয় নেই; কে রোগে ওষুধ পায় না, কা'র শুশ্রূষা করবার কেউ নেই! দেখ, কোথায় অনাথ শিশু, অনাথা রমণী, অন্ধ বা বৃদ্ধ আতুর! শান্ত হৃদয়ে অপ্রমত্তচিত্তে নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য মনে ক'রে তা'দের সাহায্য কর—সেবা কর! দেবতার পূজায় যে পুণ্য হয় —যে স্বর্গলাভ হয়, এতেও সেই পুণ্য, সেই স্বর্গলাভ হওয়াই সম্ভব। এ কাজের অপেক্ষা অধিক পুণ্যপ্রদ আর কোন মহাযজ্ঞ আছে ব'লে আমার মনে হয় না। মানুষের কর্ত্তব্যপ্রসঙ্গে যা ব'লেছি, তা' যদি মন দিয়ে

শুনে থাক, তবে নিশ্চয়ই বুঝে থাকবে যে, এই সেবা-ব্রতই সকলের একমাত্র কর্ত্তব্য নয়। জীবনের আরও অনেক গুরুতর কর্ত্তব্য আছে—অনেক উচ্চ ও মহৎ উদ্দেশ্য আছে; সে-সকলের অনুষ্ঠানও সময়ে সময়ে মানুষের ধর্ম্ম হ'য়ে পড়ে। দেশ, কাল আর পাত্র অনুসারে বুঝে নিতে হয়, কোনটি কোন্ সময়ে কা'র করা দরকার। দেশ যখন শান্তিপূর্ণ ও সুভিক্ষ, উপায়াক্ষম অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, শিশু বা রুগ্ন ব্যতীত আর কা'রও কোন অভাব নেই; রাজা পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালনে তৎপর, রাজপুরুষেরা প্রকৃতিপুঞ্জের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণে সচেষ্ট,তখন ক্ষুদ্র হ'লেও এই সেবা-ব্রতই সকলের অনুষ্ঠেয়। কিন্তু দেশ যখন অরাজক, দস্যু-তস্করাদি-উপদ্রুত, ভিক্ষার অন্নও যখন কেউ নির্ব্বিঘ্নে উদরসাৎ করতে পায় না, নিজের বাড়ীতে নির্ভয়ে বাস করতে পারে না, যার বল আছে সে দুর্ব্বলের কষ্টার্জ্জিত ক্ষুদ্র সঞ্চয় অপহরণ ক'রে নিয়ে যায়,—মুখের গ্রাস কেড়ে খায়, যখন সিন্দুকে টাকা রেখে লোকের সোয়াস্তি নেই, বাড়ীতে স্ত্রী-কন্যাকে রেখে দূরে যেতে সাহস হয় না, তখন আর এই ক্ষুদ্র সেবা-ব্রত নিয়ে থাকা পুরুষের ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য হ'তে পারে না। তখন এ সেবা-ব্রতের ভার স্ত্রীলোকের উপরে ন্যস্ত থাকলেই ভাল হয়। জন্মের মত কর্ত্তব্যও কেউ বেছে নিতে পারে না; স্থানের ও সময়ের প্রয়োজন অনুসারেই স্থানীয় লোকের কর্ত্তব্য নিয়মিত হয়। তবে যা'রা শুধু নিজের সুখ বা হিতের কামনায় যাগযজ্ঞ বা পূজা-হোম-জপ নিয়েই দিনরাত বিব্রত থাকে, দেশ উৎসন্ন হ'ক্, সমাজ অধঃপাতে যা'ক্, দেশের লোক না খেয়ে মরুক্—একটু ওষুধের অভাবে রোগে ভুগে ভুগে ম'রে, ঘরে প'ড়ে থাক্,—তাদের দিকে ফিরে চাওয়ার আবশ্যকতা আছে মনে করে না,আমি তা'দের সে ধর্ম্মানুষ্ঠানকে—তা' যদি বাজপেয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞও হয়, ত বলি—শুধু স্বার্থ-যজ্ঞ; সে যাজ্ঞিকেরা

মহর্ষি হ'লেও আমি বলি—তাঁ'রা স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণচেতা—তাঁ'দের জ্ঞান, ধ্যান, যজ্ঞ, হোম, জপ, পূজা, আরাধনা সবই শুধু আত্মপূজা বা স্বার্থ-সেবারই নামান্তর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মের কল।

শৈলেন চলিয়া গিয়াছে। অমর সংসারের কাজে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছে। সংসার কিন্তু আর পূর্ব্বের সে-ভাবে চলিতেছে না। সকলেই প্রত্যহ প্রত্যেক কার্য্যে মায়াবতীর অভাবটা বেশ বুঝিতে পারে এবং তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। রাধারাণীর গৃহিণীপনায় কেহই সন্তুষ্ট বা সুখী নহে। দেবতার ভোগ এখন আর একদিনও যথাকালে হয় না। সীতানাথ সময়ে সময়ে রাগ করিয়া বলিয়া থাকেন—"মায়াই না হয় চ'লে গেছে, তোমরা ত সবাই র'য়েছ; একদিনও সময়ে বিগ্রহের ভোগ হয় না কেন? অনাহূত লোকজন প্রসাদ পা'বার আশায় এসে, ব'সে ব'সে ফিরে যায় কেন? সংসারের একটা গোছ দাঁড়া নেই; হোটেলেও কাজের একটা গোছ থাকে!" গৌরী-ঠাকুরাণী আর চোখে ভাল দেখিতে পান না। সংসারের বিশৃঙ্খলতায় মায়ার কথা মনে করিয়া তিনি মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করেন। মঙ্গলা বলে —"সেই চাল সেই ডাল, গিন্নী-বিনে—সেই যে কি বলে তাই! হায় রে দিদিমণি! দাঁত থাকৃতে কেউ দাঁতের মরম বুঝ্তে পারে না!" তারাচাঁদ সংসারের কিছুতেই থাকেন না; তিনিও সংসারের অব্যবস্থা দেখিয়া মাঝে মাঝে বলিয়া থাকেন—"মায়াবতীর সঙ্গেই সংসারের লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে!"

একদিন মধ্যাহ্নকালে জনৈক অতিথি আসিয়া, আটচালার এক ধারে পাতা পাতিয়া প্রসাদ ভোজন করিতে বসিয়াছে। তাহার বয়স অল্প, পরিধেয় মলিন ও জীর্ণ, শ্মশ্রু-কেশাদিতে বহুদিন নাপিতের হাত পড়ে নাই। গোবর্দ্ধন পরিবেশন করিতে করিতে ঘন ঘন তাহার পানে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। ভোজন-শেষে অন্যান্য সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে, গোবর্দ্ধন সেই অদ্ভুত অভ্যাগতকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কোথায় যাবেন?" আগন্তুক তাহার মুখপানে চাহিয়া, একটু হাসিয়া বলিল—"তাই ভাব্‌ছি।" কণ্ঠস্বর শুনিয়াই গোবর্দ্ধন তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"কে রে! মাণিক?—"

আগন্তুক আর কোন কথা কহিল না। সত্যই সে অবরোধমুক্ত মাণিক। গোবর্দ্ধন তাহার আগমনের কথা সকলকে বলিলে, বাড়ীতে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তারাচাঁদ আসিয়াই মাণিকের পিঠে ঘাকতক লাঠি বসাইয়া দিয়া বলিলেন—"তবে রে ছুঁচো! মুখে কালি ঝুলি মেখে রাতে ডাকাতি ক'রে পালিয়েছিলি ব'লে আবার চুল দাড়ী প'রে দিনে ডাকাতি কর্‌তে এসেছিস্?"—বলিয়া বেশ জোরে জোরে আরও দুই চারি ঘা বসাইতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধন তাহাতে বাধা প্রদান করিল না; তাহার ইচ্ছাটা, বোধ হয়, ভাল করিয়া আরও ঘাকতক হয়, ত হইয়া যাউক। অমর ছুটিয়া আসিয়া, তারাচাঁদের পায়ে ধরিয়া বলিল—"আর কিছু বল্‌বেন না, বাবা! ছেলেমানুষ, বুঝ্‌তে না পেরে যা ক'রেছে, তা'র জন্যে আর মার্‌বেন না—অনেক শাস্তি পেয়েছে!" মাধাই হাসিয়া বলিল—"এখন আর মাথায় বাঁশ মার্‌লেও কিছু হবে না, চাটুজ্যেমশায়! তখন যদি দু' চার ঘা ছড়ি মার্‌তেন, ত কিছু কাজ হ'ত!" রাধারাণী সংবাদ পাইয়া, ছুটিয়া আসিলেন; এবং প্রহার করার জন্য তারাচাঁদকে কড়া কড়া দশ কথা

শুনাইয়া দিয়া, তাঁহার হারামাণিককে টানিয়া লইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই মাণিক 'ঘরের ছেলে' হইয়া গেল। তারাচাঁদ, গোবৰ্দ্ধন ও মাধাই ব্যতীত আর সকলেই তাহাকে ভালবাসিল। সীতানাথ তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অমর মাণিককে বড় ভালবাসে। তাহাদের দুইজনের এক-সঙ্গে স্নান-ভোজন, বসা-দাঁড়ান, কথাবার্ত্তা, বেড়াইতে যাওয়া প্রভৃতি ঘনিষ্ঠতার লক্ষণ দেখিয়া মাধাই ও গোবৰ্দ্ধন মুখ চাহাচাহি করে, এবং পরস্পরে কি বলাবলিও করিয়া থাকে। মাধাই একদিন অমরকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল—"দাদাবাবু! ছোটদা'-বাবুকে একেবারে অতটা বিশ্বাস কর্‌বেন না—একলা তাঁর সঙ্গে বেশী দূরে কোথাও বেড়া'তে টেড়া'তে যাবেন না!" স্নেহময় বৃদ্ধভৃত্যের অনাবশ্যক অতি-সতর্কতায় অমর হাস্য করিল মাত্র—মাণিককে অবিশ্বাস করিবার বা তাহার নিকটে সাবধান থাকিবার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করিল না।

মাণিক সন্তরণপটু; স্নানের সময়ে সে সাঁতার দিয়া দীঘির পারাপার হইয়া থাকে। অমর সাঁতার জানে না। মাণিক তাহাকে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া সাঁতার শিখায়। একদিন সেই অছিলায় অমরকে গভীর জলে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়া, মাণিক কূলে ফিরিয়া আসিল। অমর তখনও ভাল সাঁতার শিখে নাই। আর দুই এক মিনিট পরেই তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইত। কিন্তু দৈবানুগ্রহে গোবৰ্দ্ধনের ঠিক সেই সময়ে কোন কারণে বিশ্রাম-কুটিরে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে—তাহা দূর হইতে দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল, এবং ছুটিয়া আসিয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া বহুকষ্টে অমরের উদ্ধার সাধন

করিল। সেই দিন হইতে অমর মাণিককে একটু ভয় করিতে শিখিল। এই ব্যাপার হইতে মাধাই ও গোবর্দ্ধনের অন্তরে একটা ঘোর আশঙ্কার উদয় হইল। স্পষ্ট কিছু বলিতে না পারিলেও, ঠারেঠোরে তাহারা সীতানাথকে তাহাদের আশঙ্কার কথা জানাইল। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"অমরকে তোমরা একটু বেশী ভালবাস, তাই এই রকমটা আশঙ্কা কর্‌ছ; রাধারাণীর সে রকম অভিপ্রায় থাক্‌লে, অনেক দিন পূর্ব্বেই সে তা' সিদ্ধ কর্‌তে পার্‌ত। অমর যখন অসহায় শিশুমাত্র—তা'র জীবন যখন রাধার মুঠার ভিতরে, তখন যিনি তা'কে রক্ষা ক'রে এসেছেন, এখনও তিনিই রক্ষা কর্‌বেন। আমাদের সাবধান হবার বিশেষ কোন আবশ্যকতা আছে ব'লে মনে হয় না।"

কোন উৎসব উপলক্ষে একদিন বিগ্রহের ভোগের কিছু বাহুল্য হইল। অপরাহ্ণ বেলায় ভোজন গুরুতর হওয়ায় অমর রাত্রিতে কিছু আহার করিবে না বলিয়া বেড়াইতে গিয়াছিল। শয়ন-কক্ষে তাহার জন্য শুধু একটু দুধ রাখিয়া, অন্যান্য সকলে আহারাদি শেষ করিয়াছিল। মাণিক অমরের কক্ষে বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিল; শেষে শয়ন করিতে যাইবার সময়ে বলিল,—"দাদা! তোমার দুধ চাপা আছে—খেও!" অমর একটা উদ্গার তুলিয়া বলিল—"না, আমি আর দুধও খাব না; তুই খাস্ যদি, ত খেয়ে যা!" আহারে মাণিকের অরুচি নাই, সে দুধটুকু পান করিয়া শয়ন করিতে গেল।

অর্দ্ধরাত্রে রাধারাণী আসিয়া, অমরকে জাগাইয়া সকাতরে বলিলেন—"ও অমর! শিগ্‌গির একবার আয়, বাবা!—মাণিক কেমন কর্‌ছে—দেখ্ এসে!"

অমর আসিয়া মাণিকের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া সশঙ্কভাবে বলিল—

"কি সর্ব্বনাশ! এখনই একটু জল গরম ক'রে আন! আমি যাই, যন্ত্রপাতি-গুলো নিয়ে আসি; মাণিক, বোধ হচ্ছে, বিষ খেয়েছে!"

অমর দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া গোবর্দ্ধন প্রভৃতিকে জাগাইয়া তুলিল; এবং নিজেই ডাক্তারখানায় ছুটিল। এদিকে রাধারাণী শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া, পুরবাসিনীগণকে জাগাইয়া তুলিলেন।

অমর তাহার সহকারী ডাক্তারকেও সঙ্গে লইয়া আসিল। দুইজনে মিলিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিল, মাণিক চিকিৎসার অতীত পথে গিয়া পড়িয়াছে—বিষ তাহার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া, নিজ বিনাশক শক্তির প্রভাবে জীবনী-শক্তির বিশ্লেষ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অমর তখন মাণিকের জীবনরক্ষার প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া অশ্রুগদগদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"এ সর্ব্বনাশ কেন কর্‌লি, মাণিক!—বিষ খেলি কি দুঃখে ভাই?"

অমরের কাতরতা দেখিয়া উপস্থিত সকলেরই নেত্রে অশ্রু বিগলিত হইল। মাণিকের তখন আর অধিক কথা কহিবার শক্তি ছিল না; সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিল—"তুমি সাবধান—দাদা!—তোমার জন্যে মা—যে কল পেতেছিল—তা'তে আমি—তোমার সেই—দু—ধে—বি—ষ—"। ইহার পরেও মাণিক যে দুইচারিটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা কহিল, অন্য কেহ সে অসম্বদ্ধ কথার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও, ভিতরের কথা যাহারা জানিত, তাহারা বুঝিল যে, সাঁতার শিখানর ছলে অমরকে ডুবাইয়া মারিবার জন্য মাণিকের সেই চেষ্টাও রাধারাণী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। অমর ব্যতীত আর কেহই সীতানাথের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিল না। তাহাতেই, বোধ হয়, অমরের মৃত্যুটা ইদানীং রাধারাণীর বড়ই স্পৃহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রভাতে অমর ও গোবর্দ্ধন প্রভৃতি মাণিকের মৃতদেহ বহিয়া শ্মশানে

চলিয়া গেলে, মাধাই ও মঙ্গলা সীতানাথের বিশ্রাম-কুটিরে উপস্থিত হইল ; এবং মাণিক মৃত্যুকালে যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছে,সেই সকল কথা তাঁহাকে বলিয়া, রাধারাণীকে গৃহ হইতে সরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ আরম্ভ করিল। "আচ্ছা, সে যা করতে হয়, তা করা যাবে তখন ; তোরা নিজের নিজের কাজ-কর্ম্ম দেখ্‌গে যা !"—বলিয়া, তিনি তাহাদিগকেই সরাইয়া দিলেন। অপরাহ্নে গোবর্দ্ধন আসিয়া পুনর্ব্বার সেই কথার উত্থাপন করিলে,সীতানাথ একটু অপ্রসন্ন হইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন– "তোমরা, দেখ্‌তে পাই, খোদার উপরেও খোদগারি করতে চাও ! তিনি যা'কে রাখ্‌বেন, তা'কে মারে কে ? তিনি যা'কে মারবেন ঠিক ক'রেছেন, লোহার কৌটায় পূরে রাখ্‌লেও কি তা'র নিস্তার আছে ? মাণিকের মৃত্যু দেখেও কি তোমাদের জ্ঞান হয় না ?" গোবর্দ্ধন অপ্রতিভ হইয়া নতমুখে নীরবে অবস্থান করিল। সীতানাথ গম্ভীরভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—"রাধাকে আমি খুঁজে এনে নিজের বাড়ীতে রেখেছি ; প্রাণ থাকতে আমি তা'কে কোথাও চ'লে যেতে বল্‌তে পার্‌ব না। যা'র অদৃষ্টে যা' আছে হবে।—"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।"

গোবর্দ্ধন লজ্জিত হইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, সীতানাথ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"দুঃখিত হ'য়ো না, গোবর্দ্ধন ! বুঝে দেখ— তোমরা যা বল্‌ছ, সেটা কি পারা যায় ? আর বাস্তবিকই সেটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যকও নয় কি ? রাধা এখন শোকাতুরা, প্রসঙ্গক্রমেও যেন তা'র কাছে এ সম্বন্ধে কোন কথা কেউ না কয় ! আমার উঠে যাবার সামর্থ্য নেই ; তুমি সকলকে আমার নাম ক'রে এই কথা ব'লে দাও গে ! তুমি রাধার নিকট-আত্মীয়, তোমাকে আর ব'লে দেব কি— তা'কে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কর গে !"

গোবর্দ্ধনের মুখে সীতানাথের নিদেশ-বাক্য শুনিয়া সকলেই সাবধান

হইয়া গেল; কেবল তারাচাঁদ তাহা মানিলেন না। রাধারাণী অমরকে মারিবার জন্য তাহার দুধে বিষ মিশাইয়া দিয়াছিলেন—এই কথা শুনিয়া, তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাধারাণী তাঁহার পূর্ব্বেই সে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মাণিকের মৃত্যুর পরে আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ছদ্ম-প্রকাশ।

মাণিক যে দুষ্ট বা দুর্ব্বিনীত ছিল, সে দোষ লালনের, কি তাহার স্বভাবের বা অদৃষ্টের, তাহা ঠিক বলা যায় না; তবে তাহার স্বল্প জীবনও যে সুখের হয় নাই, তাহা অসন্দিগ্ধরূপেই বলা যাইতে পারে। নিজ কর্ম্মদোষে দীর্ঘকাল কঠোর কারাবাসের বহুবিধ ক্লেশ ও দুঃখ ভোগ করিয়া আসিয়া, জননীর কুকর্ম্মদোষে বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া তাহার জীবন-শেষ হইয়াছে বলিয়া, তাহার জন্য সকলেই দুঃখিত। কিন্তু অনুতাপিনী রাধারাণী পুত্রশোকে উন্মাদিনী হইয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছেন অথবা কোথায় কি ভাবে উদ্দেশ্যহীন, আশাহীন, দুঃখময় জীবন বহন করিতেছেন, তাহা জানিতে না পারিলেও, সীতানাথ ও অমর ব্যতীত আর কেহই তাঁহার জন্য দুঃখিত নহে; বরং তাঁহার তিরোভাবে সকলেই আনন্দিত। পুরবাসিনীগণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন; তাঁহাদের বুকের উপর হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গিয়াছে। তারাচাঁদ নির্ব্বিকার—স্ত্রী-পুত্রের জন্য তাঁহাকে অণুমাত্রও দুঃখিত বা শোকার্ত্ত বলিয়া বোধ হয় না। অমরের জন্য একটু রাখিয়া বাকী সমস্ত মনটাকেই তিনি তাঁহার কারবারে ঢালিয়া দিয়াছেন। সীতানাথ সেই যে অসুস্থ হইয়া-

ছেন, তাহার পর আর সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই। শুধু স্বাস্থ্য নহে—মায়াবতীর চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই তাঁহার দেহ ও মন দুইই যেন একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সংসারের স্থায়িত্ববিষয়ে তিনি একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। রোগ-শয্যায় পড়িয়া সময়ে সময়ে তিনি আপনার মনে বলিয়া থাকেন—"যা ভেবেছিলাম তা' হ'ল না—ভগবানের সে ইচ্ছা নয়! আমার সঙ্গেই আমার সংসারের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী!" এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠে এবং এক একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস প্রবাহিত হয়।

মাণিকের মৃত্যুর কিছুদিন পরে একদিন মধ্যাহ্নে সীতানাথ পীড়িতাবস্থায় বিশ্রাম-কুটিরে শয়ান আছেন, এমন সময়ে তাঁহার নামে একখানা পত্র আসিল। শৈলেন লিখিয়াছে—"দাদামহাশয়!—অমরের বিষণ্নতা সম্বন্ধে আমরা যে সংশয় করিয়াছিলাম, তাহা যে অমূলক, চলিয়া আসিবার সময়ে সে কথা আপনাকে বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সে সম্বন্ধে আর একটা কথা তখন আপনাকে বলিয়া আসিতে পারি নাই—আপনার নিকটে গোপন রাখিতেই প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি যে, তাহা আর অপ্রকাশ রাখা উচিত হয় না। মায়াবতী বহুদিন আপনার বাড়ীতে ছিলেন; কিন্তু তিনি কখন অমরের সমক্ষে বাহির হইতেন না। বিশেষ প্রয়োজনে বাহির হইলেও তিনি কখন তাহার সম্মুখে অবগুণ্ঠন মোচন করিতেন না। অমর যখন পীড়িত—বিকারের ঘোরে যখন তাহার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল, সেই সময়ে এক দিন তিনি তাহার সমক্ষে অবগুণ্ঠিত থাকিবার চিরাচরিত সতর্কতা সম্বন্ধে একটু শৈথিল্য করিয়াছিলেন। সেই দিন অমর তাঁহাকে দেখিতে পায়; এবং মুখ-নেত্র-নাসিকাদির অবিকল সাদৃশ্য হেতু তাঁহাকে ছদ্মবেশিনী পদ্মাবতী বলিয়াই তাহার সংশয়

উপস্থিত হয়। বহুদিন পূর্ব্বে যাহার মৃত্যু অবধারিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে এই প্রকার সংশয় উপস্থিত হইবার হেতু কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া অমরের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে আমারও মনে হইয়াছিল যে, একবার সেই দেশে গিয়া পদ্মার অনুসন্ধান করা—তাহার মৃত্যুটা সত্য কি না, সে বিষয়ে একটা তদন্ত করার আবশ্যকতা আছে। অমরকে তখন এ কথা বলি নাই। মায়ার অকস্মাৎ চলিয়া যাওয়াতেই, নিজের সংশয়টা ভ্রান্ত, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। সে-দেশে গিয়া, বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া আমি জানিয়াছি, পদ্মা সে-সময়ে মরে নাই। অমর ও ভজহরি যখন সেখানে গিয়াছিল, তখন একটা সংক্রামক রোগ বা মহামারী সংলগ্ন কয়েকখানি গ্রামকে মনুষ্যশূন্য করিবার জন্য ভীষণভাবে দেখা দিয়াছিল। মরণের ভয়ে কেহ কাহারও বাড়ী যাইত না। প্রতিবাসী কেহ তাহার সংলগ্নগৃহবাসীরও সংবাদ রাখিত না। অমর ও ভজহরি যাঁহার মুখে পদ্মার মৃত্যুর কথা শুনিয়া আসিয়াছিল, তিনি অমরের শ্বশুরের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন—এ কথা সত্য। সর্ব্বদাই তিনি তাঁহাদের বাড়ীতে যাওয়া-আসাও করিতেন। পদ্মার মাতার মৃত্যু তিনি দেখিয়াছিলেন; পিতার মৃত্যুর কথাও শুনিয়াছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, অমর প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হইবার পূর্ব্বে তিনি আর কাহারও মুখে পদ্মার মৃত্যুর কথা শ্রবণ করেন নাই; তাহাদের মুখে, বাড়ীতে কেহ নাই—শুনিয়াই, বোধ হয়, পদ্মার মৃত্যুটা তিনি অনুমানে স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তিনিও জীবিত নাই—সেই রোগেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। পিতার মৃত্যুতে সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পদ্মা তাহার মাসীর বাড়ী পলাইয়াছিল। যে স্ত্রীলোক তাহাকে সঙ্গে করিয়া সেথা লইয়া গিয়াছিল, সেও বাঁচিয়া নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, একটা মাঠ ও একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম পার হইয়া সেই মাসীর বাড়ী যাইতে

হয়। সেখানে গিয়া দেখিলাম, সে বাড়ীখানিও একবারে মনুষ্যশূন্য হইয়া গিয়াছে। পদ্মা যে তাহার মাসীর বাড়ীতে গিয়া মরিয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন প্রমাণ পাই নাই। যদি বাঁচিয়াই থাকে, তাহা হইলেও যে সে এতদিন অন্য কোথাও গিয়া লুকাইয়া আছে, এমনটাও বোধ হয় না। সুতরাং অমরের সংশয়টাই সত্য বলিয়া আমারও বিবেচনা হয়। এখন মায়াবতীর সন্ধান করাই আবশ্যক হইয়াছে। সে ব্যতীত আর কেহই এ রহস্য বিদিত নহে। তাহার সন্ধানের যদি কোন উপায় বলিয়া দিতে পারেন, তবে আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। আপনার পত্রের অপেক্ষায় রহিলাম।— শৈলেন।"

পত্রখানা ফেলিয়া সীতানাথ শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন; এবং দুই হাতে দুই দিকের রগ চাপিয়া ধরিয়া, চোখ বুজিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার কুটিরের এক কোণে একটি লোহার সিন্দুক ছিল। বহুক্ষণ চিন্তার পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া তিনি সেই সিন্দুক খুলিলেন; এবং তাহার ভিতর হইতে পিতলের একটি ছোট বাক্স বাহির করিলেন। এই বাক্সটিই মায়াবতী তাঁহার নিকটে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছে। সে বলিত, ইহাতে তাহার গহনা আছে। কি গহনা আছে, সীতানাথ তাহা এক-দিনও দেখেন নাই। যাহা আছে মায়ারই আছে। আজ সেইটি তাঁহার খুলিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল। বাক্সের হাতলে একটি ছোট চাবিকাঠি বাঁধা ছিল। চাবি খুলিয়া, গহনাগুলি একে একে সব দেখিয়া, সেগুলি যেমন ছিল, ঠিক তেমনই করিয়া রাখিয়া দিয়া, তিনি আবার শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন.। একটু পরে মাধাই আসিলে, তাহার দ্বারা মঙ্গলাকে ডাকাইয়া তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন—"মঙ্গলা! যা জিজ্ঞাসা করি, শুধু তা'রই জবাব দে!—বাজে বকিস্‌নে! আমার শরীর বা মন কিছুই ভাল নয়।"

মঙ্গলা লাঠি ফেলিয়া, মেঝেতে পা ছড়াইয়া বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"বল্‌ছি, দাঁড়াও—আগে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি! বাবা! পাহাড়ে ওঠা নয় ত—যেন নারকেল গাছে ওঠা! নাও, কি বল্‌বে—বল! আমি অমন বাজে বকি না গো—সে তোমার মেধো; সেই ত ধান ভান্‌তে শিবের গীত এনে হাজির করে—আবার বলে কি না---"

সীতানাথ অধীরভাবে বলিলেন—"আচ্ছা সে কথা পরে শুন্‌ব; আগে আমি যা বলি শোন্‌—তুই মায়াকে, তা'র গা-মাথার কাপড় খোলা আছে—এমন অবস্থায়, কখন ভাল ক'রে দেখেছিস্‌?"

মঙ্গলা। বেশ! সে মেয়ে কখন নিজে চুল শুকোত নাকি? সপ্‌সপ্‌ কর্‌ছে ভিজে চুল জড়িয়ে রাখ্‌ত; এখানে আসা ইস্তক আমিই টেনে হিঁচড়ে বসিয়ে তা'র চুল শুকিয়ে দিয়েছি, খোঁপা বেঁধে দিয়েছি।—তা' যেমন জানি; এখনকার এই সব ঝাপ্‌টা-কাটা, কলি-কাটা, পাতা-কাটা, পাণ-খোঁপা, বেণে-খোঁপা, ফিরিঙ্গী-খোঁপা—কতই হয়েছে—শুন্‌তে পাই! মুখুজ্যেদের মেয়েরা—

সীতানাথ একটা ধমক দিয়া বলিলেন---"আ মোলো রে! আবার ঐসব বাজে কথা এনে ফেল্‌ছে! যা জিগেসা করেছি, তা'র জবাব দে না!"

মঙ্গলা একটু থতমত খাইয়া বলিল---"আগো তাই ত বল্‌ছিনু---তুমি যে মুখ থেকে কথা বা'র কর্‌তে দাও না—তা বল্‌ব কি!---দিদিমণিকে ভাল ক'রে দেখেছি কি না—জিগেসা করেছ ত? তাই ত বল্‌ছি---তা'কে আর দেখিনি? কতদিন গায়ের ময়লা তুলে দিয়েছি। তিনি ত আর এখনকার মেয়েদের মত দিনরাত গায়ে সাবান ঘ'স্‌ত না—গায়ে ভাল ক'রে কখন গামছাই দিতে দেখিনি—মুখটায় পা'টায় একটু তেল বুলিয়ে, টপ্‌—টপ্‌—টপ্‌ ক'রে তিনটে ডুব দিয়েই বস্‌—নাওয়া হ'য়ে গেল!"

সীতানাথ দেখিলেন, মঙ্গলাকে বকা বৃথা; যতটুকু বলিবার, না

বলিয়া সে ছাড়িবে না। অগত্যা তিনি আর ব্যস্ততা দেখাইলেন না। "মায়াবতীর গায়ে কোথাও কোন চিহ্ন বা দাগ নাই, শুধু একটা কাণের পিছনে কাল্ একখানা জড়ুল আছে"—এই কয়েকটি কথা মঙ্গলার মুখ দিয়া বাহির করাইতে প্রায় আধঘণ্টা সময় লাগিল। যাহা জানিবার তাহা জানিয়া লইয়াই, সীতানাথ মঙ্গলাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। মঙ্গলার ইচ্ছা ছিল—আরও কিছুক্ষণ বসিয়া দুই চারিটা কথা কহে; কিন্তু সীতানাথ বিরক্ত হইয়াছেন ভাবিয়া, সে আপনার মনে গজ্ গজ্ করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

পাঠকের, বোধ হয়, স্মরণ থাকিতে পারে, পদ্মার বিবাহের কথায়, তাহার শুভাশুভ লক্ষণ সম্বন্ধে সিতিকণ্ঠ এইরূপ জড়ুলের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ভাবিতে ভাবিতে সীতানাথের সেই কথা স্মরণ হওয়াতেই তিনি মঙ্গলাকে ডাকাইয়াছিলেন। মায়াবতীরও কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে ঠিক সেই প্রকার ঝড়ুল আছে। মঙ্গলা তাহা দেখিয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনি আরও একটা প্রমাণ পাইয়াছেন। যে গহনাগুলি তিনি পদ্মাকে দিয়াছিলেন, সেগুলিও সব মায়ার গহনার বাক্সে দেখিয়াছেন। অতএব পদ্মাবতীই যে মায়াবতী নামে আসিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে ছিল, তাহাতে আর তাঁহার কোন সংশয় রহিল না। এখন, কি উপায়ে মায়াবতীর সন্ধান হইতে পারে, তিনি কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু যে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহে, এতদিন নিকটে পাইয়াও যাহাকে ধরিতে পারেন নাই, তাহাকে অজ্ঞাত দূরদেশ হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করা যে নিতান্ত সহজ নহে, তাহা ভাবিয়া তিনি বিষণ্ণ হইলেন।

অমর আসিয়া দেখিল, সীতানাথ চক্ষু মুদিয়া শয্যার একপ্রান্তে উত্তানভাবে শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহাকে নিদ্রিত বলিয়া তাহার বোধ হইল না। তাহার উপস্থিতি জানিতে পারিয়াও তিনি অন্য দিনের

মত তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন না। কোন কারণে তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতার বিপর্যায় ঘটিয়াছে বুঝিয়া, অমর ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে ডাকিল—"দাদামশায়!"

সীতানাথ বিস্ফারিতনেত্রে অমরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না। অমর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার গাত্রের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাঁহার জ্বর খুব বেশী হইয়াছে। যে দুই চারিটা কথা সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি তাহার উত্তর প্রদান করিলেন না; জোরে একটা নিঃশ্বাস টানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন—"আমি মনে করতাম, তুমি বুদ্ধিমান্; তুমি যে এমন হনুমান্, তা জানতাম না!—আর আমিও বুড়ো বাঁদর!"—বলিয়া, তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন, আর কোন-কথা কহিলেন না।

সীতানাথ কি দোষের জন্য তাহাকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিলেন, অথবা কি ত্রুটির জন্য আত্মপ্রতি উক্তপ্রকার অধিক্ষেপ উক্তি প্রয়োগ করিলেন, অমর তাহা বুঝিতে পারিল না। সাধ্যসাধনা করিলেও যে তিনি তখন তাহা বলিবেন না, তাহা সে জানিত; সুতরাং কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ইহার তিন চারিদিন পরে সীতানাথের নামে আবার একখানা পত্র আসিল। তিনি কৌতূহলান্বিতহৃদয়ে খামখানা ছিঁড়িয়া দেখিলেন—ভিতরে দুইখানা পত্র। উপরের খানা পড়িয়া দেখিলেন—প্রভার পিতা লিখিয়াছেন:—

"মহাশয়! বহুদিবসাবধি আপনাদের কোন সংবাদ পাই নাই। নানা কারণে আমিও সংবাদ লইতে পারি নাই—লইবার সম্বন্ধটাও বিধাতা তুলিয়া দিয়াছেন। কয়েক দিন হইল, প্রভা আমাদের ছাড়িয়া জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে। সে ছয় মাস নিয়ত জ্বরে ভুগিতেছিল; আপনার

দেশ হইতেই, বোধ হয়, ম্যালেরিয়া লইয়া আসিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে আপনারা দুঃখিত হইবেন কি আনন্দিত হইবেন, তাহা জানি না; তবে কর্ত্তব্যবোধে সংবাদটা দান করিলাম।

"কিছুদিন পূর্ব্বে প্রভার নামে একখানি পত্র আসে। পত্রখানি সে আমাকে দেখিতে দিয়াছিল। প্রভা বাঁচিয়া থাকিলে এ পত্রের কথা, বোধ হয়, আপনাদিগকে জানিতে দিতাম না; কিন্তু এখন আর গোপন করিবার কোন প্রয়োজন দেখিতে পাই না। ইহা দ্বারা আপনাদের যদি কোন উপকার হয়, ত হউক,—এই ভাবিয়াই পাঠাইয়া দিলাম। ইতি—

শ্রীমনোরঞ্জন শর্ম্মা।"

প্রথম পত্রখানি ফেলিয়া সীতানাথ দ্বিতীয় পত্রখানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেখানি এইরূপ:—"প্রভা! প্রথম যে দিন তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তুমি জান্‌তে চেয়েছিলে, সোয়ামী থাক্‌তে কেন আমি পরের বাড়ীতে রাঁধ্‌তে বেরিয়েছি। আমি তা'র উত্তরে ব'লেছিলাম—সে অনেক কথা, বল্‌ব তখন একদিন। আজ সেই দিন এসেছে। ভাগ্যে তোমার ঠিকানাটা জানা ছিল!

"মনে করেছিলাম, কথাটা প্রকাশ কর্‌ব না—মরণের দিন পর্য্যন্ত মনের তলায় ফেলে, মুখে চাবি দিয়ে রেখে দোব, সংসার ছেড়ে যাবার দিনে সঙ্গে নিয়ে চ'লে যাব; আর নিতান্ত যদি তা না পারি, ত সেই দিনে—শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বা'র ক'রে দিয়ে যাব। কিন্তু কখন কোথায় কি ভাবে মর্‌ব, তা'র ত কিছু ঠিকানা নেই! আবার শুন্‌তে পাই, মর্‌বার আগে কারু কারু কথা প'ড়ে যায়, কারুকে কিছু ব'লে যেতে পারে না! আমারও যদি তাই হয়, আর মর্‌বার সময়ে সেই কথাটা জগদ্দল পাথরের মত বুকে জেঁকে বসে, ত শেষে বুকটা ফেটে ম'রে যাব? তা'র চেয়ে এই বেলা তোমাকে ব'লে রাখি। তোমাকে বল্‌লে কথাটার প্রচার

হবে না। তবে তোমারও বুদ্ধিশুদ্ধি বড় কম, বোন ! তাই ব'লে দিচ্ছি—কারু কাছে যেন একথা প্রকাশ ক'রো না। তা'তে তোমারই ক্ষতি হবার কথা। যদি একান্তই চেপে রাখ্‌তে না পার, তবে ব'লো ! কিন্তু এখন কিছু কাল নয়। যখন দেখ্‌বে, তোমার ছেলে মেয়ে হয়েছে, স্বামীর মনটিকে ষোল-আনাই দখল করেছ—আঁচলের খুঁটে বেঁধে দশটা গেরো দিয়েছ—আর হারাবার ভয় নেই, তখন বল্‌তে পার !—তা'র আগে নয়।

"কথাটা এইবার খুলে বলি। তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগে, তাঁ'র আর একজনের সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছিল—তা জান ত ? তা'র নাম—পদ্মাবতী। আমিই সেই পদ্মাবতী ; মায়াবতী আমার নকল নাম। যখন বিয়ে হয়, তখন তাঁ'র পড়ার সময়। কথা ছিল—বাবাই সত্য ক'রেছিলেন যে,যতদিন তাঁ'র পড়া সাঙ্গ না হয়, ততদিন আমি বাপের বাড়ীতেই থাক্‌ব। ছিলামও তাই। কিছুদিন পরে গ্রামে ভারি একটা মড়ক এল। তাইতে মা গেলেন ; বাবাও গেলেন। আমি বড় একলা হ'য়ে পড়্‌লাম। তখন বল্‌ মা তারা দাঁড়াই কোথা ? মায়ের এক মামাত বোন ছিলেন—জান্‌তাম ; একটা মেয়েলোক সঙ্গে ক'রে একদিন রাতে তাঁ'দের বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লাম। তাঁদের অবস্থা ভাল নয় ; তা' ছাড়া তেমন আপনার ত আর নয় ! আমার যাওয়াতে তাঁ'রা বেশ খুসী হ'লেন না। তাঁদের ভাব দেখে,সেখান থেকে গেলাম একবারে—তুমি যেখানে আমাকে দেখেছিলে। দুরবস্থায় প'ড়ে যদি চিঠি লিখে সেধে জানিয়ে যাই, তা'হ'লেও বাবাকে মিথ্যাবাদী করা হয়। আর মা'র অসুখের সময়ে আমার এক ঘোষাল-কাকা, তাঁ'কে একবার পাঠাতে অনুরোধ ক'রে, দাদামশায়কে চিঠি দিয়েছিলেন ; তাতেও তিনি যান নি। এই রকম সাত পাঁচ ভেবে চিন্তে মনে ক'রেছিলাম—যতদিন তাঁ'র পড়া সাঙ্গ না হয়, ততদিন আপনার পরিচয় না দিয়েই থাক্‌ব ; পরে সময় এলে তখন পরিচয় প্রকাশ কর্‌ব।

সেই ভাবেই ছিলাম। কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন শুন্‌লাম, তাঁ'র বিয়ে! —আমি ম'রে গেছি—ঠিক ক'রে,তিনি আবার বিয়ে কর্‌ছেন! তখন সব ঠিক ঠাক হ'য়ে গেছে, বিয়ের আর একদিন মাত্র বাকী। তবু একবার মনে হয়েছিল, বলি—আমি যে বেঁচে রয়েছি গো! তোমরা আমাকে জীয়ন্তে মরা কর্‌ছ কেন? বলা হ'ল না;—লজ্জা হ'ল, অভিমান এল, একটু দুঃখও হ'ল। কাকের মুখে শুনে,—আমি ম'রেছি কি বেঁচে আছি তা ভাল ক'রে না জেনে, এরই মধ্যে আবার বিয়ে? তা হ'ক! আমি যেমন ম'রে গেছি, তেমনি ম'রেই থাকি। এক একবার মনটার মধ্যে কেমন একটা কষ্ট হ'ত; মনে হ'ত, আমার এ জীবনটাই বৃথা হয়ে গেল। নারীজন্মে যে স্বামীর সোহাগ পেলে না, কখন পা'বার আশা অবধিও যা'র নেই, তা'র জন্ম বৃথা নয় ত কি? আবার ভাব্‌তাম, বৃথাই বা কেন? দেখা না দি, তাঁ'কে দেখ্‌তে ত পাব? কথা না কই, তাঁ'র কথা শুন্‌তে ত পাব? নিজের হাতে রেঁধে, তাঁ'কে খাইয়ে তৃপ্তি পাব। যে ভাবেই হ'ক, তাঁ'র কাজ ক'রে, তাঁ'র কথা শুনে, তাঁ'কে আড়াল থেকে কখন কখন এক আধবার দেখেও ত জীবন সার্থক কর্‌তে পাব। সোহাগ, আদর, যত্ন?—নাই পেলাম? ধন-দৌলত কেউ বিলিয়ে দেয়, কেউ ভোগ করে। যে ভোগ করে, তা'র থাকে না—খরচ হ'য়ে যায়! যে দান করে, তা'রই থাকে—পরকালের জন্য তোলা থাকে, পরজন্মে সুদে আসলে ফিরিয়ে পায়। সেই রকম, আমিও না হয় এ জন্মে তাঁ'কে ভালবাসা শুধু দিয়েই যাই;—তাঁ'কে ভালবাসা দান কর্‌তে ত আর কেউ আমাকে মানা কর্‌ছে না? ঐ জন্মে দিয়ে রাখি, পরজন্মে সুদে মূলে ফিরিয়ে পাই কি না দেখ্‌ব। আবার কখন বা এমনও মনে করেছি যে, স্বামীর ভালবাসার ভাগীদার জুট্‌লে, তুমি রাগ কর্‌বে না—যদি এমন বুঝি, ত না হয় লজ্জা

সংযমের মাথা খেয়ে আপনার পরিচয়টা দিয়েই দেখ্‌ব। তোমাতে আর আমাতে দু'টি বোনের মত থাক্‌ব; দু'জনে মিলে মিশে দু'ধার থেকে তাঁকে সুখী কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। কিন্তু দেখ্‌লাম, তোমার মনের ভাব তেমন নয়; তুমি স্বামীকে ষোল আনারও বেশী দখলে রাখ্‌তে চাও। এ অবস্থায় যদি আমি নিজের স্বত্ব বজায় কর্‌তে চাই; ত সংসারে শান্তি থাকে না—দিনরাত এই নিয়ে একটা ঝগ্‌ড়া কচ্‌কচি হয়; যাঁকে সুখী কর্‌তে চাই, তাঁ'র অসুখ ও অশান্তি বেড়ে যায়। তা'র উপরে যদি আবার তিনি তাঁ'র ভালবাসাটুকু ঠিক সমান ভাগে আমাদের দু'জনকে ভাগ ক'রে দিতে না পারেন, যদি একজনকেই বেশী দিয়ে ফেলেন, আর বেশীর ভাগটা যদি আমারই ভাগে পড়ে! তা' হ'লেই ত অনর্থ! তা'তে শুধু তিনি ন'ন—তুমিও দুঃখ পাও। আমার জন্যে তুমি কেন দুঃখ পা'বে? ভাগীদার কেউ নেই—জেনে, তুমি পরে এসেছ। তুমি কি দোষে ভেসে যাবে? তা'র চেয়ে নিজেই ভেসে যাই। তুমি সুখী হও, তিনি সুখী হ'ন, আমারও তা'তেই সুখ। কিন্তু মেয়েজাতটা কি সয়তানের জাত, বোন! তা'রা যেন সতিনের গন্ধ পায়! তুমি ত আমার পরিচয় কিছু জান্‌তে না; তবু যেন আমার গায়ের গন্ধে বুঝ্‌তে পেরেছিলে! তাই আমার ছায়া দেখ্‌লেও তুমি জ্ব'লে যেতে। কিন্তু আমার ত কৈ তেমন হ'ত না! ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি তোমাকে ভালবাস্‌তাম, মনে কর্‌তাম, আমরা দু'টি বোন—আমরা দু'জনেই এক দেবতার ভজনা করি—আমাদের দু'জনের এক ইষ্টদেবতা। তুমি তা মনে কর্‌তে পার্‌তে না। শুধু তুমি কেন, কারুকেই তা কর্‌তে দেখি না। বুঝ্‌তে পারি না, কেন সবাই সতিনকে এমন বিষ-নয়নে দেখে! হয়ত আমার অদৃষ্টটা আর সবার মত নয় ব'লেই সেটা বুঝ্‌তে পারি না।

"সে যা হ'ক, তুমি, বোন, বড় নির্ব্বুদ্ধি। তা না হ'লে তুমি পরের মতলবে চ'লে নিজে দুঃখ পাও! আমাকে তুমি তোমার সুখের পথে কাঁটা ব'লে মনে করতে। আমি কিন্তু তা ছিলাম না। আর যাঁ'কে তুমি অবিশ্বাসী মনে করতে, তাঁ'রও চরিত্রে কোন দোষ নেই। তিনি আমার পরিচয় জানতেন না; কাজেই তিনি আমাকে অন্যের স্ত্রী মনে ক'রে সর্ব্বদাই সাবধানে থাকতেন—কখনও আমার দিকে চেয়ে দেখেননি। আমি সব জেনেও তাঁ'কে যেন পর মনে ক'রে চলতাম। তবু যে কেন তুমি আমাদের নামে সেই সব কথা তুলেছিলে, তা বুঝতে পারি না। সে কথা যা'ক, আমি তোমার সুখের পথ চিরদিনের মত নিষ্কণ্টক ক'রে চলে এসেছি। এইবার তুমি মনের সুখে স্বামীর ঘর কর গে! তবে স্বামী যে কি বস্তু, তা কিন্তু তুমি এখনও বুঝতে পারনি। তা হ'লেও একদিন পারবে। ধনরত্ন অনায়াসে পেলে তা'তে মানুষের তেমন কদর হয় না। অযত্নে হারালেই বুঝতে পারে, কি জিনিষ হেলায় হারিয়েছে। তবে তাও বলি, ধনরত্ন যা'রা কখন পায়নি—পা'বার আশাও নেই, তা'দেরই যত্নটা কিছু বেশী হয়। আমারও তাই!

"তীর্থস্থানে একটা আশ্রয় পেয়েছি। পেলে কি হবে; একটা দুঃখ জীবনটাকে যেন ঘিরে রেখেছে। এক সূর্য্য বিনা সমস্ত জগৎ অন্ধকারময়। আমাদের জীবনও সেই রকম—একজনের অভাবেই যেন শূন্য! তীর্থ-দেবতার পায়ে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে যে নিশ্চিন্ত হ'ব—তাও পারি না। কি ক'রে দি? মন ত সবে একটা, প্রাণও তাই। যা ছিল, তা ত এক-জনের পায়ে দিয়ে রেখেছি। আর এক আধটা থাকলেও না হয় এই দেবতাকে দেবার চেষ্টা করতাম। পারতাম কি? মনপ্রাণের কথা ছেড়ে দি,—ভাল ফুল বা ফুলের মালা নিয়ে দেবতাকে দিতে গিয়ে দেখেছি,

সব দিতে মন সরেনি—দিতে পারিনি। তবে “ঠাকুরের নামে কিনে নিয়ে গেছি ব’লে কিছু কিছু দিয়ে, বাকীগুলি—তাঁ’র চরণে দিলাম মনে ক’রে—জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি।

“মনের আবেগে কতকি যে হাবড়হাটি লিখ্‌ছি, তা’র ঠিকানা নেই। তুমি লিখ্‌তে পড়্‌তে ভাল জান ; আমি তা জানি না। মনের কথাগুলি কেমন ক’রে—কা’র পর কোন্‌টি দিয়ে,গুছিয়ে লিখ্‌তে হয়,তাও জানি না, তাই লেখার এই রকম এলোমেলো ভাব। তুমি না জানি আমার হাতের লেখা দেখে কতই হাস্‌বে! তা হেসো! বয়সে আমি তোমার চেয়ে বড়—তোমার আগে তাঁ’র গলায় মালাও দিয়েছি। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে পারি। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও! স্বামীর চরণে যেন তোমার মতিগতি অচল থাকে! আর তুমি যেন তাঁ’র সবটুকু ভালবাসা অধিকার কর্‌তে পার! সধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে এ অপেক্ষা ভাল আশীর্ব্বাদ আর কি আছে তা জানি না—জান্‌লে তাও কর্‌তাম। আর একটা ভাল আশীর্ব্বাদ ক’রে পত্র শেষ করি—তোমার সতিন যেন শীঘ্র শীঘ্র নিপাত যায়!”

নবম পরিচ্ছেদ

শেষ ইচ্ছা।

সীতানাথের অসুস্থতা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি আর তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। জ্বর কখন আসে, কতক্ষণ থাকে, কত বাড়ে, কখন ছাড়ে, তৎপ্রতিও তাঁহার অণুমাত্র মনোযোগ ছিল না। শৈলেন ও মনোরঞ্জন বাবুর পত্র পাইবার পরে দুই চারিদিন তিনি সর্ব্বদাই যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার সে সর্ব্বজনাধিগম্য ভাব দৃষ্ট

হইত না। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কাহারও সহিত তিনি কথা কহিতেন না; কেহ বেশী কথা কহিলে বিরক্ত হইতেন। সর্ব্বদাই যেন তাঁহার অন্তরে একটা গভীর বিষাদের অন্তঃস্রোত প্রবাহিত থাকিত। তিনি নিশ্চলাঙ্গে মুদিতনেত্রে উত্তানভাবে নীরবে শয়ান থাকিতেন, আর মধ্যে মধ্যে এক একটা দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলকে স্ফীত করিয়া নিঃশব্দে প্রবাহিত হইত।

এখন সে ভাবটা অপগত হইয়াছে। তাঁহার মুখমণ্ডল আবার সেই স্বভাবসিদ্ধ প্রসন্ন ও প্রশান্ত ভাব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আর তাঁহার বিশাল, নিটোল ললাট চিন্তার কুটিল রেখায় সর্ব্বদা কুঞ্চিত থাকে না। সকলের সঙ্গেই এখন তিনি বেশ সহাস্যমুখে কথাবার্ত্তা কহেন—সাগ্রহে সকলের কথা শুনিয়া তাহার উত্তর প্রদান করেন। কিন্তু, মগ্নতরণীভ্রষ্ট মানব সন্তরণ দ্বারা তীরে উঠিবার অভিপ্রায়ে স্রোতের প্রতিকূলে বহুক্ষণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, সন্তরণের বিফলপ্রযত্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন শ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত দেহকে স্রোতের গতিতে ভাসাইয়া দিয়া থাকে, তখন তাহার মুখে সেই যে যেন—'আর পারি না, অদৃষ্টে যাহা আছে হউক!'—এই রকমের একটা অবসাদ-বিজড়িত চিত্তের নৈরাশ্য ও নির্ব্বেদ-জনিত নিয়তিনির্ভরের ভাব প্রকটিত হয়, তাঁহার মুখেও সেই ভাবটা লক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি সংসারের কোন বিষয় লইয়া আর মাথা ঘামাইতে চাহেন না। গোবর্দ্ধন সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে বলিয়া থাকেন—"আমাকে আর এ সকল কথা জিজ্ঞাসা কর কেন?—অমরের সঙ্গে যুক্তি ক'রে যা ভাল বিবেচনা হয়, তোমরা তাই কর গে!"

জীবনের দিন অবসিত এবং মৃত্যুর তামসী রাত্রি সমাগতা বুঝিতে

পারিয়া, তিনি যে মহানিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাহা শুধু তাঁহার কথা শুনিয়া নহে—তাঁহার দেহ ও স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়াও সকলেই বুঝিতে পারিতেছিল। তাঁহার সেই বলিষ্ঠ, প্রাংশু দেহ দিনে দিনে কৃষ্ণ-পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার সে মধুর ও কোমল কণ্ঠস্বরে আর সে পূর্ণতা নাই; গলার সে জোর আওয়াজও নাই। একটু বেশী কথা কহা তাঁহার স্বভাব; কিন্তু এখন অধিক কথা কহিতে তাঁহার কষ্টবোধ হয়। কথাগুলিকে অন্যের শ্রবণযোগ্য করিয়া বলিবার জন্য তাঁহাকে যত্ন করিতে হয়, এবং সেই প্রযত্নে তিনি শ্রান্তও হইয়া পড়েন; তথাপি কথা কহিতে ছাড়েন না। অমর নিষেধ করিলে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিয়া থাকেন—"আর ত কথা কইতে পাব না, ভাই!—যতক্ষণ পারি ক'য়ে নি।"

অমরের প্রতি তাঁহার স্নেহভাবটা ইদানীং যেন খুব বেশী হইয়া উঠিয়া ছিল! তাহাকে একদণ্ড দেখিতে না পাইলেই তিনি বড় চঞ্চল হইয়া উঠেন। অধিক দিন আর তাহাকে স্নেহ করিতে পাইবেন না বলিয়াই যেন তিনি তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহটুকু নিঃশেষে তাহার উপরে ঢালিয়া যাইতে-ছিলেন। অমরও তাহা বুঝিয়াছিল। তাহা বুঝিয়াই যেন সে অন্য সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা লইয়া থাকে; তাঁহার জ্বরসন্তপ্ত ললাটে, অস্থিচর্ম্মসার পৃষ্ঠে এবং ক্ষীণ বাহু ও চরণে সাদরে ধীরে ধীরে কর-মর্দ্দন করিয়া থাকে। তাঁহার নিকটে বসিয়া কথা কহিতে কহিতেও ক্ষণে ক্ষণে তাহার নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে।

সীতানাথের শুশ্রূষা বা পরিচর্য্যা করিবার জন্য লোকের অভাব ছিল না। যৌবনে যখন কর্ম্ম-উপলক্ষে তিনি প্রবাসে অবস্থান করিতেন, তখন তাঁহার মৃত্যুতে একবিন্দু অশ্রু নিসর্জ্জন করিবারও বোধ হয় কেহ

ছিল না। কিন্তু আজ পাঁচ সাতখানা গ্রামের লোক তাঁহার অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ—ভরণকর্ত্তা স্নেহময় জনকের মুমুর্ষুদশায় পুত্রকন্যা যেরূপ কাতর হইয়া থাকে, সেইরূপ কাতর ও শোকাকুল! নিজ গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের সকল লোকই তাঁহার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিবার জন্য ব্যগ্র। তাঁহার অসুস্থতার বৃদ্ধি দেখিয়া, তারাচাঁদ নিজের মনটাকে ব্যবসায় হইতে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার শুশ্রূষার উপরে ফেলিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন, বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠীর শিক্ষক, অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ, এবং প্রভুভক্ত বৃদ্ধ মাধাই, মঙ্গলা ও পুরবাসিনীগণ সকলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা দেখাইবার জন্য ব্যস্ত। অমর কিন্তু কাহাকেও তাঁহার শুশ্রূষা করিতে দেয় না, সে ভার সে একাকী গ্রহণ করিয়াছে; এবং সেই জন্য আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। গোবর্দ্ধন বা অন্য কেহ যদি কিছু করিতে আইসে,—"এই যে আমি রয়েছি, আমি কর্‌ছি"—বলিয়া, অমর তাহাকে সরাইয়া দেয়। সীতানাথ সময়ে সময়ে তাহাকে বলিয়া থাকেন—"এরা ত সব রয়েছে, তুমি কেন? যাও—স্নান-আহার করগে, একটু বিশ্রাম করগে—অসুখ হবে যে!" অমর কেবল এই বিষয়টিতে তাঁহার অবাধ্য হইয়া থাকে।

একদিন অপরাহ্নে সীতানাথ নীরবে শয়ান আছেন। অমর বিষণ্ণ-মুখে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, ধীরে ধীরে পাখা নাড়িয়া তাঁহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছিল। সহসা যেন কোন কথা মনে পড়িয়া গেল—এইভাবে সীতানাথ বলিলেন—"হ্যাঁ!—তুমি খেয়ে নিয়েছ, অমর?"—"আজ্ঞে হাঁ! —কেন দাদামশায়?"—"আমাকে ছেড়ে আজ আর তুমি কোথাও বড় যেও না!"—"আমি ত সর্ব্বদাই আপনার কাছে রয়েছি, তবু একথা বল্‌ছেন কেন?"—"আজ আমি ভাল নেই, ভাই!"—"কেন, দেখে ত

আপনাকে আজ বেশ ভালই মনে হচ্ছে! জ্বরও ত আজ আপনার অনেক কম হয়েছে, দাদামশায়! মুখের ভাবও আপনার আজ অন্য দিনের অপেক্ষা প্রফুল্ল! তবু—'ভাল নেই'—বল্‌ছেন কেন?"—"এ প্রফুল্লতাটুকু দীপ-নির্ব্বাণের পূর্ব্বভাব, অমর!—কথাটা তোমাকে হয়ত ভাল লাগ্‌বে না; কিন্তু সত্য। রাত্রিটা তোমরা আজ একটু সাবধানে থেকো!"

অমরের নেত্রে অশ্রুধারা বিগলিত হইল। সীতানাথ তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—"ছেলেমানুষের মত কাঁদ কেন, ভাই?—শোন! তোমাকে আমার অনেক কথা ব'লে যাবার আছে—এই বেলা ব'লে রাখি। আমার মাথার বালিশের নীচে লোহার সিন্দুকের চাবিকাঠি, ক'খানি পত্র, আর ছোট একখানি খাতা-বই আছে—বা'র কর দেখি!"

অমর অশ্রু মুছিতে মুছিতে সেইগুলি বাহির করিয়া, তাঁহার নিকটে রাখিয়া দিল। চাবিটি ও খাতা-বইখানি অমরকে দিয়া সীতানাথ বলিলেন —"তোমার কাছে রেখে দাও! এই খাতাখানিতে আমার বিষয়-আশয়— জমি জমা ও টাকাকড়ি, কোথায় কত আছে, জমির চৌহদ্দি ও বিবরণ—কে প্রজা, কত খাজনা, জোত যা আছে, তা'র কি রকম বিলি বন্দোবস্ত আছে,—সমস্তই দেখ্‌তে পাবে—হাতাড়ে বেড়াতে হবে না। টাকা কড়ির বেশীর ভাগই কোম্পানির কাগজ; ব্যাঙ্ক্‌ ও অন্যান্য প্রাইভেট্‌ কোম্পানির সেয়ার্‌, লাইফ্‌ ইন্‌সিওরেন্‌স্‌ প্রভৃতিতেও কিছু কিছু ছড়ান আছে। কিসে কোথায় কত, সে সমস্তই লেখা আছে—দেখ্‌তে পাবে। সিন্দুকে দলিলপত্র আর নগদ টাকাও কিছু আছে। তা ছাড়া একটি পিতলের ছোট বাক্সে কতকগুলি গহনা দেখ্‌তে পাবে। সেগুলি পদ্মার। যদি আমার সমস্ত সম্পত্তি আমার মৃত্যুর পরে একদিনের মধ্যেই উড়ে পুড়ে যায়, উপা-

জ্জনের অভাবে তোমাকে মুষ্টিভিক্ষাও করতে হয়,তবু সেগুলিতে যেন কখন হাত দিও না! মনে ক'রো—সেগুলি তোমার দাদামশায়ের অস্থি! তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত করেছি ব'লে, আমি উইল্‌এর হাঙ্গামে যাইনি—তোমার হাতেই যথাসর্ব্বস্ব তুলে দিয়ে গেলাম। কিন্তু মনে রেখো,—তুমি ইচ্ছামত বাজে খরচ ক'রে নষ্ট করবে ব'লে, সে সব তোমাকে দিয়ে গেলাম না। আমার সংসারটি যাতে চলে, নূতন কেউ না আসুক—আশ্রিত যেগুলি আছে,তা'রা যাতে থাক্‌তে পায়—তাদের কোন কষ্ট না হয়,—আমার বিগ্রহের সেবা বন্ধ না হয়—এইগুলি দেখো! এ কথাগুলি তোমাকে বল্‌বার দরকার না থাকতে পারে; কিন্তু ব'লে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য। অনাবশ্যক হ'লেও আর একটা কথা ব'লে রাখি—আমার শ্রাদ্ধের বিষয়ে পাঁচজনের পরামর্শে বাহুল্যাতে যেও না! আমার বোধ হয়, হাজার দুই তিন টাকা হ'লেই যথেষ্ট হবে। তবে ব'লে যাই, তুমি লুচি মোণ্ডা ক্ষীর দই ক'রে হাজার ব্রাহ্মণকে খাওয়ালে আমার আত্মার যে তৃপ্তি হবে, একটি প্রকৃত অভাবগ্রস্তের যাবজ্জীবন শাকান্ন আর স্থূল আচ্ছাদনের ভার নিতে পারলে তা'র অধিক তৃপ্তি হ'বে। শ্রাদ্ধের দিনে কেবল দশটি ব্রাহ্মণ; বাকী—কাঙ্গাল গরিব যত হ'য়ে ওঠে। আর দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের তীরে যে বড় বট গাছ আছে, তা'রই তলায় আমার চিতা—কাঁদ কেন?—আচ্ছা চিতা নয়—আমার শেষ-শয্যা রচনা ক'রে দিও! এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বল্‌বার নেই। এইবার পত্র ক'খানি—যেমন পরে পরে গাঁথা আছে, সেই মত প'ড়ে যাও!"

অমরের উভয় গণ্ড অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেছিল। সে অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে পত্র কয়েকখানি পাঠ করিয়া, স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সীতানাথ বলিলেন—"পত্রগুলি সব প'ড়ে দেখ্‌লে?—

কি ভুল ক'রেছ তা' বুঝ্‌তে পার্‌লে ? : মায়াকে তোমার যদি 'পদ্মা ব'লে সংশয়ই হ'য়েছিল, সে কথা আমাকে বলনি কেন ?"

অমর একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, ম্লানমুখে একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"এই জন্যেই বুঝি সেদিন আমাকে হনুমান্ ব'ল্‌ছিলেন ?"

"আবার কি জন্যে ?"—বলিয়া সীতানাথ মৌনভাবে অবস্থান করিলেন। অমরও বিষণ্ণমুখে অবনতমস্তকে নীরবে বসিয়া রহিল। কুটিরমধ্যে কিছুক্ষণ একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিল।

বহুক্ষণ পরে সীতানাথ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"অমর ! আমার জীবনের দু'টি বড় কাজ—দু'টি বড় সাধের কাজ অপূর্ণ ফেলে চ'লেছি ! যদি আমার প্রিয় কার্য্য কিছু কর্‌বার জন্যে তোমার কিছুমাত্রও আগ্রহ থাকে, তবে আমার ইচ্ছা তুমি আমার সেই দু'টি অপূর্ণ সাধ পূর্ণ ক'রতে চেষ্টা কর'—কর্‌বে কি ?"

"আপনার প্রিয় কার্য্য কর্‌বার জন্যে যদি প্রাণ দিতে হয়, দাদামশায় ! —প্রাণ তুচ্ছ, তা'র চেয়েও যদি কিছু প্রিয়তর বস্তু থাকে, ধর্ম্ম বা পুণ্য অপেক্ষাও ইহকাল ও পরকালের যদি কিছু স্পৃহনীয় থাকে, তবে সে জন্যে আমি তা'ও ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি ;—কি বলুন !"

সীতানাথ তাঁহার উজ্জ্বলদৃষ্টি অমরের মুখের উপরে স্থিরভাবে ন্যস্ত করিয়া বলিলেন—"তুমি প্রতিশ্রুত হচ্ছ – তা' কর্‌বে ?"

"আপনার শয্যায় ব'সে যা করব বল্‌ছি, তা' যদি না করি, তা'হ'লে পৃথিবীতে এমন কি অকার্য্য আছে,যা আমার করা হ'বে না, দাদামশায় ?"

"তা ঠিক—আমি তোমার গুরুজন ব'লে নয়—মুমূর্ষু মাত্রেরই শয্যার একটা অসাধারণ পবিত্রতা আছে। সে শয্যা—গয়া, গঙ্গা বা বারাণসী অপেক্ষাও একটা পবিত্রতর তীর্থ। মুমূর্ষুর শেষ ইচ্ছা মহা-

গুরুর আদেশ অপেক্ষাও গরীয়ান—অগ্রে পালনীয়। যেন মনে থাকে—তুমি সেই মুমূর্ষুর শয্যাতে ব'সে, তা'র শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে প্রতিশ্রুত হ'চ্চো !"

"প্রতিশ্রুত হ'লাম—বলুন ! অসাধ্য হ'লেও তা' সম্পন্ন করতে চেষ্টা করব ; আর সে চেষ্টায়—যা' বলেছি, যদি প্রাণ, ধর্ম্ম, ইহকাল ও পরকালের সুখ ত্যাগ ক'রতে হয়, ত আনন্দে তা'ও করব।"

সীতানাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"বড় সাধ ছিল, আমার এই সংসারটিকে একটি কল্পাশ্রম ক'রে তুলব—এমন ক'রে তুলব যে, কোন বিষয়ের প্রার্থী হ'য়ে এসে কেউ ফিরে না যায়। তা' হয় নি"—বলিয়া তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

"তা হয় নি কেন, দাদামশায় ?—আপনার এই সংসার থেকে ত অনেকের অনেক অভাবপূরণ হ'চ্ছে ; গরিবের ছেলেরা বিনা-বেতনে কিছু-কিছুও লেখাপড়া শিখ্তে পায়, অনাথ দরিদ্রেরা যথাসম্ভব আশ্রয় ও অন্ন-বস্ত্র পায়, গ্রামের—শুধু গ্রামের কেন, পাশা-পাশি পাঁচ সাতখানা গ্রামের গরিব লোকে অন্নবস্ত্র পায়, রোগে ওষুধ পায়, পথ্য পায়, দায়ে অর্থ-সাহায্যও পায় ; আবার কি করতে চা'ন ?—যে গৃহে অতিথি এসে কখনও অভুক্ত ফিরে যায় না, দায়গ্রস্তকে যা থেকে নিরাশ হ'য়ে ফিরে যেতে হয় না, যে গৃহের চার পাঁচ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত কারুকে উপবাসী থাক্তে হয় না, সেই গৃহই কি কল্পাশ্রম নয় ? এর চেয়েও আর কি করতে চা'ন ?"

"যা' করতে চাই, তা'র মত অর্থ নেই, অমর ! সামান্য যাও করেছি, তা'ও যে কতদিন চল্বে, তা' জানি না। সম্পত্তি বা টাকাকড়ি যা রেখে যাব, তা'তে—বেশ হিসেব ক'রে চালাতে পার্লে, কিছু দিন চল্তে পারে। কিন্তু তেমন হিসেবী লোক কে আছে ? সাংসারিক ব্যাপারে

তোমার অভিজ্ঞতা বড় অল্প। ঠিক আমার মনোমতটি ক'রে চালাবার যোগ্যতা যা'র ছিল, সে চ'লে গেছে!"—বলিয়া সীতানাথ আবার কিসের একটা গভীর চিন্তায় আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অমরের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্‌ছিলাম?"—অমর উত্তর করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন—"হাঁ—দু'টির একটি ত গেল এই—যা বল্‌লাম; আর একটি—তোমাকে সংসারে সুখী—সুখী বলি কেন, সুখ দুঃখ অদৃষ্টের ফল,—সংসারে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যাওয়া—তাও পারিনি"—বলিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরবে যেন কিছু চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তাব পরে বলিলেন—"আমার বিশ্বাস, একটি কাজ কর্‌লে এই দু'টি কাজই সিদ্ধ হ'তে পারে। মায়া—মায়া আর বলি কেন, মায়ার ত অবসান হ'য়ে গেছে—এখন পদ্মা। পদ্মাবতীর সন্ধান ক'রে তা'কে ঘরে নিয়ে আসা। এই এক কাজেই আমার সাধের দু'টি কাজই সিদ্ধ হবে। কাজটা একটু কঠিন বটে; কিন্তু চেষ্টা আর অধ্যবসায়ের কাছে কঠিন ব'লে একটা কিছু নেই। দিনকতক একটু ঘুরে বেড়াতে হবে। গোবর্দ্ধনের উপরে সংসার দেখ্‌বার ভার দিয়ে তোমরা বেরুবে—তুমি আর শৈলেন; আর ঐ চিরভক্ত, বিশ্বাসী, কর্ম্মঠ, বুড়ো মাধাইটাকেও সঙ্গে নিও!—ঢের কাজ পাবে, অনেক সাহায্য পাবে; অজ্ঞাত স্থানে কি ক'রে লোকের সন্ধান কর্‌তে হয়, তা ও বেশ জানে। শৈলেন অযাচিত ভাবেই যা কর্‌বে ব'লে ভরসা দিয়েছে, অনুরোধ কর্‌লে সে তা' অবশ্যই কর্‌বে। আমি যদি আর গোটাকতক দিন যমের কাছ থেকে ছুটি পেতাম, ত তোমাদের কারুকেই ভুগ্‌তে হ'ত না। ভুগ্‌তে বেশী হ'বে না—আমি সন্ধানের কতকটা আভাস পেয়েছি—ব'লে যাচ্ছি। রামের মা পদ্মার সঙ্গে আছে। তা'র এক সই ছিল—

জানি। সে বারাসতের এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে রান্নার কাজ ক'রত। সেখানে সে বহুদিন থেকে আছে; যদি না মারা গিয়ে থাকে, ত আজও আছে। সে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পত্র লিখে রামের মা'র খবর নিত। রামের মাও একে-ওকে-তা'কে ধ'রে মাঝে মাঝে তা'কে এক একখানা পোষ্টকার্ড্ লেখাত। আমিও এক আধবার লিখে দিয়েছি। সম্ভবতঃ এখনও উভয়ে উভয়ের সংবাদ রাখে। আমি তা'র ঠিকানাটা ভুলে গেছি। রামের মা'র সইএর ঠিকানাও যে এত দরকার হবে, তা কে জান্ত? কোন্ মুখুয্যের বাড়ী—তা'র নামটা আমার মনে নেই। বারাসতে গিয়ে সন্ধান ক'রে আগে তা'কেই খুঁজে বা'র করবার চেষ্টা করতে হবে। তা'কে পেলেই খুব সম্ভব রামের মা'রও ঠিকানা পাওয়া যাবে। সেই ঠিকানায় পদ্মাকেও পাবে। যদি আমার এই অনুমান ঠিক না হয়, রামের মা'র সইকে না পাও বা সে তা'র খবর না রাখে, তবে অন্য যে কোন উপায়ে পার পদ্মার সন্ধান ক'রে তা'কে ঘরে নিয়ে আস্বে! আমার বেশ মনে হচ্ছে, তা'কে পাওয়া যাবে। আমি যদি কখন কারু অনিষ্ট কল্পনা না ক'রে থাকি, যদি জ্ঞানে কখন মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা বা নীচতাকে আশ্রয় না ক'রে থাকি, আর তা'তে যদি কিছুমাত্রও পুণ্য থাকে, তবে সেই পুণ্যের ফলে—হে ভগবান্! আমি কিছু চাই না—যেন পদ্মাকে পাওয়া যায়!"—বলিয়া, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন—"দেখা পেলে পদ্মাকে ব'লো যে, প্রভা জন্মের মত চ'লে গেছে,—সেটা না জান্লে, তা'র যে রকম প্রকৃতি, হয়ত সে আস্তেই চাইবে না। আরও ব'লো যে, আমিও জন্মের মত চ'লে গেছি—সে আমাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে ব'লে আমি তা'র উপরে রাগ করিনি—"

সীতানাথ কম্পিতকণ্ঠে শেষ কথাকয়েকটি বলিয়াই নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার মুদিতনেত্রের প্রান্ত হইতে দুই বিন্দু অশ্রু

বিগলিত হইয়া তাঁহার উপাধানে পতিত হইল। তিনি তাহা মুছিবার চেষ্টা করিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ

অন্তিম শয্যা।

অপরাহ্নে সীতানাথের জ্বর বৃদ্ধি পাইল। গ্রামের দুই চারিজন নাড়ী-জ্ঞানসম্পন্ন প্রাচীন লোক নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া, সেই জ্বরের বিরামেই তাঁহার মৃত্যুর আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। রাত্রি দুই বা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার জীবিতকালের সীমা নির্দ্ধারিত হইল।

সীতানাথের বিশ্রাম-কুটিরের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে লোক ধরিতেছিল না। তাঁহার সংসারের আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত পরিজন, প্রতিবাসী ও গ্রামবাসী বহু স্ত্রী ও পুরুষ তাঁহার কৃত্রিম শৈলের পরিসরে সমবেত হইয়া একটা বিপুল জনতার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর কথাটা কাণা-ঘুষায় প্রচারিত হইলে সেই বিষাদমগ্ন নীরব জনতায় একটা নিঃশব্দ সঙ্ক্ষোভ উপস্থিত হইল। পুরুষেরা সীতানাথের মৃত্যুকে নিজ নিজ দুরদৃষ্টসম্ভূত অনর্থের আপতন ভাবিয়া শিরে, ললাটে ও বক্ষে নিঃশব্দে করস্থাপন করিল। আর বামাগণ নীরবে দাঁড়াইয়া নয়নাসারে বসনাঞ্চল সিক্ত করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময়ে জনতা ভাঙ্গিয়া গেল। গ্রামবাসী নরনারীগণ শোকাকুলচিত্তে নিজ নিজ নিরানন্দময় গৃহে প্রতিগমন করিল। সীতানাথের পরিজনবর্গ তখনও বিশ্রামকুটির-প্রাঙ্গণে বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুমোচন করিতেছিল। সন্ধ্যার পরে সকলকে নিকটে ডাকাইয়া, মধুর স্বল্পাক্ষরে স্নেহার্দ্র করুণকণ্ঠে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, সীতানাথ তাহা-

দিগকে গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। অমর ও গোবর্দ্ধন প্রভৃতিকে অশ্রুমোচন করিতে দেখিয়া, তাহাদিগকে নিকটে বসাইয়া বিবিধ মধুর সান্ত্বনা-বচনে প্রবোধিত করিয়া বলিলেন—"তোমরা পুরুষ, অবোধ স্ত্রীলোকের মত তোমরা কাঁদ কেন? সংসারে কে চিরদিন থাক্‌বার জন্যে আসে? সকলেরই এই পথ। কর্ম্মের বশে দিনকতক এই বিদেশে এসে থাকা। যে কাজের জন্যে আসা, তা'র শেষ হ'লে সকলেই এই মৃত্যুর দ্বার দিয়ে ঘরে ফিরে যায়। আমি তোমাদের কতদিন আগে এসেছি বল দেখি! একটু আগে যাব না? এত দিন তোমাদের ছিলাম, তোমাদের সুখে দুঃখে হেসেছি কেঁদেছি; এখন আমি আর তোমাদের নই। আমার প্রিয়তম যিনি, আমার সব আত্মীয় হ'তে পরম আত্মীয় যিনি, তিনি আমাকে ডেকেছেন; আমি তাঁর কাছে চ'লেছি। তোমরা কাঁদ কেন? আজ আমার বড় আনন্দের দিন। তোমাদের আনন্দে আমি কত আনন্দ প্রকাশ করেছি,—আর আমার আনন্দের দিনে তোমরা অশ্রুমোচন করছ? চিরবিদায়ের ক্ষণে যাতে তোমাদের প্রফুল্ল মুখ দেখে যেতে পারি, তা'র জন্যে প্রস্তুত হও!"

মধ্যরাত্রিতে অমর, গোবর্দ্ধন ও তারাচাঁদ প্রভৃতিকে জাগিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সীতানাথ বলিলেন—"তোমরা সবাই জেগে ব'সে রয়েছ কেন?—বিশ্রাম কর গে! আমি জেগে রয়েছি; তোমরা আমার যে নিদ্রার আশঙ্কা ক'রছ, রাত্রিতে তা' হচ্ছে না।"

অন্যান্য সকলে কুটির-প্রাঙ্গণে পড়িয়া ঘুমাইল। জাগিয়া বসিয়া রহিল কেবল তিনজন—অমর, গোবর্দ্ধন আর মাধাই।

পূর্ণিমার চাঁদ যেন জাগরণক্লিষ্ট দেহে পশ্চিমদিগন্ত-শয্যায় ঢলিয়া পড়িল। পূর্ব্বগগন উষার অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সীতানাথের

প্রতিবাসী পাখিগুলি তরুশাখায় বসিয়া আসন্ন প্রভাতের উদ্বোধন-সঙ্গীতে নিদ্রিতগণকে জাগাইয়া তুলিল। তাহাদের চির-পরিচিত প্রভাত-কূজন শুনিয়া, সীতানাথ ক্ষীণকণ্ঠে অমরকে ডাকিয়া বলিলেন—"অমর! আমাকে তোমরা বাইরে নিয়ে যেতে পার না?"—"বাইরে কেন, দাদামশায়?"—"কুটিরের বদ্ধ বায়ুটা যেন বড় ঘন—শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিকূল ব'লে মনে হচ্ছে, ভাই!—আমাকে মুক্তস্থানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর!"

অমর ও গোবর্দ্ধন তখনই তাঁহার তক্তপোষ ধরিয়া তাঁহাকে কুটির-প্রাঙ্গণে বহিয়া আনিল। বাহিরে আসিয়া সীতানাথ জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আ! বাঁচালে ভাই! এ সময়ে ঘরের ভিতরে অবরুদ্ধ হ'য়ে থাকাটা যেন বড় অসহ্য বোধ হয়; ঘরের আচ্ছাদন ও বেষ্টনী প্রভৃতি যেন অনন্ত ও অবিভাজ্যের ব্যবচ্ছেদক—অন্তরাত্মা আর বিশ্বাত্মার মধ্যে এক একটা ব্যবধান ব'লে মনে হয়!—বাসি কাপড়টা ছাড়িয়ে দিয়ে কোন রকমে আমাকে একবার বসিয়ে দিতে পার? এই সময়ে নিত্য আমি আহ্নিক পূজা করি, এভাবে প'ড়ে থাকৃতে বড় কষ্ট হচ্ছে!" গোবর্দ্ধনের সাহায্যে অমর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পাটের কাপড় পরাইয়া দিল। নিম্নে কম্বলময় শয্যার উপরে মৃগচর্ম্ম আস্তৃত করিয়া, তাহার উপরে বড় বড় দুইটা তাকিয়া বালিশ দিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বাস্য করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল। গোবর্দ্ধন নিমিষের মধ্যে কতকগুলি ভাল ভাল ফুল তুলিয়া আনিল। অমর গঙ্গাজল ছিটাইয়া সেই স্থানে পূজার সব সরঞ্জাম আনিয়া দিল। ইঙ্গিতে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া, অমর সকলকে একবার একটু অন্তরালে গিয়া অবস্থান করিতে অনুরোধ করিল; এবং নিজেও তাঁহার নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

সীতানাথ বালিশের সাহায্য ব্যতিরেকেই বেশ সরলভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া যথাসাধ্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ করিলেন; তৎপরে জবাকুসুমসঙ্কাশ সেই নবোদিত, রক্ত রবিবিম্বের পানে অনিমিষনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া যুক্তকরে বলিলেন—"হে তিমিরাপহ দিবাকর! তোমার স্বর্ণকরস্পর্শে বিশ্বজন প্রবুদ্ধ হয়! অ-কর্ম্মদা শর্ব্বরীর অন্ধকার ও প্রাণিবর্গের নিদ্রাজনিত জড়তা দূর ক'রে, তুমি সকলকে কর্ম্মে প্রেরণ কর; হে কর্ম্মদায়িন্! তোমাকে নমস্কার!"—তদনন্তর যেন সেই আদিত্যাসনে কল্পিতাধিষ্ঠান হিরণ্ময় পুরুষকে উদ্দেশ করিয়া অন্যের অশ্রাব্য অনুচ্চস্বরে, ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"সচ্চিদানন্দ প্রভু! কি কর্ম্ম-সাধনের অভিপ্রায়ে এই ক্ষুদ্র জীবকে তোমার এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ ক'রেছিলে, তা' জানি না; দুর্ম্মেধা আমি, পাঁঠা'বার সময়ে যদি কিছু ব'লে দিয়ে থাক—তা'ও মনে রাখ্‌তে পারিনি! যে সামান্য বুদ্ধিটুকু দিয়ে পাঠিয়েছিলে, তা'তে যতটুকু যা' বুঝ্‌তে পেরেছি,—যে স্বল্প সামর্থ্য দিয়েছিলে, তা'তে যতটুকু যা' কর্‌তে পারা যায়, তা করেছি; সাধ্য-অনুসারে তা'তে একটুও ত্রুটি করিনি! কর্ম্মের শেষ হ'য়েছে কি না, তা' জানি না; আবার কোথায়, কতদূরে, কোন্ দেশে, কি কাজে নিয়ে চ'লেছ, তাও জানি না;—তুমি ডেকেছ, আমি চ'লেছি!—হে জ্ঞান-ময়! জ্ঞানহীন আমি, দুরূহ দেখে জ্ঞানমার্গে পদার্পণ কর্‌তে সাহস করিনি; ক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়ে, এই সান্ত—সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে তোমার অনন্তত্ব ও অসীমত্বের ধারণাকে স্থান দিতে পারিনি! বিবিধ পাপানুবিদ্ধ, কামাদি-কলুষিত প্রাণমন নিয়ে, হে নিরঞ্জন! তোমার সঙ্গে একাত্মভাবের স্পর্দ্ধাকেও কখন মনে আন্‌তে পারিনি! সাংসারিক বিষয় হ'তে বিনিবৃত্ত হ'য়ে, বিগতমোহ, জ্ঞানোন্মত্ত অবস্থায়, যোগমার্গে অবস্থান ক'রে, 'প্রণবময়-মরুৎকুম্ভিত', প্রশান্ত হৃৎপদ্মে

চর্ম্মচক্ষুর অগোচর জ্যোতি-চৈতন্য স্বরূপ তোমার ধ্যানেও কখন মগ্ন থাক্‌তে পারিনি!—হে ভক্তবৎসল! ভক্তিহীন আমি,—ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে কখন তোমাকে ডাক্‌তে পেরেছি কি না—জানি না! আমার এ প্রেমহীন মরু-হৃদয়ে কখন ভক্তির উৎস উদ্গত হয়নি—তা বল্‌তে পারি না; কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী, অত্যল্প ভক্তিসলিলে পঙ্কিল হৃদয়ের প্রগাঢ় পাপপঙ্ক ও অশেষ-বাসনা-দোষ-মলিনতা ধৌত ক'রে, তা'তে তোমার আসন পেতে দিতে পেরেছি কৈ? হে অন্তর্যামিন্! মৃগ যেমন নিজ নাভি-সৌরভে আকুল হ'য়ে, চারিদিকে ছু'টে বেড়ায়, আমিও তেমনি, সময়ে সময়ে তোমার সাড়া পেয়ে আকুলহৃদয়ে তোমাকে সকল স্থানে খুঁজে বেড়িয়েছি; হে জ্ঞানগম্য! অজ্ঞ আমি—মূঢ় আমি, তুমি যে আমার অন্তরের ধন, আমার প্রাণের প্রাণ, তুমি যে দিবানিশি আমার অন্তরেই বিরাজ করছ, তা'ত বুঝেও বুঝ্‌তে পারিনি! তোমার প্রীতির জন্য চন্দনলিপ্ত সুরভিকুসুমের অঞ্জলি নিয়ে, কতদিন তোমার পদপ্রান্ত খুঁজে বেড়িয়েছি; হে বিরাট্! কোথায় তোমার চরণ আর কোথায় বা তাহার প্রান্তভাগ? তোমার চরণের উদ্দেশে অন্যের কল্পিত জড়বিগ্রহের চরণে সে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ক'রেছি! আমার ভক্তিপ্রদত্ত সে পুষ্পোপহার কখন তোমার চরণে গিয়ে প'ড়েছে কি না,তা' জানি না। উদ্যানে বা বনে বিকশিত কুসুমরাশির অখণ্ড সুষমা মনে মনে চয়ন ক'রে তোমার উদ্দেশে নিবেদন ক'রেছি; তোমার জিনিষ ব'লে কি তা'তে তোমার পূজা সিদ্ধ হয়নি? সে উদ্যান, সে বন, সে কুসুম—সবই তোমার, তা' জানি; কিন্তু হে সর্ব্বময়! বিশ্বের সবই ত তোমার! বিশ্বপতি! তোমার এ বিশ্বে আমার কি আছে?—আমিও কি তোমার নহি?—হে অভীষ্টপ্রদ! ইষ্টপ্রাপ্তির কামনায় কখন ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয়, প্রতিপদে গহন স্মার্ত্ত-কর্ম্মের, অথবা ব্রহ্মমার্গের অনুরূপ কঠোর শ্রৌত-

কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করতে পারিনি। আমার জ্ঞান বা ভক্তি ছিল না, ধর্ম্মে আস্থা ছিল না,—শ্রবণ, মনন বা নিধিধ্যাসনেও আমার অধ্যবসায় ছিল না, অথবা যাগযজ্ঞেও প্রবৃত্তি ছিল না। তবে প্রথম যৌবনে পিতৃ-মাতৃহীন হ'য়ে, নিষ্পরিগ্রহ জীবন নিয়ে সঙ্কল্প ক'রেছিলাম যে, অনাথ শিশু, অসহায় রমণী, বিকলাঙ্গ ও আতুর দীনজনের সেবায় জীবন উৎসর্গ কর্‌ব, দুঃস্থ ও বিপন্ন আত্মীয়ের সাহায্য ও বিপৎপ্রতিকারে কদাচ বিমুখ হ'ব না, আর পরস্ত্রীর পানে কখনও সাকাঙ্ক্ষদৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত কর্‌ব না। সর্ব্বসাক্ষী তুমি! তুমি জান—সে সত্য কতদূর পালন ক'র্‌তে পেরেছি! এখন জীবনের প্রান্তসীমায় এসে প'ড়েছি, মৃত্যু শিয়রে অপেক্ষা কর্‌ছে—আর মুহূর্ত্ত পরেই তা'র তিমির-গ্রাসে কবলিত হ'ব; আর ত তোমাকে ডাকৃতে পাব না, দেব! তাই এই বেলা এ জন্মের মত একবার তোমাকে এই শেষ ডাকা ডেকে নিচ্ছি! তুমি সকলের কর্ম্মানুরূপ গতি বিধান কর—শুনেছি। হে কর্ম্মানুরূপফলদ! আমার কি গতি বিধান কর্‌বে, তা' তুমিই জান। তবে আমি জানি যে, আমি ভাল বা মন্দ যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেছি, সে সমস্ত কর্ম্মেরই কর্ত্তা তুমি—সে সমস্তই তোমার কর্ম্ম, আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র। তথাপি আমার ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদিত যাবতীয় কর্ম্মের ফল আমি তোমাতে অর্পণ করছি! সংসারে নিষ্পাপ বা নিরপরাধ কে আছে? আমার পাপ অনেক; কিন্তু তোমার পাপনাশিনী শক্তিও ত অসীম! আমার অপরাধ বিস্তর; তোমার ক্ষমা ও করুণাও ত অনন্ত! করুণাময়! পিতা যেমন পুত্রকে ক্ষমা করেন, সখা যেমন সখার দোষ গ্রহণ করেন না, প্রিয় যেমন প্রিয়ার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করেন, কৃপাময়! তুমিও সেই মত আমার জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত সমস্ত দোষ, পাপ ও অপরাধ ক্ষমা ক'রে, আমাকে তোমার চরণে স্থান দিও! তোমাকে নমস্কার!—পুনঃ পুনঃ নমস্কার!

—শতবার নমস্কার!—"নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে!"

সীতানাথ নীরব হইয়া, স্তিমিত দৃষ্টি নাসাগ্রে ন্যস্ত করিয়া, স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরেই অমর দেখিল, তাঁহার শুভ্র শির নিদ্রাভিভূতের মস্তকের ন্যায় বক্ষের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে! অমর, দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া, বাহুদ্বয়ে তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া, ধীরে ধীরে শায়িত করিয়া দেখিল, তাঁহার নয়নদ্বয় নিমীলিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থির, হৃদয় নিঃস্পন্দ! কম্পিতকাতরকণ্ঠে আবেগভরে কুটিরপ্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত করিয়া ডাকিল—"দাদামশায়!" আর কে তাহার সেই কাতর আহ্বানে উত্তর প্রদান করিবে? সীতানাথের প্রাণ তখন বিশ্বকারণে বিলীন হইয়া গিয়াছে!

সম্পূর্ণ

গ্রন্থকার প্রণীত

সর্ব্বজন প্রশংসিত

গার্হস্থ্য উপন্যাস

কমলা

কমলা সম্বন্ধে দুই একটি অভিমত :—

—"কমলার "কমলা" ও "বিরাজ" চরিত্র এই রোগ-শোক জরা-প্রপীড়িত মর্ত্ত্যধামে দুর্ল্লভ। লেখক কমলাকে আদর্শ হিন্দু রমণীরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন ; শ্বশ্রূ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা অপমানিতা ও গৃহতাড়িতা হইয়া……কমলা কিভাবে রমণীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ রক্ষা করিয়াছেন, প্রায় পদে পদে কিরূপ স্বামীভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, লেখক তাহার একটি সজীব চিত্র আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। পতি পত্নীর এরূপ অনাবিল প্রেম এই জ্বালা-যন্ত্রণা-পরিপূর্ণ মর্ত্ত্যভূমিতে মন্দার পারিজাতের ন্যায় দুর্ল্লভ। এই পাপ পৃথিবীর সকল গৃহেই যদি উদারচেতা, পরোপকারী, স্নেহশীল, দেবচরিত্র বিরাজমোহন, লক্ষণের ন্যায় ভ্রাতৃভক্ত শুধাংশু, দেবসদৃশ তরঙ্গিনী ও কমলা বিরাজ করিতেন, তাহা হইলে মর্ত্ত্যধাম স্বর্গে পরিণত হইত। যে গৃহে সূর্য্যনারায়ণ ও কৃষ্ণনাথের ন্যায় সন্তানবৎসল পিতা আছে, কমলা তরঙ্গিনী ও করুণার ন্যায় পরদুঃখকাতরা স্নেহশীলা রমণীরত্ন আছে, দেবোপম ভ্রাতৃদ্বয় আছে সে সংসারে দুঃখকষ্ট কখনও প্রবেশলাভ করিতে পারে না। গ্রন্থের ভাষা ও ভাব উৎকৃষ্ট—সরস হস্তের পরিচায়ক। অধুনা এই বাজে উপন্যাস প্লাবিত বঙ্গদেশে এইরূপ গার্হস্থ্য উপন্যাসের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক।——মানসী [অগ্রহায়ণ ১৩২২]

"—গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা হইলেও লেখকের লিপি কুশলতায় গ্রন্থখানি পরম সুন্দর হইয়াছে। লেখকের এই প্রথম উদ্যম হইলেও তিনি কোথাও কোন প্রকার ত্রুটি রাখেন নাই। স্থানে স্থানে যে ভাবে তিনি পাত্র পাত্রীদিগের চরিত্রবিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি যে একজন বিচক্ষণ, সমাজতত্ত্ব ব্যক্তি তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। পুস্তকখানি সুপাঠ্য ইহার আর একটি গুণ এই যে, এই বইখানি নিঃসঙ্কোচে স্ত্রী কন্যা ভগিনীদিগের হস্তে দেওয়া যায়; আজ কালিকার দিনে ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে।"—ভারতবর্ষ [আষাঢ় ১৩২২]